# কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

প্রীতিভাজনেষু,

কুশী-নদী যাদের পাকা ধানে মই দিয়েছে, তারা ওকে শাপ-মন্যি দিক, আমি কিন্তু ওর দুর্দিনের অতিথি, স্তুতিপাঠ করলেই ভালো হোত, অন্তত মন্দ গাইতে পারব না। কেউ যদি বলে, ভয়ে মেনে নিচ্ছি, কেউ যদি বলে টান আছে, ভালোবাসি বা ভালো লাগে তো আর একটু বেশি করেই মেনে নিচ্ছি।...হাতের কাছে একটা চমৎকার উদাহরণ পেয়ে গেছি। আমি যে ...টায় লিখছি তার ছবিটা একটা শিকারের ছবি। গাছপালা, ঝোপঝাড়, ...াহাড়ের একটা জঙ্গল, একটা বাঘ ল্যাজ উঁচিয়ে থাবা পেতে বসে, ...র আড়াল থেকে একটা শিকারী বন্দুকের করেছে তাগ। আর যার ...ক সিম্প্যাথি বা দরদ থাক, আমার সিম্প্যাথি ঐ বাঘটার দিকে। ও ...কার প্রাণ, এখানে ও-ই মানানসই; মানুষের সমাজে গোরু-ছাগলের ... ও কেন এখানকার বন্যদের দুধ দিয়ে পালন করে না, (অথবা ব্যাকরণগত, ...ী হলে কেন করত না) এ প্রশ্নটা একেবারেই ওঠে না। ও এখানকার ...ষ্ঠাতা, ও এখানে স্বরাট্, সম্রাট; শিকারী এখানে দস্যু, অনধিকারী; ... এটা ছবি বলেও যে ওর বন্দুক থেকে গুলীটা কোন জন্মেই ছুটে ...ব না, এর জন্যে আমি সুখী। ছবিটা যে অচল অপরিবর্তনীয়, তার ... আ...র দুঃখ শুধু এই নিয়ে যে, অন্যথা বাঘের ল্যাজের ঐ উন্নত মহিমার সামনে শি...ারীটার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে যাবার একটা উল্লাসকর সম্ভাবনা ছিল।

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী কুশীকেও আমার লাগে ভালো। ওর সামনে বন্দুক ...বার লোক জন্মায় নি; তবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ বেঁধে যারা ... পিঞ্জরাবদ্ধ করতে চেয়েছিল, তারা যে ল্যাজ মুখে করে সরে দাঁড়িয়েছে, ... আমি খুশি বৈকি।

সমস্ত পৃথিবীটা জ্যামিতির নির্দেশ-মতো ক্যানালে গেছে ভরে, চাবি ... দরকারমাফিক জল দুয়ে নাও, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, বন্যা নেই, তার

ভাঙা-গড়া নেই—জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের তদারকে পৃথিবীর যেদিন এইরকম সৌভাগ্য হবে, সেদিন সেই শুভঙ্কর-শাসিত পৃথিবীতে জন্মাবার দুর্ভাগ্য আমার যেন না হয়।

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? তা কি করব? বেচারির হয়ে কেউ একটা কথা বলে না যে। তোমাদেরও তো বাড়াবাড়ি। কুশী কি সত্যিই সর্বনাশী? গত বছর বন্যা আসে নি বলে যে কাঁদবারও কত লোক দেখলাম। কত লোকের সর্বনাশ করলে না বলেই আরও কতলোকের সবনাশ করতে হোল, শাপমন্যি কুড়তে হোল। করে কি বেচারি, যায় কোথায়?

কথা হচ্ছে, কুশীকে বশ করতে হলে গায়ে হাত বুলিয়েই বশ করতে হবে, ওর সঙ্গে একটা রফা করতে হবে, যাতে ওর রক্ত-কৌলিন্য খানিকটা বজায় থাকে। যদি মনে কর কড়ি দিয়ে কিনে ওকে একেবারে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে তো সেটা তোমাদের ভুল, পারবে না।

এইখানে এসে কয়েকদিন রয়েছি আমি; বেশ লাগছে। বেশ লাগার প্রধান কারণ জায়গাটাই। বিরাট কুশী-প্রাঙ্গনের একটু একটেরেয় পড়ে যায় হয়তো, তাহলেও কুশীর ছাপ আছে গায়ে। আমি নর্থ-ইস্টর্ন রেলের ব্র্যাঞ্চ হয়ে মান্সী থেকে যে এই মাইল পচিশ ছাব্বিশ ভেতরে এলাম, সে আসার স্মৃতি আমার রেলযাত্রার অভিজ্ঞতায় উৎকট হ'য়েও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মান্সী গঙ্গাতীরের মেয়ে, তার মূর্তিতে একটা আভিজাত্য আছে; শ্যামল, স্নিগ্ধ; খানিকটা এগিয়ে তার এলাকা ছাড়িয়ে বাদলাঘাট থেকে চেহারা গেল বদলে। ঘাটের নামেই পর পর দুটো স্টেশন, প্রথমে তো তাইতেই মনটাকে সতর্ক করে দেয়—মাটি ছেড়ে জলের দেশে চলেছি—অবশ্য, এখন চোৎ-বোশেখের শুকো, এই যা ভরসা। আমাদের গাড়ি চলেছে গঙ্গার সীমানা ছেড়ে উত্তরে। প্রায় মাইল চার পরে বাদলাঘাটের সিগ্‌ন্যাল গেল দেখা। এইখান থেকেই নাকি কুশীর এলাকা আরম্ভ। তাহলে এইখানেই আর একটা কথা বলে রাখা চলে—কুশীর এলাকা থেকেই আসল মিথিলা হোল

শুরু। মিথিলা হোল গিয়ে ত্রিহুত বা তীরভুক্তি ; তার সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে সংস্কৃত শ্লোকটিতে, সেটা এই—

কৌশিকী তু সমারভ্য
গণ্ডকীমধিগম্য বৈ,
জাহ্নবীতীরমাস্থত্য
যাবদ্ধৈমবতংবনম।

যোগাযোগও এমন যে, গাড়িতে আমার একমাত্র সঙ্গী যিনি, তিনিও একজন মৈথিল। দাঁড়াও, এঁর কথা একটু বলে নিই আগে।

লোকটি মান্‌সী থেকেই আমার দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন,—প্রথমত তাঁর চেহারার জন্যে, দ্বিতীয়ত তাঁর গালাগালের জন্যে। এতকাল এদেশে আছি, এমন একটি আদর্শ মৈথিল ব্রাহ্মণের চেহারা এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি। টকটক করছে রং ; মুখের ছাঁচটা গোল ; প্রশস্ত কপাল ; শান্ত, আয়ত চক্ষু ; মাথায় ছোট করে ছাঁটা ধপধপে শাদা চুল ; সুপুষ্ট শিখা একটি মোটা গ্রন্থিতে বেশ গুছিয়ে বাঁধা ; ভ্রূর মাঝখানটিতে একটি বেশ বড় সিন্দুর-বিন্দু। পরণে গোলাপী রঙের থান কাপড়, ত্রিকোচ্য করে নাভিকুণ্ডের কাছে গোঁজা ; একটি ফিনফিনে পাতলা পিরাণের নীচে হলদে রঙের পৈতে যাচ্ছে দেখা।

মান্‌সীতে আমি যখন গাড়ি বদল করে এই গাড়িতে আসি, উনি একলা একটি কোণে চুপ করে ছিলেন বসে। ঢুকেই মনে হোল সূর্যের কড়া আলোরও অতিরিক্ত একটা আলো যেন রয়েছে গাড়িটার মধ্যে ; কতকটা নিজে হতেই আমার হাত দুটি গিয়ে কপালে জড়ো হোল, বললাম—"প্রণাম পণ্ডিতজী।"

ঐ বেঞ্চটাতেই মাঝামাঝি গিয়ে বসলাম।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হোল একটু। পণ্ডিতজী প্রণামের উত্তরে মাথাটা একটু নোয়ালেন বটে, কিন্তু মুখটা বেশ স্পষ্টভাবেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠল, বসলেনও খানিকটা গুটিসুটি মেরে—আরও খানিকটা কোণ ঘেঁসে। একটু অস্বস্তিতেই পড়লাম ; তখনও আকৃষ্টই রয়েছে

মনটা, কিন্তু হঠাৎ এত বীতরাগ কেন? আচরণটা এতই অদ্ভুত মনে হোল যে, খানিকটা ইতস্তত করে জিগ্যেস করেই ফেললাম—"পণ্ডিতজী, আমি আসায় কি আপনার কোন অসুবিধে হোল? তাহলে না হয় নেমেই যাই।"

পণ্ডিতজী হাত দুটো বুকের দু'দিক দিয়ে উঁচু করে তুলে ( মৈথিলদের মুদ্রা একটা ) বেশ স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—"হয়েছে বাঙালীবাবু, হয় নি বললে মিথ্যাচারী হব। কথাটা হচ্ছে আপনারা বড্ড ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। আর সব কথা থাক, আচ্ছা, ঐ কী একটা মুখে দিয়ে ফক্‌ফক্‌ করে ফুঁকে যাচ্ছেন বলুন তো? একটা ম্লেচ্ছ নেশা, ক্রমাগতই হাত উচ্ছিষ্ট হচ্ছে—তার ওপর এই দুর্গন্ধ—গাড়িতে ঢুকেছেন পর্যন্ত…"

মুখের সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে বললাম—"নিন, আপনি বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ, এ সামান্যর জন্যে কেন অসুবিধায় ফেলব; আর হাত উচ্ছিষ্ট হবার কথাও যদি বলেন…"

—প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইলাম; অদূরেই জলের কলটা, নেমে গেলাম। হাত-মুখ ধুয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখি পণ্ডিতজী ছোট্ট একটি কয়েৎবেলের ডিবে উবুর করে বাঁ-হাতে নস্যি ঢালছেন।

মনে হোল যেন একটু লজ্জিত, সেই জন্যেই আমি যে ঠাট্টাটুকুর সুযোগ পেলাম, সদ্য সদ্য সেটা আর বের করলাম না মুখ দিয়ে। তবে উনিই আবার প্রসঙ্গটা তুললেন—"আপনি ওটা সঙ্গে সঙ্গেই ফেলে দিলেন বাঙালীবাবু…যার নেশা, বুঝি না কি? এই দেখুন না, নেশাই তো?"—নস্যিসুদ্ধ হাতটা তুলে ধরে একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন।

হেসেই বললাম—"হ্যাঁ, গন্ধটাও প্রায় সমানই, তবে সুবিধে এই যে, নিজের নাকে বন্দী করে রাখা চলে।"

পণ্ডিতজী হো-হো করে হেসে উঠলেন, ডিবেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন—"নিন, আছে শখ নস্যির?…মিছিমিছি আপনার চুরুটটা ফেলিয়ে দেওয়ালাম। ধরুন যদি কোনও ফিরিঙ্গীই উঠত, আমার ভালো লাগে না বলে কি…?"

ভিবেটার দিকে চেয়ে বললাম—"না, ওটা চলে না পণ্ডিতজী। তা ভিন্ন গন্ধটাই না হয় নাকে করলাম বন্দী, হাঁচিটাকে তো করা যাবে না,—গাড়িসুদ্ধ এতগুলি লোকের যাত্রাভঙ্গ···একে তো নিজেরটুকু করেই এসেছি।"

আরও বিরাট হাস্য করে উঠলেন পণ্ডিতজী, বললেন—"বাঙালীবাবু সঙ্গে সঙ্গেই শোধ নিলেন। কিন্তু কৈ আমি তো আপনাকে ফেলে দিতে বলি নি, যার যা নেশা···"

হেসেই বললাম—"কিন্তু ভাষা যেরকম উগ্র হয়ে উঠেছিল পণ্ডিতজী, ভয় হোল নিজেই না উঠে টান মেরে ফেলে দেন মুখ থেকে ছিনিয়ে।"

আবার সেই চতুষ্পাঠীর প্রাণখোলা হাসি।

"যতই বলুন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন আপনারা একটু বেশিরকমই বাঙালীবাবু, একথা আমি বলবই। তবে ধর্মবল, আপনাদের স্ত্রীলোকেরা খুব নিষ্ঠাবতী, তাইতেই চলে যাচ্ছে আপনাদের। তাহলে আপনাকে আমাদের বারিয়ারী নীলকুঠীর অন্নদাবাবুর কথা বলতে হয়···"

সেই আলাপ জমে উঠেছে পণ্ডিতজীর সঙ্গে। বয়স বিরাশী বৎসর। ভাগলপুর যখন নতুন কমিশনারী হোল, তখন উনি পনের বৎসরের। বহুদর্শী পণ্ডিত মানুষ, মান্‌নীতে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছেন, মাঝে মাঝে এইরকম আসেন—"মাঈকে যখৈন্ যখৈন্ কৃপা হৈৎছৈক্"—অর্থাৎ মায়ের যখন যখন কৃপা হয়। গল্পের পুঁজিও অনেক—কুশীর পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে তার আধুনিক কীর্তিকলাপ, তারই মধ্যে আবার অন্নদাবাবু আর তাঁর স্ত্রীর গল্প পর্যন্ত—বলে যাচ্ছেন যেমন যেমন মনে পড়ছে; এই বয়সেও পরিষ্কার মাথা, মনেও আছে অনেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত।

চমৎকার লাগছে। স্টেশন ছেড়ে একটা টানা বাঁক ঘুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়েছে আমাদের গাড়ি। পণ্ডিতজী বেঞ্চের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে হাতের তিনটি আঙুলে মুদ্রা রচনা করে গল্প বলে যাচ্ছেন আমায়, মনে হচ্ছে চতুষ্পাঠীতে গুরুর সামনে বসে কৌশিকী মহাকাব্যের পাঠ নিচ্ছি—

"দুই বোনে ফুল তুলতে গিয়ে কিশোরীসুলভ খেলায় মত্ত হয়ে ভুলে গেছেন সব, এদিকে মহর্ষি পূজার বিলম্ব হয়ে যেতে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে

উঠছেন। দুজনে উপস্থিত হলে শাপ দিলেন—'তোরা দুই বোন নদীরূপ গ্রহণ করে পরস্পর হতে এত সুদূর হয়ে পড়বি যে, আর সাক্ষাৎকার হবে না।'....সেই থেকে কৌশিকী আর কমলা এই দুই বোনের মাঝখানে সুদূর ব্যবধান। শুধু অনেক কান্নাকাটির পর ঋষি যে কৃপাপরবশ হয়েছিলেন, তাইতে তাঁরই বিধানমতো কৌশিকী শত বৎসরে একবার করে যান পশ্চিমে কমলার দিকে এগিয়ে—দুই বোনের দেখা হয়—ওঁদের মিলনের ভৈরব আনন্দে অর্ধ মিথিলা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে...”

( অন্নদাবাবুর কাহিনীও বেশ কৌতুকজনক— )

কুশীর মূল কাব্য নয়, তবু কুশী-প্রাঙ্গণেরই এক টুকরা কাহিনী বলে আর পণ্ডিতজীও কাব্যের মুখেই বলে যাচ্ছেন বলে আমার কাছে তারই একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে হচ্ছে। আরও ভালো লাগছে এইজন্যে যে, একেবারে গোড়ায় যে বাঙালীর ম্লেচ্ছাচার নিয়ে পণ্ডিতজীর একটা বিরাগের ভাব জেগে উঠেছিল, সেটা একেবারেই কেটে যাওয়ায় কাহিনীর কৌতুকের দিকটায় ঝোঁক বেশি দিয়েছেন।...একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির এক দম্পতি, তাঁদের গৃহস্থালী অন্নপূর্ণা-শিবের গৃহস্থালীর মতনই বিচিত্র—অসামঞ্জস্যের বর্ণনায় চতুষ্পাঠীর মুক্ত হাসি উঠে গাড়ির শব্দের ওপরও পড়ছে ছড়িয়ে।

সেকালের আধাখেঁচড়া ইংরাজী জানা নীলকুঠির বাবু ছিলেন অন্নদা 'চাটুর্জ্জি'। অসম্পূর্ণ হলেও ইংরাজী পড়ার দোষগুলো ঢুকেছিল পুরোপুরি, বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার অনাচারে, অবশ্য একেবারে নিষিদ্ধটা বাদ দিয়ে। ওদিকে ওঁর স্ত্রী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা হিন্দু রমণী—যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করে স্বামীকে অনেক রকমে শোধরাবার চেষ্টা করলেন, না পেরে শেষকালে বাড়ি থেকে দিলেন বের করে। আসল বাসা থেকে খানিকটা দূরে তাঁর একটা ঘর উঠল, নির্বাসিত অন্নদাবাবু সেইখানেই থাকেন, সেইখান থেকে অফিস যান, স্ত্রীর সঙ্গে নিতান্ত কোন প্রয়োজন হোলে বলে পাঠান, হুকুম এলে বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ান, স্ত্রীও একটা দাসীকে সঙ্গে করে দরজার আড়ালে দাঁড়ান,

কথাবার্তা হয়, তারপর আবার উভয়ে আপন আপন কাজে চলে যান। কড়া মেয়ে, স্বামীর হাত থেকে যদি কিছু নিতেই হোল তো গঙ্গাজলে ধুয়ে নেন। এদিকে আবার সাধ্বী রমণী তো, প্রণামটা দূর থেকে করেন—গলায় আঁচল দিয়েই, তারপর স্বামী চলে গেলে জায়গাটাও গঙ্গাজলে ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেন।

ছেলের-মেয়ের নাতি-নাতনীতে বৃহৎ পরিবার অন্নদাবাবুর। এদিকে সাধ্বী স্ত্রীর গৃহস্থালীতে নিত্য পূজাপার্বণ, অতিথি সেবা; স্বামীর অনাচারের কুফল নষ্ট করবার জন্যে নিত্য চণ্ডীপাঠ, ওদিকে পত্নী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে অন্নদাবাবু আরও দিয়েছেন গা ঢেলে। দুবেলা বাড়ি থেকে খাবার যায়, তবু সন্ধ্যার পর সাহেবের বাবুর্চিখানা থেকে একরকম খোলাখুলিই আসছে সাহেবী খানা, বাড়ি থেকে আলাদা মজলিসও দিন দিন গুলজার হয়ে উঠছে।

কাহিনীর মোটামুটি কাঠামোটা তোমার সামনে ধরলাম—প্রতি দিনের খুঁটিনাটি দিয়ে খুব সরস করে বলে যাচ্ছেন পণ্ডিতজী, মাঝে মাঝে চতুষ্পাঠীর সেই প্রাণখোলা হাসি, গাড়ির কাঁপনটাকে দিচ্ছে বাড়িয়ে।

·

বাদলাঘাট। গাড়ি উঁচু বাঁধের সোজা পথ ছেড়ে ভাঙা পুলের পাশ দিয়ে নেমে এসে একটা অস্থায়ী খড়ের স্টেশন-ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। নেমে এসে যেন মাথা উঁচু করেই, যেন কোন রাজ-রাজেশ্বরীর দরবার, এখানে উচ্চাসন নিয়ে এতটুকু মাথা উঁচু করে থাকবার কারুর হুকুম নেই।··· সামনে ভাঙা পুলের ক'টা লোহার থাম রয়েছে সিধা দাঁড়িয়ে—রাজ-দরবারে এতটুকু বেয়াদবি হ'লে সাজাটা কিরকম হবে তার যেন তর্জনী-সঙ্কেত।

কিছু লোক উঠল, কিছু নামল। স্টেশনের সওদা এখানে কাঁকুড়; মেয়ে-পুরুষে, ছেলের-মেয়েয় বিক্রি করতে এসেছে; হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। আবার স্টেশন ছেড়ে গাড়ি আমাদের এগিয়ে চলল। সভয়, মন্থর, কী নির্মম ক্রোধে সব ধুয়ে মুছেই না কুশী নিজের সীমানা গেছে বিস্তার করে! যেদিকে দৃষ্টি দাও, আর যতদূর দৃষ্টি যায় তোমার, এক রুক্ষ, ঊষর সমতল;

বহু দূরে দূরে ক্বচিৎ এক-আধটা গাছ, আরও দূরে দূরে এক-আধটা গ্রাম—তিনটি চারটি বা পাঁচটি সাতটি ঘরের সমষ্টিকে যা নাম দাও। জীবনের চিহ্ন বিরল। বহুদূরে কোথাও বৈশাখ অপরাহ্ণের ধূসর আকাশের নিচে একপাল মহিষ মন্থর চরণে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে; সঙ্গে একজন লোক, কি, দু-জনই; কোথাও মাথায় ঘাসের ঝুড়ি জনকতক মেয়ে জীবনের চিহ্ন দেখে যত সান্ত্বনা পাও বা না পাও, তার চেয়ে যেন বেশি ভাবনা এদের যেতে হবে কোথায়, কত দূরে…এই রকম দু'মুঠো ঘাসের সন্ধানে কতদূর এমনি করে বৈশাখী সূর্য মাথায় করে ঘর ছেড়ে যেতে হয় ওদের? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।…তোমার দুর্ভাবনা।

বাদলাঘাটের পর ধামারাঘাট। এই রকম জনহীন তৃণহীন শূন্যতার মাঝখান দিয়ে এলাম চলে। কোপারিয়ায় যখন পৌঁছলাম, রোদ একেবারে পড়ে এসেছে। সূর্য চোখের সামনে আস্তে আস্তে নেমে গেল, নিস্তেজ হয়ে গেল, শেষে বিরাট নগ্ন আকাশে একটা বর্ণছত্র বিস্তার করে অস্ত গেল। কোন গ্রামের আড়ালে নয়, কোন গাছের নীল রেখার পেছনে নয়; পৃথিবী আর আকাশের ক্ষীণ মিলনসূত্রটি ধরে ধীরে ধীরে নেমে গেল।…মুঙ্গের থেকে দুপুরে করেছি যাত্রা। সূর্য আজ আমার এতটুকুর অ-দেখা থাকেনি, যখন আকাশপথে নামল, কোন কিছুই তাকে এতটুকুর জন্যে আড়াল করতে পারেনি।

অস্ত গেল, মরুভূমি কিন্তু এখনও জ্বলছে। মহিষের ক্ষুরে যে ধূলির স্তম্ভ উঠেছে, বা ঘাসওয়ালীদের পায়ে পায়ে, অস্তমান সূর্যের রাঙা আভা পড়ে সেগুলো মনে হচ্ছে অগ্নিশিখা; যেখানে যেখানে ছায়া একটু জমাট বেঁধে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন অঙ্গার, জলন্ত মাটির দগ্ধাবশেষ।

এক এক করে পাঁচটি নদী এই মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ মাইলের মধ্যে। পুলে ওঠবার আগে গাড়ি যেন একবার ভেবে নেয়, তারপর খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে পা ফেলে। সব নেড়া পুল, তেমনি উঁচু; কত কোটি গ্যালন জল মিনিটে বয়ে নিয়ে যে কুশী যাবে নিচে দিয়ে, সে তার মর্জি, তাকে পুরোপুরি জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাখো।…গুম গুম গুম একটা চাপা শব্দ, যেন

অন্য কোনও লোক থেকে ভেসে আসছে ধ্বনিটা, বুক কেঁপে ওঠে; অনেক নিচে শান্ত, নীরব জলধার; দূরে একখানি গ্রাম, সন্ধ্যা। দুটো নদীতে নতুন জল নেমেছে—পুলের নিচের খাদগুলো দিয়ে গৈরিক জলের ধারা—গর্জন—বাধা পেয়ে নিচের পাথরগুলোর ওপর কুশী যেন তার দাঁত ঘ'ষে সেগুলোকে শানিয়ে নিচ্ছে। এ-গর্জন তো ঐ গ্রামখানির কানে পৌছানো উচিত; আর নিশ্চিন্ত রয়েছে ওরা কিসের ভরসায়?

কোপারিয়ার পর চেহারা কতকটা বদলাল, সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে দিনের দৃশ্যে যবনিকাও টেনে দিলে। যখন সাহারসা স্টেশনে নামলাম, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ়ই হয়ে উঠেছে।

আমাদের এই সাহাবসরা, এর একটু নতুন ইতিহাস আছে। এই যে দুটো মহকুমা আর গোটা ষোল থানা নিয়ে চার হাজার বর্গমাইলের বিরাট কুশী-প্রাঙ্গণ, এর সমস্তটাই এই সেদিন পর্যন্ত ছিল ভাগলপুর জেলার মধ্যে। খুব খারাপ জায়গা নয়। কুশীর কখনও যশ ছিল না অবশ্য, তবে অপযশের মাত্রাও এতটা বাড়েনি আগে। এই প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে গঙ্গায় নেমে যেত। নিরীহ যে কোন কালেই ছিল না, তার জন্যে সব দোষটা ওকেই দিলে চলে না, কিন্তু ওর খাদে যত জল ধরে, হিমালয় তার চেয়ে বরাবরই বেশি দিত ঢেলে; তাই অবুঝ বাপের অবুঝ মেয়ে কুশী বর্ষায় খানিকটা উৎপাত করে—তাও খুব অভদ্র-রকমের নয়—গঙ্গার পেটে ঢেলে দিত জলটা। তারপর এদিকে এসে সেই খাৎ আরও ভরে উঠতে কুশী উঠেছে ক্ষেপে—পাগলের মতনই সমস্ত জায়গাটাকে ভেঙেচুরে, এখানটা জলে ডুবিয়ে, ওখানটা বালিতে ডুবিয়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে, ভাগলপুর গঙ্গার ওপার থেকে আর সামাল দিতে পারে না। নদী চলবে একটা ধারায়; একটার জায়গায় না হয় দুটোই হোক, একবেণী না হয় হোক ত্রিবেণীই; কুশী কিন্তু নিজের বেণী একেবারে এলিয়ে শতভাগে দিয়েছে বিছিয়ে,—কোশী (আসল ধারা), বালওয়াহা, বরহরি, পুরায়েন চিলাউনি, পরওয়ালা, বেটী, ঢেমরা, গোহী···কত নাম খুঁজবে লোকে? তাও কি

একরকম ?—এবছর যেখান দিয়ে নৌকা বইল, হয়তো একটা নামও পড়ল— আসছে বছর দেখবে সেখানে শুকন বালির গাদা, ত্রি-সীমানার মধ্যে কোথাও জলের চিহ্ন নেই। শুধু তো নিত্য নূতন নামের সমস্যা নয়; যে নামটা দিলে, কুশী বালির উখো দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে নিশ্চিহ্ন করে দিলে সেটাকে; কত এগুবে তুমি, এগোও তো।

বলছিলাম ভাগলপুর আর সামাল দিতে পারলে না ওপার থেকে। বর্ষায় যখন এই বিশাল প্রাঙ্গণ হয়ে থাকে একটা সাগর, মাঝে মাঝে সাহারসার মতন কয়েকটা ছোটবড় দ্বীপ, সে দ্বীপগুলোর কি হচ্ছে না হচ্ছে, সে খবর নেওয়াও হয়ে পড়ে অসম্ভব। তাই ভাগলপুর শেষে হার মেনে এ-অংশটাকে নিজের শরীর থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিলে—'কে না ত্যজে সর্পদষ্ট অঙ্গুলী আপন ?' এখন এই সাহারসাকে কেন্দ্র করে হয়েছে আলাদা জেলা; ঠিক জেলা নয়, উপ-জেলা, সাব-ডিস্ট্রিক্ট; কুশী হয়েছে পৃথগন্ন; একঘরেও বলতে পার, ভদ্রসমাজে ওর যা ব্যবহার!

এরই মধ্যে একটু শুকন, ডাঙা-জায়গা বলে সাহারসার হয়েছে একটু কদর। মহকুমাও ছিল না, একটা থানাও নয়, হয়ে উঠল একেবারে জেলা শহর! বাড়ি ঘর উঠেছে, পাঁচটা দরকারে পাঁচটা লোক আসছে, পুরনো মহকুমা-শহর সুপেটল আর মধেপুরার একটু চোখ টাটায়।

তা, হোক না কেন নাবালক, তবু একটা পৃথক সংসারের কর্তাই তো ?—সাহারসার এখন একটু পায়া ভারী।...গবেষকের দল নেমে পড়েছে, ওর নাম নিয়ে চলেছে গবেষণা। পথ চলতেই একজনের মুখে শুনলাম— 'সাহারসা নয় তো, শহর শাহ, অর্থাৎ শহরের বাদশাহ্।'...কালু শেখের দিন ফিরেছে, এখন সে মিঞা কলিমুদ্দিন।

কয়েকদিন কেটে গেল, বেশ লাগছে। আমি সভ্যতার হস্তিনাপুর থেকে অনেক দূরে এখন। অজ্ঞাতবাস চলেছে। খাণ্ডব বন না হোক, খাণ্ডাৎ কুশীর আশ্রয়ে আমি। বর্তমান থেকে বহুদূর পেছিয়ে কোন্ একটা যুগে রয়েছি, বেশ লাগছে, একেবারে Back of beyond; গাড়ি নেই, রিকশা নেই, তার কারণ দূরত্ব নেই যার পেছনে গাড়ি রিকশা করবে ছুটোছুটি। যদি বলো

প্রচুর ধুলো তো তার উত্তরে বলব তেমনি আবার মিউনিসিপ্যালিটির পাকা ড্রেনও নেই। ফেরিওয়ালা নেই, সবচেয়ে বড় কথা দশ দিক আচ্ছন্ন করে রেডিয়োও নেই, কি সহজ কণ্ঠ, কি উচ্চ কণ্ঠ, অর্থাৎ লাউড স্পীকারের চাড়া দেওয়া।

আমাদের বাংলোর সামনে একটা ফাঁকা মাঠের পরই রেল স্টেশনটা। বড়ই বলতে হবে, আর বেশই সুশ্রী। এন-ই-আর স্টেশনে একটু করে বাগান রাখে। আমার কেমন যেন মনে হয় ওটুকু ওর ধর্মের দিক, সব গেরস্তরই যেমন একটু আধটু থাকে, বা থাকা উচিত। অবশ্য সিক্যুলিয়ারিজ্‌মের (Seculiarism) কবলে পড়ে আর কত দিন বজায় রাখতে পারবে জানি না। আমাদের কর্তারা কোন্‌দিন বলবেন এসব বাজে খরচ উঠিয়ে বরং এম্‌ব্যাসীর (Embassy) খাতে আরও কিছু যোগ দিয়ে "ভারতীয় কৃষ্টি প্রচারে" জোর দেওয়া ভালো।...ও-তিনটা কথা আমার নয় ব'লে উদ্ধারচিহ্ন দিয়ে ঘেরে দিলাম, যদি চোখ না বুঁজে চলা অভ্যাস থাকে তো কোথাও দেখে থাকবে।...আচ্ছা, ভারতের ধর্ম বাদ দিলে ভারতের কৃষ্টির মধ্যে কী থাকে আমায় একটু বুঝিয়ে বলতে পার? গান, তার মূলেও শঙ্কর; নাচ তার মূলেও শঙ্কর পার্বতী! এরা যে বাদ দেবে, তা ছুরি বসাবে কোথায়।

বাংলোর বাঁ দিকটা কোর্টকাছারি, থানা, আরও কয়েকজন বড় আমলার বাসা, তারপর শহর আরম্ভ হয়েছে, শহর বলতে 'শহর-শার' যা বোঝায়। প্রথমেই যে বাড়ির লাইন তার বেশির ভাগই হোটেল ব'লে বোধ হোল। দিনে বেড়িয়ে দেখিনি, তবে রাত্রে গাড়িগুলি যখন স্টেশনে এসে পৌছায়, যাত্রী ভোলাবার রঙ-বেরঙের আওয়াজ শুনতে পাই—"আইয়ে, দাল ভাত দো তরকারি।...আইয়ে, দাল ভাত মছরি!...আইয়ে, দাল ভাত তিন তরকারি, চট্নি!...পবিত্তর হিন্দু হোটেল, চলে আইয়ে!..."

এর পেছনেই বাজার। মন্দ নয়, চলনসই; সাহারসায় তো চাঁদনি-চৌরঙ্গী এসে বসবে না। এর রাস্তাটুকু ইটের খোয়া বিছানো। য়্যুনিয়ান বোর্ডের একটা জলের গাড়ি আছে, এই খোয়ার ওপর টলতে টলতে খানিকটা জল ছিটিয়ে দেয়। সাহারসার যে একটা মর্যাদা হয়েছে,—ধুলো না মরুক ঐ

মর্যাদাটুকুকে তো খাবি খাইয়ে খাইয়েও কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই জলের অনুপাতেই গুটিকতক লাইট পোস্টও আছে ছড়ানো হেথায়-হোথায়, তারা ঝিমুতে ঝিমুতে একরকম করে রাতের পাহারাটা সারে।

রেল পেরিয়ে ওদিকেও কিছু বাড়ি। স্কুলটাও ওদিকে; একটা চালকল; একটা সিনেমাও এসে জুটেছে, তবে বেশি উপদ্রব শুরু করেনি এখনও। ক্রিশ্চানদের একটা মিশনও আছে। তারপরেই সাহারসা শহর ফুরিয়ে গেল।

তার জন্যে আপসোসও নেই আমার। এর চেয়ে বড় হলে, আমি ধুলো পায়েই বিদেয় হতাম। খুলে বললে তুমি বুঝবে,—আমি আসছি কলকাতায় পুরো তিনটে সপ্তাহ কাটিয়ে; আজকালকার কলকাতায়; সেখান থেকে ভাগলপুর, তারপর জামালপুর, মুঙ্গের। সাধ করে কি শকুনি-মামার চক্রান্তে না পড়লেও যেচে অজ্ঞাতবাস বেছে নিয়েছি?

সাহারসায় আছি আমি সামনের আর ডান দিকের মোহে—যেখানটায় কুশীর পাঞ্জার ছাপ আছে। বাদলাঘাট কি ধামারাঘাট না হ'লেও অপূর্ব! ধূ ধূ করছে ধূসর মাঠ, শুধু রেলের লাইনটা মাঝখানে এসে পড়ে এই মুক্ত-চ্ছন্দে যা একটু যতিভঙ্গ ঘটিয়েছে। রেলের এই দিকটা যা কিছু ছাড়া ছাড়া ঘর, ওদিকটায় একেবারেই কিছু নেই, বহুদূরে একটা অ-সমান সবুজ রেখার ওপর, আকাশটা গোল হ'য়ে নেমে এসেছে। সমস্ত দিন আমি এই বিরাট বিস্তারের গায়ে কুশী-অঞ্চলের ছবি দেখি। শুধু সূর্য আর শুধুই ধরিত্রীর খেলা, মাঝখানে আর কিছুই নেই। বৈশাখী মাতুনির জন্যে একত্র হয়েছে ওরা। প্রভাতে থাকে একটা প্রশান্তি, কিছুক্ষণ নিয়ে; নির্মল আলো, ঝিরঝিরে বাতাস; তারপর বেলো জমির গায়ে যে-বাতাসটা সমস্ত রাত ধরে ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেটা ঐ জমির সঙ্গেই আস্তে আস্তে তেতে উঠতে থাকে। দিন যতই এগুতে থাকে, আকাশ থেকে একটা শুষ্ক জ্বালা নেমে আসতে থাকে পৃথিবীর গায়ে, একটা বর্ণহীন দীপ্তি চারিদিকে পড়ে ছড়িয়ে। এক এক সময় বাতাস নেয় তার ডানা গুটিয়ে; চারি দিক স্তব্ধ, রুক্ষ, পৃথিবীর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।···চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় থাকি

বসে ; এই স্তব্ধতার একটা অনাহত সুর আছে, তার সঙ্গে নিজের মনটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। এখানে-ওখানে যা একটু সবুজের ছোপছাপ আছে, যেন ফিকে হয়ে গেছে আকাশের ঐ বিরস শুভ্রতা নিয়ে। বাংলোর বাগানে কলাপাতার ঝালর-গুলোতেও একটা দোলন নেই। বহুদূরে স্টেশন ইয়ার্ডের ইঞ্জিনশেডের বাইরে একটা শানটিং ইঞ্জিন রয়েছে দাঁড়িয়ে ; তার চিমনি থেকে হলদেটে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আকাশের সঙ্গে যাচ্ছে মিশে। বাংলোর সীমানার মধ্যে চৈতের কচিপাতায় ঢাকা একটা মাঝারি অশ্বত্থ গাছে একরাশ নানাজাতের পাখি জড়ো হয়েছে ; মিশ্র কাকলি উঠছে মাঝে মাঝে কিন্তু চাপা। শুধু একটা সঙ্গিনীহারা কোকিল মাঝে মাঝে সাড়া নেবার জন্যে গলা ছেড়েই উঠছে ডেকে।

আমি সামনে চেয়ে বসে আছি—

> প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে,
> নিস্তব্ধ, নির্বাক···

এই জন্যেই তো আসা। কুশীর লীলাভূমি সে বৈশাখেরও লীলাভূমি ; ভেবে পাইনা, লোকে শৈত্যের সমারোহ দেখবার জন্যে যদি দার্জিলিঙ ছুটতে পারে তো তপনের তাণ্ডব দেখবার জন্যে এখানেই বা আসবে না কেন। আমি তো কলকাতায় ছটফট করছিলাম,—আমার বুঝি সাহারসার বৈশাখ দেখা এবারেও হোল না।

প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকি আমি। এক সময় সেই তাণ্ডব ওঠে জেগে। যে-বাতাসটা গুটিয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ তার যেন তন্দ্রা ছুটে যায়। দু একটা ডানার ঝাপট, তারপরেই—সাঁ-সাঁ-সাঁ,একটা টানা হুঙ্কার—তার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জায়গাটা সজীব হয়ে উঠল। ঘুমন্ত ধূলিবালির স্তূপ হঠাৎ উঠল লাফিয়ে, দিকে দিকে ঘুর্ণির স্তম্ভে ছায়ামূর্তির দল সমস্ত প্রাঙ্গণটা জুড়ে মাতামাতি শুরু করে দিলে—উঠছে, পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার কোথা থেকে উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। সেই বিবর্ণ সবুজের ছোপছাপ এক এক জায়গায় একেবারে মুছে যাচ্ছে, ধূলির স্তম্ভ গাছগুলোকে পর্যন্ত ফেলেছে ঢেকে। ক্ষণিক নয়, ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে, রোদে-হাওয়ায়—ধুলোয়-

হুঙ্কারে মেশা এক বিচিত্র ঢেউ, কোন্ সাগরে উঠে কোন্ উপকূল লক্ষ্য করে ছুটেছে বোঝা যায় না—

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি
উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া।
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ,
ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ—

—চোখ পেতে রাখা যায় না, চোখ ফিরিয়ে নেওয়াও যায় না; বসে থাকতে হয় যেন কে সম্মোহিত করে দিয়েছে—শেষে না দেখে তোমায় উঠতে দোব না। সমস্ত মধ্যাহ্ন, প্রায় সমস্ত অপরাহ্ণও এই এক ভাব। তারপর বৈরাগীর শান্তি পাঠের অবসর হয়।

সেও অপূর্ব, অন্য কোনও আকাশের নিচে সম্ভব কিনা জানি না, কারণ, একটা জিনিস যে খুলবে তার জন্যে তেমনি মানানসই পটভূমি চাই তো। দিনের শেষের সেই শান্ত মন্ত্রচ্ছবির জন্যে এই রকম একটি মধ্যাহ্নও যে দরকার। চণ্ডীপাঠের পর যে স্বস্তিবাণী তার কি তুলনা আছে?

একটি দিনের কথা। ঐ হাওয়াটাই পড়বার মুখে হঠাৎ যেন কী একটা খেলার খেয়ালেই আর একবার একটু মেতে উঠে পশ্চিমের কোথা থেকে একরাশ মেঘ নিয়ে এল। একটু শান্তিজলও দিলে ছিটিয়ে, তারপর একটি ঝিরঝিরে হাল্কা বাতাসকে আসরে রেখে প্রস্থান করলে।...মধ্যাহ্ন-নাট্যের কুশীলবদের মধ্যে ঘূর্ণির দলও নিয়েছে বিদায়; সূর্যও নিলে নাকি? বাংলোর আড়ালে মেঘের ওদিককার খবরটা ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না।...চারিদিক স্নিগ্ধ, সকলের চেয়েও মনোরম; সকালের আগে তো স্নিগ্ধ রজনীই ছিল।... এবারেও যে আকাশ থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না, তার কারণ এবার আমায় সম্মোহিত করেছে ঘনশ্যাম মেঘের দলে। ভিজে মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে। আর দূরে—কাছে গাছগুলোর সেই বিবর্ণ সবজে রংটা

ঐ এক পশলা জলে হঠাৎ হয়ে উঠছে উজ্জ্বল।…সামনেই বাংলোর উঠোনে উঁচু স্তম্ভে সরকারী তিনরঙা পতাকাটা এই নির্মল শান্ত সমাবেশের মধ্যে বড় যেন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে; হালকা হাওয়ার দোল খেয়ে তার তিনটে রঙে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে।

মনে করলাম একটু বেড়িয়ে আসি।

উঠতে যাব, হঠাৎ যেন ভোজবাজি! সামনের খোলা মাঠ, দূরের কাছের বাড়ি-ঘর, মেঘের টুকরো, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ—সমস্তর ওপর হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক রাঙা আলো এসে পড়ল!…সূর্য তাহলে অস্ত যায়নি, কোথায় লুকিয়ে ছিল!…সে যে কী অপরূপ, অকস্মাৎ ব'লে যে আরও কত সুন্দর,—সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ জাগিয়ে দিলে! ব'সে রইলাম।…সামনের দৃশ্যপট আস্তে আস্তে যাচ্ছে বদলে। এখন সবই বিলম্বিত লয়ে, দুপুরের সেই তাড়াহুড়ো নেই। মেঘটা পাতলা হতে হতে ঘন কুয়াশার মতন আকাশটা ফেললে ছেয়ে, তারপর আর একটা ভোজবাজি; নিত্যদৃষ্ট, তবুও ভোজবাজিই বলতে হবে বৈকি। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত পূবের আকাশটায় এখানে-ওখানে রঙের ছোপ, সামনের ফ্ল্যাগ-স্টাফে ঐ তিনরঙা পতাকার মতন—আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে একটার গায়ে একটা যাচ্ছে জুড়ে, তারপর এক সময় সবটা মিলে গিয়ে বিরাট একটা অর্ধবৃত্তে রামধনু উঠল জেগে।

বাংলোর পতাকাটা ওরই ঠিক মাঝখানটিতে—ঐ একই রঙের, পৎ পৎ করে উড়ছে; ঐ রকমের আর একটি পতাকা কে যেন টাঙিয়ে দিলে দিক্ থেকে দিগন্তে।

এক এক সময় হঠাৎ একটা স্মৃতি মনে কেমন ক'রে ওঠে ফুটে।… র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনোর একটি ছবি—নত দৃষ্টি মেরীর কোলে শিশু-ক্রাইস্ট। সামনের এই দৃশ্যটার সঙ্গে মিলটা যে কোথায় ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু রয়েছে যে একটা মিল এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যার পর সামনের লনটিতে চেয়ার পেতে বসি। কৃষ্ণপক্ষ যাচ্ছে। নিচের দৃশ্য দূরের থেকে এক এক করে যতই লুপ্ত হয়ে আসতে থাকে আকাশ ততই নক্ষত্রে নক্ষত্রে করে ওঠে ঝলমল। বাংলোটা তার এক খণ্ড যা আড়াল করে রাখে, বাকি আকাশটা দিক-চক্র থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত উন্মুক্ত, এক নজরে সমস্তটা যায় দেখা, দৃষ্টি কোথাও এতটুকু ব্যাহত হয় না। চুপ করে থাকি বসে। চোখের সামনে বড় বড় নক্ষত্রপুঞ্জগুলো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে নেমে। কী বিপুল গতিবেগ!—পলকে লক্ষ যোজন; কী বিরাট পরিক্রমা! অথচ মহা-শূন্যের বিপুল বিরাটত্বেই কী নিঃশব্দ!

নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এতবড় নাট্যের দর্শক আমি, নিজের নিঃসীমতা যেন মেপে উঠতে পারি না। অথচ এই আমিই আবার কতই না ক্ষুদ্র—পৃথিবীর কোথায় একটুখানি মুক্ত প্রান্তে সূর্যের একটু রশ্মিকণা এসে সামান্য কি একটু আলোড়ন তুলছে তাইতেই থাকি অভিভূত হয়ে সমস্ত দিন!

এই আমার এখানকার জীবন। তবে এইটুকুই কুশী-প্রাঙ্গনের সমস্ত কাহিনী নয়; সাহারসার একটা মাঠে কুশী-প্রাঙ্গন শেষ হয়ে যায়নি, তা সে যত বড়ই মাঠ হোক না কেন। তা ভিন্ন এ তো বৈশাখের ক'টা শুকনো দিনের ইতিহাস। এখনও তো নাট্যমঞ্চে মূল-নায়িকা কুশীই নামেনি।

সে যে আবার কী দাপট!

কিন্তু তার আগে শুকন দিনের কথাই শেষ করি; বাইরে বেরিয়েও যে খানিকটা দেখে এলাম নিজের চোখে।

কিন্তু তারও আগে ঘরের দু'একটা কথা সেরে নিই—

আমরা নববর্ষ পালন করলাম; বেশ ঘটা করেই। অবশ্য আমাদের ঘটাও সেই মাপে ছটাকখানেকের সাহারসা 'শহর কা বাদশাই' হয়ে দাঁড়িয়েছেন।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেহাৎ এমন মন্দই বা, কি হলো?

আমার মাথায় খেয়ালটা হঠাৎই হোলো উদয়, জায়গাটার পরিচয় নিতে গিয়ে যখন শুনলাম দৈবক্রমে এখন এখানে প্রায় ষোল-সতের ঘর বাঙালী

মজুদ, অবশ্য তাঁদের মতে দুর্দৈবরকমেই। ভাবলাম সামনে পয়লা বৈশাখ, একেবারে ফাঁকা যাবে?

কথাটা পাড়তে কিন্তু সাহস বা উৎসাহ পাচ্ছি না; কিরকম সাড়া পাব না-পাব কে জানে; কাউকে চিনি না, হয়তো মনে করে বসবে—দেখো! এমনি সারা হচ্ছি, তার ওপর এ আবার কোথা থেকে এক সাহিত্যিক উৎপাত নিয়ে হাজির করলে!

দ্বিধাটুকু কাটিয়ে যখন পাড়লাম কথাটা তখন আরও দুটো দিন কেটে গেছে।…ভুল হয়ে গিয়েছিল, এঁকে-ওঁকে না চিনি, বাঙালীকে তো চিনি, কথাটা পাড়তেই সবাই লুফে নিলেন। ভেবেছিলাম, যদি একটুও সাড়া পাই, নিজেই খেটে-খুটে যাহক একটা কিছু দাঁড় করাব—কাঞ্চনমূল্য হিসাবে না হয় একটা আধলাই। ওঁদের উৎসাহ দেখে নিশ্চিন্দি হয়ে সরে দাঁড়িয়ে উৎসাহই দেখতে লাগলাম।

অগ্রণী হলেন রবিবাবু আর অক্ষয়বাবু। রবি মিত্র এখানকার কুশী রিলিফ অফিসার, সংক্ষিপ্ত পরিচয় K. R. O-বাবু, সিনিয়র ডেপুটি পদবীতে। ছ' ফুট দীর্ঘ পেশীপুষ্ট শরীর, উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল; ধুতি-পাঞ্জাবীতেও দেখেছি, কিন্তু খাকী প্যাণ্টের ওপর কস্ট্যুম গেঞ্জি—এই চেহারাটাই আছে চোখে লেগে, যাতে মনে হয় সরকার অন্তত কুশী ফ্রণ্টে (Kosi front) পাঠাবার অধিনায়ক বাছাইয়ে ভুল করেননি।

অক্ষয়বাবু এখানকার সেকেণ্ড অফিসার, অর্থাৎ জেলা হাকিমের পরেই। বয়স অল্প, সে হিসাবে একটু বেশি গম্ভীর; অন্তত গোড়ায় তাই মনে হয়েছিল। তারপর উৎসবের কথাটা পাড়তে, আটপৌরে হয়ে যখন কাজে নামলেন, তখন বুঝতে পারা গেল হাকিমীর পোশাকী রূপ ওঁর ভেতর পর্যন্ত এখনও প্রবেশ করতে পারেনি। আশা করি পারবেও না, কেননা ঘনিষ্টতর পরিচয়ে দেখছি লোকটির সব কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটি ঔদাসীন্য আছে, সেটা একটানা সাত বছর এই কুশী এলাকায় কাটাবার দরুণ যদি না হয়ে থাকে, তো আশার কথা। কেন?—তা হ'লে আশঙ্কার কথাটাও বলতে হয়,—বিজ্ঞেরা বলেন—Beauty is skin deep; কিন্তু ধার-করা বিউটি,

অর্থাৎ যা পদবী বা পদগৌরব নিয়ে, সেটা চর্ম-বসা ভেদ করে কত গভীরে—একেবারে আমাদের অন্তস্তল পর্যন্ত ঠেলে ঢোকে তা বোধ হয় জানেনা। অক্ষয়বাবু সেদিক দিয়ে মুক্ত পুরুষ, তাইতে তাঁর স্বভাবটি পদগৌরবের জন্তেই যেন আরও বেশি করে অমায়িক করে তুলেছে। কথা হোল পরদিন সন্ধ্যায় এখানকার যারা 'আর্টিস্ট' তাদের সবগুলিকে নিয়ে হাজির করবেন।

আমাদের বাড়িতে আছে চারটি ছেলে। তাদের মধ্যে বড় দুটি গম্ভীর হয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত দিন। একটিকে বলা হয়েছে প্রবন্ধ পাঠ করতে। সমস্ত দিনের মধ্যে কতবার কত জায়গায় দেখলাম, চুপ করে বসে আছে। কখনও খাতা পেন্সিল নিয়ে, কখনও বা খালি হাতেই। ঠিক খালি হাতেও বলা যায় না—যে মাথাটা খাতায়-পেন্সিলে কোন যোগাযোগ ঘটাতে পারছে না সেটাকে হাতের তেলোয় নিয়ে। খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

অপরটিকে একটা 'আবৃত্তি' দেওয়া হয়েছে।

কতকগুলো রেডি-মেড (ready made) আবৃত্তি আছে জান নিশ্চয়, 'বৈশাখ,' 'দুই বিঘা জমি,' 'দেবতার-গ্রাস,' আরও সব। সেগুলো বাদ দিয়ে একটা নতুন ঠিক করে দিয়েছি। না মুখস্থ করে উঠতে পারে, 'বৈশাখ'ই আওড়াবে, কিন্তু সে-কথাটা আমি মনে মনেই রেখেছি। ও বইটা হাতে নিয়ে একবার বাগান, একবার বিছানা করে বেড়াচ্ছে। ভাবটা যেন, এই—মেজকাকাকে আমরা গাড়ি থেকে পথ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম!—খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা আর কাকে বলে ?

ছোট দুটিকে সমস্ত দিন দেখলাম না। অনুমান করছি দাদাদের দুরবস্থা দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে—উৎসব-উৎসব করে যে লাফিয়ে উঠেছিল, উৎসবটা বস্তুত সে-ধরণের কিছু নয়। আমায় এড়িয়ে চলেছে।

সন্ধ্যার সময় রবিবাবু আর অক্ষয়বাবু তাঁদের 'আর্টিস্টদের' নিয়ে এলেন। আজ আরও একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হোল; এখানকার ডেপুটি পুলিশ সুপার বিশ্বম্ভরবাবু। বাঙালী হিসাবে বিশিষ্ট চেহারা; দীর্ঘচ্ছন্দ, সুগৌর; আলাপ চলছিল, এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে রবিবাবু আর অক্ষয়বাবুর সঙ্গে 'আর্টিস্ট'দের দল গেট দিয়ে ঢুকল। রমলা, দীপ্তি, ছন্দা,

রতন, অরুণ, ঝর্ণা। রমলা বড়, একটু গম্ভীর হয়েছে। ঝণ্টু ওরই বোন, সবচেয়ে ছোট। একটু গম্ভীর থেকে বড় না হওয়ার ত্রুটিটা ঢাকবার চেষ্টা; বাকি সবই উৎসবের আঁচ পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। "কি পার্ট আমাদের দেবেন?···ছন্দা জবাদি'র (রমলার) বোন, খুব ভালো নাচতে পারে।···রতনেতে আর মিটুতে একটা কমিক করবে···আর আমি···"

একজনেই বলছে না, কে আগে গুণাবলীর পরিচয় দেবে তার হুড়ো-হুড়ি পড়ে গেছে। দিন পাঁচেক এসেছি, সাহারসার এ বাড়ি যে এই রকম মুক্ত কাকলিতে ভরে উঠতে পারে, কল্পনাও করে উঠতে পারিনি।

অক্ষয়বাবু এগিয়ে এলেন।

"সব এই রকম করে হল্লা করতে হয়? উনি দেখেশুনে যেমন ঠিক করে দেবেন সেইরকম হবে। তোমরা চুপ করে দাঁড়াও সব।"

দেখলাম এদের কাছে উনি আরও হাল্কা, গোছগাছ করে দাঁড় করিয়ে পরিচয় দিতে একটু সময় নিলে—সেকেণ্ড অফিসারের গাম্ভীর্য টেনে আনবার হাজার চেষ্টা করেও কোন ফল হোল না।

রমলা গাইবে; একাও, আবার কোরাসে লীড্ করবে। অরুণ, ছন্দা, ঝণ্টু (ওর ভালো নাম ঝর্ণা)—এরা এই চার ভাই-বোন, রবিবাবুর ছেলে-মেয়ে—ছন্দা নাচবে, অরুণ আবৃত্তি, আর ঝণ্টু?

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে ছোট ডুটু এতক্ষণ ঘরের একটা দোরের পাশে কতকটা গা ঢাকা দিয়েই দাঁড়িয়েছিল, ঠিক করে উঠতে পারছে না—মেজকা'র সামনে আত্ম-প্রকাশ করবার এখনও সময় হয়েছে কিনা; আর থাকতে না পেরে উত্তরটা মুখে করে বেরিয়ে এল—"ওর সবচেয়ে ভালো 'গরুর গাড়ি'টা।···শুনিয়ে দে না রে ঝণ্টু, ভয় কিসের? মেজকা' সেরকম লোক নয়।"

—যখন মুরুব্বিয়ানা করে, বেশ সাহসের সঙ্গেই করে।

"আর জান মেজকা'?—অক্ষয়দা' বলছিলেন—ডুটু তুই সেই 'ডুড্ম্ পট্স সিং'টা করবি, আর মিটুদা আর রতন করবে 'গল্প বলা'।···সামনে আয় না মিটুদা', মেজকা' দাদার মতন প্রবন্ধ লিখতে বলবেন না।"

"লিখতে বললে যেন লিখতাম না!"—বলতে বলতে মিণ্টু অন্য একটা দোরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল।

দীপ্তি ডেপুটি সুপারের মেয়ে জবার পরেই, একটু বেশি লাজুক; এই বয়সে শুধু আড়ালে আড়ালে রইল, কোরাস গান ভিন্ন আর কিছুতে নামতে রাজি হোল না; বেচারির কণ্ঠস্বরটুকুও আড়াল খোঁজে আর কি।

প্রোগ্রাম ঠিক হোল।

বেশ হোলও। তিনটে দিন বেশ সাড়া পড়ে গেল সবার মধ্যে, প্রোগ্রাম গেল বেড়ে। লোকও; অপ্রত্যাশিতভাবেই। লেডী ডাক্তার মিসেস দত্ত একজন গুণী, তিনি দেবেন সেতার। আরও 'গুণী' সাহারসার বালি-চাপা পড়ে আছে কিনা খোঁজ পড়ে গেল।

ভালো যে হোল তার শুধু প্রোগ্রাম করবার যশটুকু মাত্র আমাদের প্রাপ্য; অল্প সময়েই টের পেলাম আসল কাজের দিকটায় রয়েছেন একজন অন্তঃপুরচারিণী, রবিবাবুর সহধর্মিণী, তিনি সবাইকে গড়েপিটে দিচ্ছেন।··· যশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে বলতে পার?—লক্ষ্মী তো হলেন বিত্তের, সরস্বতী হলেন বিদ্যের—দুজনেরই খামখেয়ালের অন্ত নেই, যশের যিনি তিনি কিন্তু এ দু বোনকেও যান ছাড়িয়ে।—আমাদের এই ব্যাপারটাতেই দেখো না—সবচেয়ে যাঁর বেশি প্রাপ্য তিনি একরকম বিলকুলই বাদ পড়ে গেলেন; তাঁর পর যাঁরা, বাইরের দিকের সবটুকুই যাঁরা খেটেখুটে দাঁড় করালেন, 'আর্টিস্ট' একত্র করে দেওয়া থেকে আসরের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত, মায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার ইণ্টারেষ্ট জাগিয়ে তোলাও—শ্রীমতী মিত্রের তুলনায় তাঁদের প্রাপ্য খানিকটা হয়তো মিটে থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের পরিশ্রমের অনুপাতে কতটুকুই বা?···সমস্ত যশটা এসে আমার কাঁধে জড়ো হোল, যে বেদান্তের ব্রহ্মের চেয়ে নির্লিপ্ত নির্বিকল্প হয়ে একেবারেই একান্তে ছিল পড়ে। নাকি আমারই 'শুভাগমন' হয়েছে বলে সাহারসায় এইটুকু সম্ভব হোল···আমি না দাঁড়ালে সবাই এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকত।·· সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের আগে আবার পরেও যাঁর সঙ্গেই নতুন পরিচয়—মুখে ঐ; পরিচয় করবার জন্যেও এত ব্যস্ত সবাই যে তাড়াতাড়ি

যে অন্তরীক্ষে নিজের জায়গাটিতে সরে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করব তার উপায় নেই। মুশকিল হয়েছে এইখানে যে সমাজব্যবস্থা এমন, অন্তঃপুরিকাদের যশোভাগিনী করতে যাওয়া অশোভন; তারপর, ওঁকে এক রকম বাদ দিয়েই এঁদের দু'তিনজনকে নিয়ে সত্যপ্রচারের যে চেষ্টাটুকু করা গেল, তাতে সর্বমূলাধার বলে যে যশটা দাঁড়িয়েছিল, বিনয়ের অবতার বলে সেটা আবার এমন হু-হু করে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে হাল ছেড়ে তরী ভাসিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। Some have greatness thrust upon them—যশ যদি তোমায় তাড়া করে বেড়ায় তুমি আত্মগোপন করবে কি করে?···এই সঙ্গে ও-কথাটাও ধরতে হয়, অর্থাৎ মেয়েদের অদৃষ্ট। খেটেখুটে দশ-ব্যঞ্জন-ভাত রেঁধে পরের সামনে ধরে দেওয়ার জন্যেই ওঁদের জন্ম—নিজের পাতে তো খোসা-ডাঁটা-কাঁটার ছ্যাঁচড়া।

ছেলেমেয়েরা চমৎকার করলে। এমনকি মানসের প্রবন্ধটাও উপভোগ্য হয়ে উঠল। এক বিষয়ে আবার আমিই যশের অধিকারী, অনেক দেখেশুনে অধিকারটা লাভ করেছি। আমাদের কৃষ্টিগত যতরকম অনুষ্ঠান হয়, একেবারে প্রবাসী-অপ্রবাসী সাহিত্যসম্মেলন থেকে আরম্ভ করে, তাতে প্রবন্ধ থেকে নিয়ে সব রকম মৌলিক রচনাই যথাসাধ্য বাদ দেওয়াই কৃষ্টি; তাই ও জঞ্জাল আর বাড়াইনি; তাইতেই হয়তো ওটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়নি। প্রশান্তও আবৃত্তির ফাঁড়া বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠল।

সবচেয়ে চমৎকার হোল ছন্দার নাচ। বছর আট-নয়েকের মেয়ে, শ্যামবর্ণ গোলগাল গড়ন; দুটি নাচ দিলে। সার্থক নাম রেখেছে ওর বাপ-মায়ে। একটি ছোট ছোট লতা, শাখা-প্রশাখায় ছন্দে দুলছে—নিতান্ত সহজ, ওর পক্ষে যেন নিতান্তই স্বাভাবিক—এমনটি আর কোথাও দেখিনি; আর, সব জায়গা ছেড়ে সাহারসাতেই এসে দেখব, কল্পনাও করতে পারিনি কখনও।

কিন্তু যাক্, ঝণ্টু মনে মনে চটবে, তার কথা এখনও বলা হয়নি। ঝণ্টু ছ'বছর ছাড়িয়ে সাতের কাছাকাছি হয়েছে; অর্থাৎ জীবনে এই তার প্রবেশ। কিন্তু পদক্ষেপ এর মধ্যেই বেশ দৃঢ়। একদিকে

গম্ভীর আত্মবিশ্বাস আর একদিকে সব বিষয়েই সুস্পষ্ট একটি মতামত (ভুল নির্ভুল, যাই হোক) ওকে বেশ একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বয়সে সবচেয়ে ছোট হয়েও ও একটুখানির মধ্যে দলটির ভেতর বিশিষ্ট হয়ে উঠল। একটু কাড়াকাড়িও পড়ে গেল ওকে নিয়ে—কেমন করে ফ্রক দুলিয়ে গট্‌গট্‌ করে সামনে এসে দাঁড়ায়, কিছু জিগ্যেস করলে উত্তরের প্রকারভেদে কেমন করে ছোট্ট মাথাটুকু সজোরে ওঠে দুলে বা রেলের পাখার মতন একেবারে পড়ে পাশে লটকে, একটু সন্দেহের অবকাশ রাখলে না যে প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করা দরকার মনে করবে তুমি। ওর কতকগুলো কথা এর মধ্যে ক্লাসিক হয়ে গেছে। ওর মা একবার ওকে বাড়িতে রেখেই বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।···"তোমার মা যখন চলে গেলেন, তুমি কেঁদেছিলে ঝণ্টু?"···ঝণ্টুর মাথাটা রেলের পাখার মতন পাশে লটকে পড়ে, উত্তর হয়—"হ্যাঁ,···দু'দিন।"···দু'দিন-এর ওপর জোর দিয়ে দু'টি আঙুল সোজা করে তুলে ধরে। চোখ দুটি ওর স্বভাবতই উজ্জ্বল, মুখটাও গম্ভীর, তাতে তোমার মনে হবে, উত্তরটা যেন কতকটা চ্যালেঞ্জ; কতকটা যেন এইরকম—"আপনি কি মায়ের জন্যে দু'টো দিন কাঁদা যথেষ্ট মনে করেন না? তাহলে বলুন, আপনার মতামতটা না হয় একবার শুনি।"

এইবার ঝণ্টুর আবৃত্তি 'গরুর গাড়ি।'···"দেখো ঝণ্টু, খারাপ হ'লে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হবে।"

গট্‌গট্‌ করে দলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঝণ্টু পরীক্ষা দিতে—

চলে গোরুর গাড়ি দূরে তরুর সারি
গাড়োয়ান গুন্‌ গুন্‌ গায়
চলে পথের পাশে সাঁঝে আঁধার আসে,
গাড়োয়ান জোরসে হাঁকায়।

সে যা গলার স্বর, আনত শরীরে দুটি হাতের দোল, সে যা ছন্দ, তোমার মনে হতেই হবে ঝণ্টু বলবে বলেই এ পদ্য হয়েছিল রচিত, কিম্বা এই পদ্য বলবে বলেই ঝণ্টুকে এইরকম করে হয়েছে গড়া। ভাবে, ছন্দে, ব্যঞ্জনায়

এমন পুরোপুরি মিল কেউ কখনও দেখেনি। যাত্রা সাঙ্গ করে—"গাড়োয়ান, খাবে হুন ভাত।"—বলে যখন ছোট মুঠিটুকু দিয়ে কাল্পনিক হুত ভাত খাওয়া দেখিয়ে শেষ করলে, উচ্ছ্বসিত 'বাহবা' পড়ে গেল। ঝণ্টুর বিশেষ দৃক্‌পাত নেই, সরে দাঁড়িয়ে সেইরকম গম্ভীর দৃপ্ত দৃষ্টিতে পরীক্ষকদের মুখের দিকে রইল চেয়ে, তার মানে করলে এই দাঁড়ায়—"না, যদি অন্যকে দিয়ে দেবার মতন হয়ে থাকে মনে করেন তো তাও স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আপনারা!"

বিজয়িনী ঝণ্টু, ঐ করলে বাজি মাৎ। যেটুকু বা বাকি ছিল, কথায় সেটুকুও দিলে পূরণ করে—

নেচেও ছিল। খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নম্বর দিয়ে ধরলে ছন্দার নাচই হয়েছিল সমস্ত অনুষ্ঠানটুকুর মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য। আসর ভেঙে গেলে সেই কথাই হচ্ছিল; সবচেয়ে বড় কম্‌প্লিমেণ্টটা দিলে কিন্তু ঝণ্টু—যখন দিদির প্রশংসা একেবারেই বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে—মুখটা হঠাৎ তুলে, মাথায় ছোট একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"হ্যাঁ, আমার চেয়ে ভালো হয়েছিল।"

এতে ভালোমন্দর বিচার তোমরা যে যেমন করবে করো। কে রইল সবার ওপর?

হাওয়ায়-ধুলোয়-তাতে যেরকম মাতামাতি চলেছে সে হিসেবে সন্ধ্যাটি ছিল বড় মোলায়েম। বাঙলা মায়ের কাছ থেকে নববর্ষের আশীর্বাদও এসেছিল,—এ-হাওয়াটা পড়ে গিয়ে একটা যে ঝিরঝিরে হাওয়া উঠেছিল সেটা বাঙলার দক্ষিণে হাওয়ার মতনই মিঠে। শেষের দিকটায় কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদও উঠল জেগে, একটি অপরূপ মাধুর্যের মধ্যে আমরা পরস্পরের কাছে নিলাম বিদায়। বিশেষ করে আমার এইটুকু দরকার ছিল যেন; একটু নিঃশ্বাস নেওয়া গেল, আবার কুশী-প্রাঙ্গণে পড়তে হবে ঝাঁপিয়ে।

একদিন মাইল পঁচিশেকের একটা চক্কর দিয়ে এলাম। রেল কামরার মধ্যে থেকে বা সরকারী বাংলোর প্রশস্ত বারান্দা থেকে শৌখীন রোমান্স নয়

এবার, জীপ মোটরে করে একেবারে পথের ওপর। একটু টাকাও দরকার, কিঞ্চিদধিক চারহাজার বর্গমাইলের এই বিরাট কুশী-প্রাঙ্গণে—গোটা তিন-চার শহর মিলিয়ে মাইল চারেকের পাকা রাস্তা আছে কিনা সন্দেহ। সব কাঁচা রাস্তা, লোকে সাধ্যমতন মাটি ফেলে ঠুকেঠাকে একটু ভদ্রগোছের করে রাখছে, কুশী সাধ্যমতো ভেঙেচুরে বালি ফেলে আবার তাকে নিজের মন-মেজাজের মতন করে নিচ্ছে—এখানকার রাস্তার এই ইতিহাস। একটা নদী এযুগেও মানুষের সামনে এমন বুক ফুলিয়ে চলতে পারে, এদিকে না এলে বিশ্বাস করতে পারবে না।···দামোদর পুরুষ, সেও বশ মানলে বোধ হয়; মেয়ে হ'লেও কুশীকে কোন্ মন্ত্রে বশ করা যাবে, কোন্ শাসনে শায়েস্তা করা যাবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না; অবশ্য তুমি যদি বল—'মেয়ে হ'লেও' বলার চেয়ে 'মেয়ে বলেই' বলা ঠিক, তো সে আলাদা কথা।

আমাদের গন্তব্য মধেপুরা, এখান থেকে মাইল বারো। মধেপুরা আর সুপৌল হচ্ছে সাহারসার দুটি মহকুমা; মণি যাচ্ছে তদারকে; রোদ-বাতাসের অবস্থা দেখলে উৎসাহ হয় না, তবু সঙ্গ নিলাম। জীপ না হলে গোরুর গাড়ি সম্বল; কুশী-প্রাঙ্গণে গোরুর গাড়ি হচ্ছে তুষানল।

আমার মূল লক্ষ্য মধেপুরাই। বড় পিসিমা রয়েছেন। আশি বৎসরের বৃদ্ধা, পাকা আমটি হয়ে রয়েছেন, যে-কোন দিন খসলেই হোল।···সবাই পরামর্শ দিচ্ছে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়ে একটু ঠাণ্ডা পড়লে বেরুতে; কিন্তু সাহস হয় না; বিশেষ করে এতটা দূর এসে; নোটিস, বিনা-নোটিসে সবাই কেমন টপটপ করে সরে পড়তে বাহাদুর তা দেখলাম তো—বাবা,মা,দাদা···

দুপুরটাকে সাধ্যমত তফাতে রাখা দরকার। আমরা সাড়ে আটটার সময় বেরিয়ে পড়লাম; অবশ্য কুশীর সাড়ে আটটা অন্ত অনেক জায়গার বারোটাকে টপকে যায়; রোদ বেশ কড়া হয়েছে, হাওয়াটাও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

রেল পেরিয়ে দু'চারটে দোকান, বাঁয়ে রইল ঝন্টুদের বাড়ি, ধুলোর ভয়ে চটের পর্দায় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে; বাঁয়ে সিনেমা, স্কুল, মিশন; মিশনের কৃষ্ণচূড়ার গাছ লালে-লাল, যেন আগুন ধরেছে; আরও গোটাকতক বাড়ি

ডাইনে-বাঁয়ে রেখে জীপ এসে পড়ল খোলা জায়গায়। মাটির রাস্তাও একটু শক্ত হয়তো বাঁচা য্যায়; বৃষ্টির দেখা নেই, গোরুর গাড়ি আর মাঝে মাঝে এইরকম জীপের দাপটে ভেঙেচুরে আলগা হয়ে গেছে, ওরই মধ্যে কোথায় একটু সমতল আছে খুঁজতে খুঁজতে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। খানিকটা অবকাশের পর ডানদিকে একটা বড় গ্রাম, ডাইনেই টানা চলে গেছে। "এটা কোন্ গ্রাম?"···মণিই ড্রাইভ করছিল, বললে—"সাহারসা···এই আসল সাহারসা।"

"তার মানে আমাদের যে সাহারসা তার নামটা পর্যন্ত ধার করা।" মণি হাসলে; ওর জেলা-শহরের দৈন্যে কি কপালের-জোরে বোঝা গেল না।

এরকম বিনা-পুঁজিতে দাঁড়িয়ে যেতে এক সুর এ্যাণ্ড কোম্পানীকেই দেখেছি—খালি বাক্স পাশে নিয়ে বাজারে বসল—শেয়ার বিক্রি করে সেটা এল ভর্তি হয়ে, বাকিটা যা লোক রাখলে তাদের মোটা জামানতের টাকায়; দিন কতকের মধ্যেই কোম্পানী ফেঁপে উঠল। তফাৎটা এই যে, কোম্পানীর জন্যে বুড়ো আদিত্য সুরকে খাটতে হয়েছিল—ছেলেরা নাম দিয়েছে আদিসুর; সাহারসাকে দাঁড় করাবার জন্যে কোনও আদিসুরের দরকার হয়নি, সব আপ্‌সে হয়ে যাচ্ছে।

আপাততঃ ওই আদি, অকৃত্রিম সাহারসাই একরকম শেষ গ্রাম। এর পর মাঠ পড়ল ছড়িয়ে; দুদিকেই। ক্বচিৎ এক আধটা বাড়ি দূরে দূরে; এক আধটা গাছ; তাও কমে আসছে। বারান্দা থেকে ডানদিকে যে মাঠটা দেখতাম এ তারি বর্ধিত সংস্করণ, এক আধগুণ নয়। দুপুরে এই বিরাট মঞ্চে যে মাতুনিটা উঠবে তার তোড়জোড় এখন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে; গৌর-চন্দ্রিকা। দূরে একটা ঘূর্ণি উঠল জেগে। সকালই তো, নটাও হয়নি এখনও, সে-হিসেবে বেশ পুষ্ট, দুপুরে কি দাঁড়াবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

সাহারসা গ্রাম পেছনে ফেলে আমাদের জীপ খাড়া পুব দিকে এগিয়ে চলল। আর পেছনে উড়িয়ে চলল ধুলো। সে-ধুলোর আন্দাজ তুমি ঘরে বসে করতে পারবে না, অন্য কোন রাস্তায় বেরিয়েও না। মোটরের নিজের ওড়ানো ধুলো তার নিজের ঘাড়ে এসে পড়তে সময় পায় না, তবু যখনই

কোন কারণে গতিটা একটু নরম করতে হচ্ছিল, সেই ধুলো এমন করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছিল যে একেবারে দম আটকে দিচ্ছিল।

এমন অবস্থায় অভ্যাসের বশেই আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়, একটা টোটকার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন—তেমন তেমন দুরবস্থার মধ্যে পড়লে সেই সেই অবস্থার ভেতর থেকে কিছু নীতিজ্ঞান সঞ্চয় করে নেবার প্রয়াস ক'রতে, তাতে মনটা অন্যদিকে গিয়ে কষ্টের যেমন খানিকটা লাঘব হবে তেমনি মাঝ থেকে খানিকটা লাভও থেকে যাবে হাতে। তাঁর নিজের এ অভ্যাসটা ছিল, তা ভিন্ন বিতরণ করবারও ঝোঁক ছিল একটা।···আমিও একটা নীতি টেনে বের করেছি, এই যে, আমাদের নিজেদের দুষ্কৃতির পরিণাম থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করি বটে, সমর্থও হই, কিন্তু অবস্থা একটু প্রতিকূল হলে (যেমন মোটরের গতি শ্লথ হয়ে পেছনকার হাওয়া এসে পড়া), সেই দুষ্কৃতির পরিণাম (যেমন এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ-সুবিধের জন্যে মোটর হাঁকিয়ে রাস্তায় ধুলো ওড়ানো) এমন ক'রে সুদে-আসলে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে যে পাঁচদিনের দুষ্কৃতির ফল এক-দিনেই উসুল হয়ে যায়।

নীতিজ্ঞান বিতরণ করাটা মানুষ মাত্রেই একটা মজ্জাগত···কি বলব?··· রোগ বলাই ভালো, কেননা দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত এই নীতিজ্ঞানই লাভ হয়েছে আমার। গাড়িতে দুটি ছেলে, মানস আর সুশান্ত, আমাব জিভ চুলকুচ্ছে। ভাষাটা বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে ঘুরে তাদের বুঝিয়ে দিতে যাব, মোটরটার গতি একটু বেশি রকম শ্লথ হয়ে গিয়ে এমন একটা প্রচণ্ড ধুলোর মেঘ এসে নাক-মুখ-চোখে ঢুকে পড়ল যে শেষ করব কি আরম্ভই করতে দিল না। সেই গল্পটা জান তো?—'আ' বলতে দিলে না তো আতাউল্লো!

অবশ্য এ থেকেও একটা নীতিজান সঞ্চয় হোল, এবং আপাতত সেইটেই সম্বল করে মুখ বুজে রইলাম বসে।

সোজা পুবে চলেছি ছুটে। গ্রাম নেই বললেই চলে, দূরে কাছে ছাড়া ছাড়া দু'একখানা করে ঘর, পথে ছায়ার নাম গন্ধ নেই একেবারে, এরকম নির্মমভাবে তরুহীন দীর্ঘপথ এর আগে দেখিনি কখনও। অথচ চষা মাঠই

দু'দিকে। বালি যে আছে বেশি তাও নয়, নদীরও কোন চিহ্ন দেখছি না। শুনলাম এই ধরণের জায়গাগুলো কুশীর পুরাকীর্তি। বহুপূর্বে এই প্রান্তে কখন হয়েছিল শুভাগমন, এখন আবার জায়গাটা ধীরে ধীরে সামলে উঠছে। তবে গাছ পোতবার সাহসটা এখনও ফিরে আসেনি কারুর, শুধু দুটি অন্ন করে নিতে দাও কোন রকমে, তাইতেই যশ গাইব—হে কোশী মইয়া, তাইতেই জোড়া পাঁঠা চড়াব তোমায় ছিৎনীর ঘাটে গিয়ে।'

একটি পথিক নেই। ভালোই; এই টানা তিন চার মাইলের ছায়াহীন পথ বেয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, সে দৃশ্যটাও সহ্য করা কঠিন হোত।···বিজ্ঞানকে দিচ্ছি ধন্যবাদ—জীব আমাদের বেঁচে থাক, বড় দুঃখের ধন—গত মহাযুদ্ধের সাগর-ছ্যাঁচা মাণিক—মৃত্যু-সাগর মন্থন করা।

বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার সমান্তরালে রেলের লাইন। তারই উঁচু বাঁধের ঘাস একটা হরিৎ রেখা টেনে বর্ণহীন শুভ্রতার গায়ে তবু একটু রঙের আমেজ এনেছে; চোখের একটু তৃপ্তি। তাছাড়া রেল লাইনের একটা চিরন্তন সান্ত্বনাও থাকে এসব জায়গায়—অর্থাৎ তুমি সভ্যতার মাঝেই আছ এখনও আশা ছেড়ো না।·· কুশী প্রাঙ্গণের রেলও এক দুর্লভ দৃশ্য। যা ছিল ভেঙেচুরে একশা করে দিয়েছে। এখনও যেটুকু আছে তার একটা মোটা অংশ মাত্র ফেয়ার-ওয়েদার ট্রাক—শীত আর গ্রীষ্মের ক'টা মাসের জন্যে, জলে নামলেই মাঝে মাঝে গুটিয়ে নিতে হয়—তখন রেল আর নৌকা—সভ্যতার আদিমতমের সঙ্গে সভ্যতার অধুনাতমের হাত ধরাধরি—সেধে এসে হাত ধরে অবশ্য সভ্যতার আধুনিকতমই, যে অতিবড় দেমাকে মুখ ঘুরিয়ে গিয়েছিল এড়িয়ে।

বেশ লাগে, এইজন্যেই তো কুশীকে আরও ভালবাসি—বাঘ-গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়ায়।···তুমি চোট' না, রেলকেও বাসি ভালো, তবে দেমাককে ভালোবাসি কি করে?

তিন চার মাইলের সেই পথটা কাটিয়ে একটা ভাঙা জায়গায় এসে পড়েছি; ডাইনে একটু দূরে গাছপালা, গ্রাম, ছোটখাট ক্ষেতে কিছু শস্য। সেইদিক থেকে একটা পথ এসে আমাদের পথটাকে টপকে বাঁয়ে চলে

গেল; এদিকেও গ্রাম, আরও ঘন বসতি, আরও একটু ঘন-সবুজ; এবার চোখের তৃপ্তির সঙ্গে আরও একটু কিছু—আনন্দ—নয়নোল্লাস।

গ্রামটা বৈজনাথপুর, রেলেরও একটা স্টেশন, দূরে পড়ে গেল, তবু আছে তো, সেই জ্ঞানটাও যথেষ্ট।…একটা বেশ টানা বাড়ি, সামনে খানিকটা প্রাঙ্গণ। মণি বললে—বৈজনাথপুর হাইস্কুল। গ্রামের মধ্য দিয়ে নদীও গিয়েছিল, তার শুষ্ক গহ্বরের বালি ঠেলে আমরা স্কুলের সামনে গিয়ে উঠলাম।

মর্নিং স্কুল চলছে, ছুতোনাতা করে দু'একটা ছেলে প্রায় সব ঘর থেকেই বারান্দায় দাঁড়াল, মোটর দেখলেও এখানে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকে, সপ্তাহে কবারই বা জোটে কপালে? নদী পেরুতে আমরা উত্তরমুখো হয়েছিলাম, স্কুলটা পেছনে রেখে আবার পুবমুখো হ'লাম। একটু এগিয়েই বড় বড় গাছপালায় ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি দিব্যি মাঝারি সাইজের বাংলো; শুনলাম আগে নীলকুঠী ছিল, এখন এ প্রান্তের ডেপুটি স্কুল-ইন্সপেক্টারের আফিস। পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে যেও, নীলকুঠীর মধ্যেও একসময় স্কুলের আবহাওয়া ঢুকবে কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল কখন?… মনে করনা সেই যুগ; জেলা শহর ভাগলপুর থেকে দু'শো মাইল দূরে তার ওপর যোগাযোগেও সেইরকম—মাঝখানে কুশীর শত বাধা—এইখানে একচ্ছত্র আধিপত্য করছে, 'জন বুল'-এর প্রতিনিধি—নিতান্তই বাপে-খেদান মায়ে-তাড়ানো ছেলে—টম, ডিক, হ্যারি—যেই হোক; বাছা নমুনা, গুণের মধ্যে কাঠ-গোঁয়ার, বিদ্যে, সেদিকে ক' অক্ষর…

না, ও প্রবাদটাও অচল এখানে। অচল বলি কেন?—আশীর্বাদই।

থাক সে পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা। যাচ্ছে চলে, এসেছে নব-যুগ এইটেই আজকের বড় কথা।'সিভিলাইজেশন'কে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কত কীই তো এল—নীল, চা, আফিম, ক্রীতদাস—আফিমের কথায় মনে পড়ল—আমাদের ধর্মপ্রাণতার বাড়াবাড়ি দেখে ওদের অনেকে বলে—Religion to them is like opium.—অর্থাৎ ধর্ম আমাদের মনটাকে আফিমের নেশার মতন রাখে ঝিমিয়ে, কর্মবিমুখ ক'রে। ওরা কিন্তু ভোলে কেন যে,

Opium has been to them a Religion. এই ধর্মতত্ত্বের বলেই ওরা একদিন সমস্ত চীন দেশটার ওপর নিজেদের আধিপত্য করেছিল বিস্তার। মজার কথা এই যে—সেই চীন দেশেরই ওপর, যাকে ওদের ধর্মরূপী আফিমের স্থানে আমাদের আফিম-রূপী ধর্ম দিয়েই আমরা একদিন অন্যভাবে করেছিলাম জয়!...এখন আমরা পড়ে আছি নিচুতে, হৃত-গৌরব, সবই মুখ বুজে শুনে যেতে হয়, কিন্তু ইতিহাস কেমন ক'রে পাশাপাশি ঘটনা দু'টি একই জায়গায় সাজিয়ে রেখেছে দেখো। এও ধর্ম—যাঁর কল আপনিই বাতাসে নড়ে।

আজ যেমন জীপে করে চলেছি, আর একদিন রেলে করেও গিয়েছিলাম মধেপুরায়। তার মানে এদিক ওদিক মিলিয়ে বৈজনাথপুর গ্রামটা একরকম সমস্তটুকুই দেখা হয়ে গেছে। মোটের ওপর বেশ বড়ই, এই সব বন্যা-বিধ্বস্ত জায়গায় যেমন হয়—চারিদিক থেকে তাড়া খেয়ে যেখানেই একটু ডাঙা জমি পায়, বাড়ি করবার জন্যে সেইখানে এসে জড়ো হয় লোকে। স্টেশনটি বেশ, অনেক লোক ওঠা-নামা করলে, বেশ সজীবতা আছে। সবই প্রায় ডানদিকে, বাঁদিকে খানিকটা দূরে স্টেশন কম্পাউণ্ডের গা-ঘেঁসেই একটি ছোট্ট বাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—গাছপালার বাছাইয়ে একটু নূতনত্ব আছে; তারপর আরও একটু বিশিষ্ট মনে হোল দু'তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা বাগানের ছায়ায় ঘোরাঘুরি করছিল। একজন বয়স্থাগোছের স্ত্রীলোকও বেরিয়ে এসে একটা জায়গা থেকে কি কতগুলো তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। বেশ খানিকটা দূর থেকেই দেখা, তবু তাঁকেও যেন এ পরিবেশে একটু অন্যরকমই বোধ হোল।

শুনলাম—বাগচী-মশাইয়ের বাড়ি। ভাগলপুরের লোক, এখানে জমিজমা করে অনেকদিন থেকে ছিলেন, সম্প্রতি কিছুদিন হোলো গত হয়েছেন।

কি রকম মনে হয়। এদিকে সাহারসা পাঁচ মাইল,—পথের কথা ধরলে আরও অন্তত তিনগুণ ধরতে হয়; ওদিকে মধেপুরাও প্রায় মাইল সাতেক, পথ হিসেবে তথৈবচ; মাঝখানে এই একটিমাত্র বাঙালী পরিবার, গ্রামের মধ্যে হলেও কথা ছিল; সেদিক দিয়েও আলাদা।...আসন্ন সন্ধ্যা-আকাশের নীচে বড় অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল,—দু'দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিতান্ত নিজেদের

একটি আলাদা জগৎ রচনা করে কি এই পরিবারটির জীবন?—কী রকম করে দিন কাটায়—রাত্রির অন্ধকারে কী ধরনের জীবন এবার করবে প্রবেশ?

গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল আমাদের মোটর। রোদের তাত যাচ্ছে চ'ড়ে, তার ওপর এদিকে ভাঙাচোরার কাজও বেশি করেছে কুশী; বালির অংশ গেছে বেড়ে। আরও দু'একটা শুকন নদীর খাল পড়ল। এক জায়গায় রেলের একটা পুল ভেঙেছে, লাইনটা নিচে দিয়েই নেমে গিয়ে বেশখানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে আবার ওপরে উঠেছে...কীর্তিকলাপ দেখতে দেখতে চলেছি শ্রীমতী কৌশিকীর।...একটু জল নেই কোনখানে?...না, সাধারণ অর্থে যে তেষ্টা তা পায়নি, তবে কণ্ঠের তেষ্টার মতন চোখের তেষ্টাও তো আছে—শুকন মাঠ থেকে চোখ ফিরুলে দেখছি তপ্ত বালি—একটু ওপরদিকে চাইলেই ইথারের জ্বলন, মনে হয় আকাশের নীলটাকেই, কোন শাদা চুলের জটী-বুড়ি যেন ভাজছে বালির খোলায় ফেলে; চোখ যেন ক্ষরে যাচ্ছে।... পাওয়া যায় না কোথাও একটু জলের রেখা দেখতে?

বৈজনাথপুরের পরের স্টেশন মাঠাহি, বর্ষাকালে এই হচ্ছে রেলের সীমানা, কেননা এর পরেই যে নদীটি, বর্ষায় সেটি একেবারে প্রলয়ঙ্করী হয়ে পড়ে, টপকাবার জো নেই।

তা যখন হয় হোক, এখন কিন্তু দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছি।...পেয়েছি জল; আর, কি যে মিঠে!

মাঠাহি গ্রামের একটা বাঁক ঘুরেই আমাদের রাস্তাটা আস্তে আস্তে নেমে এল নদীর কোলে। হাত দশেকও চওড়া নয়, একটি ঝিরঝিরে স্রোত আস্তে আস্তে বয়ে চলেছে, পরিষ্কার নীল জল, দুদিকের চিকচিকে বালির কোলে আরও খোলতাই হয়েছে রঙের।...বড় মিষ্টি, চোখ দুটো ক্ষ'য়ে রয়েছে বলে আরও মিষ্টি লাগছে; মাঝে মাঝে সোণার ফসল ফলিয়েছে, মনে হচ্ছে ঐ যে গ্রামটা, ওর যেন বড় আপন কে একজন। যেন আদুরী একটি মেয়ে, সবার আদর কুড়ুতে কুড়ুতে এগিয়ে চলেছে।

অথচ এই মেয়েই একদিন নাকি ধরবে চামুণ্ডা মূর্তি।

বিশ্বাস করা শক্ত হোত যদি না দেখতাম বিনোদিনীকে।

ছেলেবেলাকার কথা। বিনোদিনী ছিল আমার এক জাঠতুতো দাদার শ্বশুরবাড়ির মেয়ে—শ্বশুরবাড়ি অর্থে অবশ্য শ্বশুরবাড়ির গ্রাম মনসাপোতা; বিনোদিনীরা ছিল কৈবর্ত,না কি। কিন্তু চোখে পড়বার মেয়ে, এমন চোখে পড়বার যে একটা দশ বছরের ছেলে, যার চোখ তখনও ফোটবার কথা নয়, তার চোখকেও ফুটিয়ে ছেড়েছিল। তার নিজের চোখ ছিল টানাটানা, দোল-খাওয়া, যেন পানসির মত জলে ভাসছে, আর অদ্ভুত রকম নরম। রংটা কালো বলে (এখন সেটাকে শ্যামবর্ণ বলতে শিখেছি) সেই চোখের নরম ভাবটা যেন সমস্ত শরীরটিতে ছিল ছড়িয়ে। বার দুই কথা শুনেছিলাম; দূর থেকেই, তাও যেন একটি কালো বাঁশির সুর। চাউনি, রং আর কণ্ঠের অদ্ভুত স্বর মিলে আমার বড় আশ্চর্য লাগত বিনোদিনীকে—আগাছায় ঘেরা গাঁয়ের ভিজে পথ দিয়ে সে যখন যেত, আমার মনে হোত···কী যে মনে হোত এখন স্পষ্ট ধরতে পারছি না, তবে এটা পুরোপুরিই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, বিনোদিনী যদি আমার চেয়ে ছোট হোত—এমন কি আমিই যদি ওর চেয়ে একটুখানিও বড় হতাম, আর, অবশ্য, ও যদি কৈবর্ত না হয়ে ব্রাহ্মণ হোত তো ওকে নির্ঘাৎ বিয়ে করে ফেলতাম। এমন কি ওর ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব হলে আমিই কৈবর্ত হ'তে রাজি ছিলাম। ওদের গ্রামে পোড়া শিবমন্দিরের দোরে এইরকম যদি'র ওপর বসানো একটা অদ্ভুত প্রার্থনা জানিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেছিলাম সেটাও বেশ মনে আছে, যদিও ছেলেবেলায় মন যে কি ভাষায় এমন হাস্যকর প্রার্থনাটা সাজিয়েছিল তার কোন আন্দাজই পাই না এ বয়সে।

মনের যখন এইরকম অবস্থা চলছে তখন কিছুদিন বাদ দিয়ে আবার একবার দাদার শ্বশুরবাড়ি গেলাম। গ্রামটা যে আমার চোখে বড় স্নিগ্ধ লাগত তার একটা কারণ এবং প্রধান কারণ নিশ্চয় এই যে আমার বিনোদিনীর অধিষ্ঠান সেই গ্রামে, তবে আরও একটা কারণ ছিল—আমি গিয়ে কবার দু'একদিন করে যা থাকতাম তাতে কোনরকম বড় কলহ-ফ্যাসাদ হয়ে শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটেনি। সেবার কিন্তু গিয়ে দেখি যে, পাড়া তোলপাড়, আমাদের পাশের পাড়াতেই তুমুল কলহ লেগে গেছে,

যাতে আমাদের এ-পাড়াতেও একরকম কান পাতা দায়। কুটুম বাড়ি গিয়েই হাতমুখ ধোওয়া, জলটল খাওয়ার পাট আগে; সেসব সারা হয়ে গেলে কিন্তু আমি বেশিরকম চঞ্চল হয়ে উঠলাম। দুটো কারণ ছিল, দুটোই পরস্পরবিরোধী, কিন্তু দুটোই প্রবল—প্রথমত ঝগড়া হচ্ছে বিনোদিনীদের পাড়ায়, যার জন্যে শ্রুতিরোচক হ'লেও আমার কাছে আবার বেশ উদ্বেগের কারণও হয়ে উঠেছে।" মোটকথা, এই দুটো বিরুদ্ধধর্মী অনুভূতির টানে একসময় বেরিয়ে পড়লাম। বিকেল হয়ে এসেছে, সুতরাং সেদিক দিয়ে বাধা নেই, বৌদিদি শুধু বললেন—"ঠাকুরপো, কৈবর্তপাড়ার ওদিকে যেও না, ওরা ঝগড়া করছে।"

আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে পড়লাম।

একটা মাঝারি গোছের পুকুর, তার এ-পাড়—ও-পাড়ে সামনাসামনি হয়ে দাঁড়িয়ে দুটি দল করছে ঝগড়া। আমি আমার দিকের পাড়াটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

মেয়েদের দল। পুরুষেরা কথায় ঝগড়া বেশিক্ষণ চালাতে পারে না, হাতাহাতি ক'রে পণ্ড করে ফেলে। এখন দৃশ্যটা যতটুকু মনে পড়ছে তাতে বোধহয় দল দুটো ছিল অসম—একদিকে ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে জন কুড়ি, একদিকে এই দশ বারো। অবশ্য দুটো দলই আস্তে আস্তে পুষ্ট হ'য়ে উঠছে।

দেখবারই জিনিস, কতরকম হাতনাড়া, কতরকম অঙ্গভঙ্গি, কতরকম কণ্ঠ, কতরকম অশ্রুত ভাষা...এমনি প্লেন গদ্যেও আছে, আবার ছড়ায় বাঁধাও; একজন মাঝবয়সী পাড়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে হন্‌হন করে ছুটে একেবারে পুকুর ধার পর্যন্ত এগিয়ে গেল, যখন মনে করছি যে সে কোন অজ্ঞাত কারণে জলে ঝাঁপ দেবে, হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা হাত মাথায় একটা কোমরে দিয়ে তিনচার পাক ঘুরে নেচে নিলে। এপাড়ে একজন, এমনি মুখে একটাও কথা নেই দু'হাতে কোঁচড়টা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু মাঝে মাঝে সেটা ঝেড়ে দিয়ে বল্‌ছে—"নে গা নে, এই সব ফিরিয়ে দিনু।"

শহরের ছেলে—ঝগড়ার মধ্যে যে এত রকমারি কাণ্ড আছে জানা ছিল না, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময় ছোট দলের দিকে, একজন সরু বুনো রাস্তা দিয়ে যেন আগুনের মতন ছুটে বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে গাছকোমর করে এঁটে বেঁধেছে, ডান হাতে একগাছা ঝাঁটা এলো খোঁপা আলগা হয়ে গিয়ে চুলগুলো পড়েছে বুকে পিঠে কপালে ছড়িয়ে; খানিকটা দূরে থাকলেও দেখতে পাচ্ছি চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসে যেন জ্বলছে।

বিনোদিনীই, তবে আমার সেই বিনোদিনী থেকে এত আলাদা যে ঠাহর ক'রে চিনতে দেরি হোল, বিশ্বাস করতে আরও দেরি। ঐ রাবণের চেড়ির মতন রূপ, তার ওপর গলার সে কী আওয়াজ! যাকে একবার কালো বাঁশির সুর বলে পরিচয় দিয়েও আশ মেটেনি তা একচোটেই যেন রামসিঙে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিককার সবার গলার ওপর উঠেছে ছাপিয়ে; যেন আর মেহনতের দরকার নেই, এইভাবে, যারা একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল তারা চুপ দিলে, তারপর ক্রমে আরও সবাই, বিনোদিনী একাই লড়াইয়ের রাশ ক'ষে ধরলে, দু'একজন শুধু মাঝে মাঝে জোগান্ দিয়ে চলল।

বিস্ময়ে, আতঙ্কে, আর নিশ্চয় নিরাশাতেও আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। বিনোদিনীর মতন যেমন অপরূপও কিছু দেখিনি, তেমনি বিনোদিনীর মতন রণচণ্ডীও কখনও চোখে পড়েনি। ঝগড়া হয়ে উঠেছে আরও জোর। একটা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে শক্ত হয়ে উঠেছে তারই লজ্জায় এদিককার সবাই যেন নিজের নিজের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে।

শেষে বিনোদিনী এক কাণ্ড ক'রে বসল। বোধহয় দূর থেকে কাজ আর কথায় মিল হচ্ছে না দেখে 'তবে র‍্যা !!'—বলে গাছকোমরটা আরও কষে ঝাঁটাটা আরও বাগিয়ে ধরলে, তারপর কচু-ভাঁট-আসশ্যাওড়ার বন মাড়িয়ে, আমি যেদিকটায় দাঁড়িয়েছিলাম সেইদিকটা ঘুরে বনবনিয়ে ছুটল।

আমার নিশ্চয় ভুল হয়েছিল—যে কোন লোকেরই হোত। আমি ভাবলাম—দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছি বলে বিনোদিনী আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটেছে; এর সঙ্গে নিশ্চয় মনের সেই গলদটাও ছিল—ওকে বিয়ে করবার

সেই অভিসন্ধিটা কোনরকমে টের পেয়ে গেছে কিনা কে জানে? "আর না গো আর না !!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই যে ঘুরে দৌড় মারলাম, হাঁপাতে-হাঁপাতে একেবারে এসে দাঁড়ালাম বৌদিদিদের উঠোনের মাঝখানে।

রোগটা সেই থেকে কিন্তু একেবারে গেল সেরে ; বিনোদিনী তো গেলই এমন কি বড়াল-গিন্নি, অনুকূলের মাসি, বনমালীর পিসি—যে যেখানে কিশোর মনে একটুখানিও আঁচড় কেটেছিল পরিষ্কার ক'রে মন থেকে গেল মুছে।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই পোড়ো শিবমন্দিরের দোরে মাথা খুঁড়ে বললাম—"হে ঠাকুর, তুমি বড্ড ভালো ; ভাগ্যিস আমায় বিনোদিনীর চেয়ে বড় করনি—ভাগ্যিস ওকে বামুন করে পাঠাওনি !..."

মনসাপোতাও সেই জন্মের মতন ছাড়লাম, যোগেন দাদার হাজার তাগাদাতেও বৌদিদির জন্যে আর কখনও মন কেমন করে নি।

মাঠাহির ছোট্ট নদীটির কথা হচ্ছিল। তা সে আবার কবে বিনোদিনীর মতন রণচণ্ডী রূপ ধরবে, দরকার কি আমার সে কথায়? দেখতে তো আসছি না সেরূপ, কাজেই এই রূপই আমার কাছে চিরন্তন হয়ে থাকবে।

গঙ্গা দেখেছি, যমুনা দেখেছি, আরও দেখা আছে শত শত নদী, ছোট, বড়, মাঝারী ; ক্ষীণাঙ্গী আবার পূর্ণতোয়াও, হরিৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে চলেছে বয়ে, কোথাও গ্রাম, কোথাও নগরী, কোথাও অরণ্য, কোথাও পর্বত নদীমাতৃক দেশের সন্তান আমি, নদী দেখায় কসুর হয় নি, শুধু মাঝে মাঝে সাধ হয় মরুভূমির মাঝখানে নীল নদটা যদি একবার দেখা যেত !

তা যাবে না, তবু মাঠাহির এই দুলারী কন্যা সে-সাধটা কতক মিটিয়েছে আমার। আমি যেন চলেছি মিশরের ঊষর প্রান্তর ভেদ করে ; শুধুই বালুর স্তূপ, যেদিকেই চাও না কেন ; খর রৌদ্রের জ্বালায় হাওয়া উঠেছে ক্ষিপ্ত হয়ে এক স্তূপের বালিরাশি উড়িয়ে নিয়ে অন্য স্তূপ রচনা করে ভাঙা-গড়ার অনন্ত খেলা তার—যেন ঠিক করে উঠতেই পাচ্ছে না এই স্ফুলিঙ্গরাশি নিয়ে কি সৃষ্টি সম্ভব। বালির গায়ে আবার ছোট ছোট ঢেউ, নিশ্চল ; কে ঢেউয়ের

পুতুল গড়ে পুড়িয়ে জমাট করে রাখলে? দূরে ঐ ইথার জলে মরীচিকার মায়ানাচন—এক কাণ্ডে আকাশ ছোঁয়া ঐ গাছগুলো কি, তাল না খেজুর? ওপরে আকাশের নীল পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বালি ঠেলে চলেছে আমাদের জীপ—আমাদের উটই, ক্লান্ত অবসন্ন-গতি তার হলদেটে রঙের ওপর বালির পলস্তারা প'ড়ে এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে, মরু-বিভ্রমে সত্যিই এক একবার মনে হচ্ছে সে মরুপোত উষ্ট্র ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

ভাবছিলাম, একটু জল পাওয়া যায় না? গলার চেয়ে চোখ দুটো যেন আরও গেছে শুকিয়ে, অন্তত যদি দেখাও যেত এতটুকু জল—খেজুরের ছায়ায় একটুখানি শ্যামল ঘাসে ঢাকা একটুখানি মাটি—পৃথিবীর অন্যত্র যে মাটিকে দেখেও দেখি না, আর তারই মাঝখান দিয়ে অতি-ক্ষীণ একটি জলের ধারা—বয়ে যাওয়ার একটু তরল শব্দ···

যে ধরিত্রী অন্য জায়গায় বিলিয়ে ছড়িয়ে শেষ করে উঠতে পারে না, এখানে এত নিষ্করুণ কেন?

ঠিক এই সময় এই নদীটির দেখা; তাই বলছিলাম মাঠাহির দুলারী আমার নীল নদ দেখবার সাধ কতকটা করেছে পূরণ।

তিনটে নৌকা আড়াআড়ি ভাসিয়ে একটা পুল, হাওড়ার পুরনো পলটুন্ ব্রিজের স্বগোত্র, তারই ওপর দিয়ে আমাদের জীপ পার হোল, রাস্তাটা একটু বেঁকে ওপর দিকে উঠেছে, বালি আরও গভীর, আরও আলগা; ধীরে ধীরে উঠছে জীপ, আপ্রাণ চেষ্টা করতে হচ্ছে, ভেতর থেকে একটা গোঙানি ঠেলে বেরুচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে কিন্তু দৃশ্যটা গেল বদলে। আমরা বন্যার এলাকা ছাড়িয়ে একটু উঁচু জায়গায় এসে পড়েছি। বৈশাখ মাস, ক্ষেতে তেমন কিছু শস্য দাঁড়িয়ে নেই, তবু কিন্তু প্রচুর শ্যামলিমা চোখে পড়ে, শস্য না থাক, ক্ষেতে আগাছা আছে; আলে, চারণভূমিতে, এমন কি আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি তারও ওপর প্রচুর ঘাস; দূরে-কাছে পুরণো গাছও সব রয়েছে দাঁড়িয়ে, দু'একখানা করে গ্রাম চোখে পড়তে আরম্ভ হয়েছে; লোকের চলাচল, বেশি না হলেও বাড়ছে আস্তে আস্তে; মেয়েরা বড় বড় পেথে পাশে রেখে ঘাস কাটছে, কেউ একটা জায়গা ফর্সা করে কাঁখে পেখে

নিয়ে দুলতে দুলতে অন্য জমির সন্ধানে চলল। দুঃস্বপ্ন কেটে এসেছে আমাদের, যেন জেগে ওঠার তন্দ্রাঘোরে রয়েছি—তাও উগ্রের পাশেই এত নরম, বিশ্বাস করাই শক্ত হয়ে উঠছে।

মধেপুর আর বেশি দূর নয়, মাইল ছ' সাত এখান থেকে, পৌঁছোতে। আমাদের আরও মিনিট পনের লাগবে।...সবশুদ্ধ মিলিয়ে দু' ঘণ্টাও নয় কিন্তু মনে হোল যেন কতদিন পরে দেখলাম আবার লোকালয়ের মুখ।

বাড়িটা যে অত মিষ্টি লাগল তার এও একটা কারণ, অন্য কারণ এই যে, আবার প্রবেশ করলাম প্রায় ছ' সাত বছর পরে।

আর একটা কারণ ছিল।

ধরো, এইরকম উগ্র মরু-অভিযানের পর লোকালয়ে এসে একখানি বাড়িতে উঠলে,—কোঠা বাড়ি, দোতলাই ধরা যাক, নতুন চুণকামের ওপর রোদ ঠিকরে পড়ছে, উঠান পর্যন্ত শান-বাঁধানো, চারিদিকে ঝক-ঝক তক-তক করছে, ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যানও ধরে নেওয়া যাক, তুমি বাইরে পা-পোষে জুতো মুছে একটা চেয়ার টেনে বসলে সেই ফ্যানের নীচে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সরবতও আসছে, কিম্বা ভারতীয় চা, যা শীতে উষ্ণতা আনে আর গ্রীষ্মে করে শীতল ( কোন কুহকে তা তোমরাই জান )...কেমন হয়?

হয় নিশ্চয় ভালোই, কিন্তু আমি যেখানে গিয়ে উঠলাম তার মতন অত ভালো কি?—

রাস্তার পাশে নিবিড় ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটুখানি জমি পেরিয়ে আমি চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা দিলাম কাঁচা মাটির উঠোনে, রাস্তার ওধারে রেখে এসেছে মুখুজ্জেদের টানা বাগান। উঠোনের বাঁদিকে এক সারি ঘর, খোলার চাল, সামনে বারান্দা। ডানদিকে ধানের মড়াই, তার পরেই উঁচু পাতকুয়ো ধারে ধারে উঁচু মাটি ফেলে আস্তে আস্তে উঠোন পর্যন্ত নামিয়ে আনা হয়েছে। মাটির যে সিঁড়িটা পাতকুয়োর ওপর পর্যন্ত গেছে উঠে তার এক ধারে গোটাকতক মল্লিকের ঝাড়, এক ধারে রাঙা নটে শাকের চারা; অপরিমিত জল, তাতে মল্লিকের ঝাড় হয়ে উঠেছে ঘন পাতায় গাঢ় সবুজ, তার ওপর শাদাশাদা কুঁড়ির চুমকি বসানো; ওদিকে শাকের ক্ষেত লালে লাল।

উঠোনের ওদিকে রান্নাঘর, তারই লাগোয়া আরও একখানা ঘর,এটা-ওটা থাকে ; সামনে একটি ফলন্ত পেয়ারা গাছ। উঠোনটা একে কাঁচাই, তার ওপর দুদিক'কার টানা ঘর, পেয়ারা গাছ আর এদিককার ধান মড়াইয়ের ছায়ায় সেটাকে পারাপারি করে অষ্ট প্রহরই আগলে রেখেছে রোদ থেকে ; শুকন খটখটে নয়, একটু ভিজে-ভিজেই আর তার জন্যেই রংটাও…কি বলা যায়?—ভিজে মাটির ঐ যে মিষ্টি রং তার যে ভাষাই তোমের হয়নি আলাদা—মেটে মেটে বললে যদি বোঝা যায় তো বোঝ, যেমন গোলাপী বললে বুঝতে পার গোলাপের রঙ।

—এসব হচ্ছে কতকটা "গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে" গোছের। পবিত্রতাই বলো, সৌন্দর্যই বলো, বা মাধুর্যই বলো, অনেক ক্ষেত্রে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে আর আমরা হালে পানি পাই না, তখন যার পূজো করব কিম্বা যার করব প্রকাশ তারই হতে হয় দ্বারস্থ।…গঙ্গাপূজোর জন্যে আর অন্য জল নেই ; গোলাপের রঙের, মাটির রঙের আর অন্য ভাষা নেই।

কিন্তু কথার খেই হারিয়ে ফেলেছি। বলছিলাম ঐরকম উগ্র মরু-অভিযানের পর কোঠা-বালাখানা লাগে ভালো, না, ছায়া-মাটি-তরু-পল্লবে রচা এইরকম একটি স্নিগ্ধ গৃহ?…না, কোঠা-বালাখানা সবাই পাক, ভগবান করুন কেউ যেন বাদ না যায় ; কিন্তু সময় বুঝে ভালো-লাগা না-লাগা—সে এক সম্পূর্ণ অন্য ধাতুর জিনিস।…কবিগুরু কেন উত্তরায়ণ ছেড়ে 'শ্যামলী'র স্বপ্ন দেখতে গেলেন?

রান্নাঘরের দাওয়ায় পিসিমা রান্না করছেন।

ওঁর পরিচয় খানিকটা পেয়েছ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বইখানায়। কিন্তু সে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা। পিসিমা এখন অশীতিপরা বৃদ্ধা, ঠিকমতো হিসেবে বিরাশি বছর গেছে পেরিয়ে। পিসিমা আমাদের বংশের একদিক দিয়ে গর্ব করবার জিনিস, বিরাশিটা বছরের চাপে একত্র শুধু বেঁকে গেছেন, এদিকে মাথা পরিষ্কার, কথায় এতটুকু অসংলগ্নতা নেই, স্মৃতিশক্তি এমন যে এখনও আমাদের ভুল শুধরে দেন। বড় বিস্ময় লাগে ওঁকে দেখে ; পিসিমা এমন একটা যুগকে কঠোর আচার-নিষ্ঠায় নিজের মধ্যে

স্থিধৃত করে রেখেছেন, যে-যুগটা ওঁর জীবনের বাইরে একরকম অবসানই হয়ে গেছে। রান্না যে করছেন সেটা নিজের জন্যে, অর্থাৎ স্বপাকই চলছে এখনও, সেই বৈধব্যের আরম্ভ থেকে একভাবে। ছেলেমেয়ে-বধূ নাতি-নাতনি-নাতবৌয়ে বড় সংসার, কেউ কিন্তু ওঁর নজরের আড়ালে নেই, আর সবার ওপরেই ওঁর প্রভাব রয়েছে অপ্রতিহত। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে উনি এসেছিলেন এই সংসারে বারো বৎসরের একটি 'কিশোরী বধূ' ( আজকাল-কার হিসেবে শিশু-বধূ বললেও অন্যায় হয় না ), সেই সময় থেকে যে সংস্কার ওঁর মজ্জায় মজ্জায় করেছে প্রবেশ, সেই সংস্কারের ভিত্তিতে উনি নিজের সংসারও গড়ে তুলেছেন—বিশেষ ক'রে মেয়েদের দিকটা। এখনও এ সংসারে জীবনের মূল সুর পূজা-ব্রতাচরণ, পড়া নয়, বিশেষ করে নিজেদের মেয়েদের এই ধারা। এখানে যে মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের কোন স্কুল নেই, পিসিমার মতে সেটা এ শহরে এখনও চারপো কলির প্রবেশ হয়নি বলেই। বাইরের মেয়ে অবশ্য গায়ে স্কুলের গন্ধ মেখে এসেছে দু'একজন, বধূরূপে ; তবে এ বাড়ির ধূপ-ধুনার গন্ধে তাদের অভিষিক্ত হয়ে উঠতে দেরি হয়নি।

তুমি বোধ হয় ভেবে সারা হচ্ছ, তাহলে এই যে নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব এর মধ্যে আমি কোন্ দিকে। এমন ভাবাটাই কিন্তু ভুল হবে। আসলে আমি কোন পক্ষ নিয়ে কথা বলছি না, যা দেখেছি তাই বলে যাচ্ছি। পিসিমার সংসার এই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, নিজের সংসারে এই শক্তিময়ী নারী নিজের সংস্কার, নিজের বিশ্বাস কোনখানে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে, দেননি, তাঁর ব্যক্তিত্ব বড় থেকে নিয়ে একেবারে ছোটটি পর্যন্ত—সবার মধ্যে হয়ে রয়েছে সঞ্চারিত। আর কিছু না হোক, এ দৃশ্যের একটা মহিমা যে আছেই এটা চোখে দেখলে তোমাকেও মেনে নিতেই হোত। নয়তো মেয়ে জুতো পরলে, কি স্কুল-কলেজ ঘুরে এলে যে জাত খুইয়ে বসবে এর সমর্থন এ যুগে কে আর করতে পারে ?

তবে প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, এই সঙ্গে আর একটি দিনের অভিজ্ঞতার কথাও বলি তোমায়—

বছর কয়েক আগেকার কথা, সেবার বেশ খানিকটা ঘুরে ফিরে মধেপুরায় এসে উঠেছি, আর এই ঘোরাফেরা এমন ধরনের ছিল যে তাতে আধুনিক থেকে নিয়ে অতি-আধুনিক পর্যন্ত প্রগতির যতগুলো স্তর আছে সবগুলো এসেছি মাড়িয়ে। ভালো ছিল তাতে প্রচুর ; যেখানে ছিল বন্ধনের গ্লানি,জীবন সেখানে মুক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে উঠছে—এ-দৃশ্য তো কম মহিমময় নয় ; কিন্তু যে-কারণেই হোক, এই মুক্তির মধ্যে যে ক্ষেত্রবিশেষে গ্লানিও এসে পরেছে সে দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। 'ডিটেল'এ যাব না, মাফ কোর, শুধু সাটে এইটুকু বলি—দেখলাম শিক্ষা বিকৃত হয়ে গিয়ে গ্লানি যেন ফেনিয়ে উপচে পড়ছে জীবনের চারিদিক বেয়ে। রূপ, বয়স অর্থ—যখনই অসংযমের মধ্যে এই তিনের হয়েছে মিলন, তখনই অঘটন ঘটেছে ; সভ্যতার গোড়া থেকে এ দৃশ্য দেখে দেখে আমরা কতকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর প্রতিষেধ ছিল একটা জিনিস, শিক্ষা। আজ দেখলাম, রক্ষকই হয়েছে ভক্ষক, এ শিক্ষাই যেন অঘটনটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে, রুচির নামে, কৃষ্টির নামে, জীবনকে ক'রে তুলেছে যেন আরও কদর্য, ভয়াবহ।

অবশ্য যেখানে ভয়াবহ, কদর্য, সেখানকার কথাই বলছি, নইলে কল্যাণও দেখেছি বইকি, ঐ শিক্ষাই এনেছে, দেখেছিও মুগ্ধ দৃষ্টিতেই। কিন্তু জানই তো—আনন্দ আমাদের মনে ততটা গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে না, যতটা পারে বেদনা, যার জন্যে একটা কমেডী আর একটা ট্রাজেডীতে এত তফাৎ।

সেবার তাই বেশ ভারাক্রান্ত মন নিয়েই আমি এসেছি মধেপুরায়। সেবারের আসাটা তোমাদের আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা চলে এক ধরনের Escapism ; মধেপুরা সুদূর, প্রচ্ছন্ন, দুর্গম, সর্বোপরি ( দুঃখের সঙ্গেই বলছি ) অল্পশিক্ষিত, আর অনাধুনিক, তাই পালিয়ে এসেছি এখানে, কিছু-দিনের জন্য ; আমার স্বেচ্ছাবৃত অজ্ঞাতবাস।

এই বাড়ি, এই পরিবেশ ; আজ দেহ মন জুড়িয়েছে মরুভূমির উত্তাপ থেকে, সেদিন এর চেয়েও বেশি ক'রে জুড়িয়ে ছিল আর একটা জিনিসের প্রভাব থেকে। পিসিমা গৌরী, দীর্ঘাঙ্গী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে একটু পরুষই, একটা যেন মস্ত বড় আশ্রয়ের পাশে দাঁড়ালাম। তারপর প্রণাম করে

উঠেছি, আমার ছোট ভাইঝি শিবপূজা সেরে পূজোর ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালো। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, টানা টানা চোখে একটি প্রশান্ত দৃষ্টি; সেটা পূজোর আসন থেকে নিয়ে উঠে এসেছে, তারপর এতদিন পরে আমায় দেখে তাতে একটি মিষ্টি হাসির আমেজ ফুটেছে, সমস্ত শরীরটিতে সদ্য অর্জিত পুণ্য যেন ঝলমল করছে; সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এর ওপর এসে পড়েছে ওর নামের প্রভাব। নাম জিনিসটা abstract, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তবুও তার একটা মস্ত বড় প্রভাব আছে জেনো। ওর নাম হচ্ছে সতী; আমার মনে হোল নানান জায়গায় ঘুরে ফিরে, নানান জিনিস দেখে, অবশেষে যেন আমাদের যা জীবন তার মর্মকেন্দ্রটিতে গেছি পৌঁছে— পূজোর ঘরের ফুল-চন্দন-ধূপের গন্ধ চারিদিকে রয়েছে ছড়িয়ে, তারই মধ্যে অধিষ্ঠিত ঐ মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যি উমা-সতী যেন শঙ্করের জন্যে তপস্যা করে এল উঠে। পূর্ব অভিজ্ঞতার গায়ে সে-দিনের সেই ছবিটি আমার মনে যে কী স্বস্তি, কী পুলক জাগিয়েছিল তা তোমায় কি করে বোঝাই? সত্যিই মনে হোল যেন ক্লান্ত পদে ঘরে ফিরে এসেছি, ঐটেই তো নিজের ঘরের, নিজের দেশের শাশ্বত মূর্তি।

গল্প চলল আমাদের। যারা এত কাছের অথচ এত সুদূর হয়ে পড়েছে তাদের গল্প অনেক। পিসিমাকে যখন পাই তখন বর্তমানের কোন মূল্য থাকে না আমার কাছে। আজ অর্ধশতাব্দীকে অতিক্রম করে এই যে আমার জীবন, এই জীবনের প্রথম মুহূর্তটি পর্যন্ত ওঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। ছেলেবেলার কথাই চলে বেশি—পাণ্ডুলের শৈশব, পিসিমার কাছে গল্প শোনা সে যেন মায়ের দৃষ্টি নিয়েই নিজেকে ফিরে দেখা—এ আনন্দ যা শুধু মায়ে বুঝবে আর ছেলেয় বুঝবে, এ আর কতদিন যাবে পাওয়া?…ডুবে যাচ্ছি আমার অতীতে, দূরে, আরও দূরে।

খাওয়া দাওয়া করে দুপুরবেলা একটি নিদ্রা দেওয়া গেল, ঘরের সমস্ত দোরজানলা বন্ধ করে একটি খণ্ড রজনী রচনা ক'রে নিয়ে। বিকেলে একচক্র বেড়িয়ে আসা গেল। মধেপুরাটাকে ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন একটা অস্নালু দৃষ্টি নিয়ে দেখেছি। ছোট্ট জায়গা, চারিদিক থেকেই কতকটা বিচ্ছিন্ন,

ও যেন নিজের স্বপ্নেই নিজে ডুবে রয়েছে। এইজন্যে এখানকার আকাশে-বাতাসে মৈথিলী সুরটা বেশ প্রবল, তার সঙ্গে মিশেছে একটি বাঙালী সুরের রেশ। এও বড় আশ্চর্য লাগে আমার, একটা ঘরের স্বাদ পেয়েই যেন এখানে অনেকগুলি বাঙালী পরিবার হয়েছিল একত্রিত—ভিজে মাটি, নিজেদেরই মতন নরম ভাষা, নরম মুখ, ডাঙায় ভাঁট-আশশ্যাওড়ার বনে আনারস, পুকুরে রুই-কাৎলার সঙ্গে কই-মাগুর; রোজগারের জন্যে বাঙালীর নিজের পেশা ওকালতি আছে, ডাক্তারের দিক দিয়েও নিতান্ত হুগলী-বর্ধমান না হোক খাড়া পশ্চিমের মতন স্বাস্থ্যের পাঠস্থান নয়,—অনেকগুলি বাঙালী এসে জুটেছিল এখানে। আসল কথা, বাইরের হিড়িক না এসে পড়লে বাঙালী-মৈথিলীতে যতটা মেলে ভারতের আর দুটো কোন উপজাতির মধ্যে ততটা মেলে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কয়েকটা কারণে মধেপুরায় যেন এই মিলটা দেখেছিলাম আরও বেশি, যেন "বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস মিলন ভেল।" বাঙলা দেশের মতনই এখানকার বাঙালী মেয়েরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা করছে, দ্বারভাঙ্গা থেকে এসে ছেলেবেলায় এ দৃশ্য বড় বিস্ময়কর লাগত আমার। এখনও ঝড়তি-পড়তি হয়ে কিছু আছে; একেবারে যে সে-ভাবটা নেই তার আর সব কারণের মধ্যে একটা এই যে, মৈথিলও আর খাঁটি মৈথিল নেই, বাঙালীও আর খাঁটি বাঙালী নেই। তাই তো এক এক সময় ভাবি,—ভারতীয় ইভল্যুশনে বহু মিলে এক হবার দিকে চলেছে কি, বহুই সহস্রবাহু হয়ে আরও জটিলতার করেছে সৃষ্টি।

বিকেল হ'তে শহরটুকু একবার দেখে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। কুশী এক সময় প্রায় সাবাড় ক'রে ফেলেছিল, চারিদিকে একটা বাঁধের গণ্ডী দিয়ে কোনরকমে টিকে ছিল মধেপুরা। এখন কয়েক বছর থেকে জল আসছে না, তবু খামখেয়ালী কুশীকে কেউ বিশ্বাস করে না। বাড়িঘর-দোর যা উঠেছে তা খুব সন্তর্পণে। বাঁধের বাইরেও হাত-পা ছড়াতে সাহস করে না মধেপুরা. কাজেই ছেলেবেলা যা দেখেছিলাম তার সঙ্গে এখন যা দেখলাম তার বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। সেই মাঝখানে একটি বড় রাস্তা, দু-চারখানা শাখা বেরিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেছে, সবগুলো বোধহয় পৌছায়নিও বাঁধ

পর্যন্ত, বয়স ফুরিয়ে গেল শহর। অত কথা কি, একটা মহকুমা শহরই তো, তবু এখনও সিনেমা ঢোকেনি। মধেপুরা অতীতেই ঘুমুচ্ছে কথনও, নিজের শৈশবের স্বপ্নে লীন হয়ে; "বচপন্‌কে দিন ভুলানা দেনা!" ...ব'লে লাউড স্পীকারের প্রচণ্ড সিনেমা সঙ্গীত তার সে ঘুম দেয় না ভেঙে; হিংসে হয়।

সন্ধ্যার একটু আগে পিসিমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। থানিকটা এগিয়ে এসে স্টেশনের কাছে পিসতুত বোনের বাড়ি; থানিকটা কাটল সেথানেও। ওদের ওথানে আবার পাকিস্থানী হিড়িক; এক বোন ভিটে মাটি ছেড়ে সেথান থেকে এসেছে চলে; দুটি পরিবারের পাশাপাশি বাড়ি, দেশের পাড়াগাঁয়ের বাড়ির মতন কতকটা যেন এক উঠোন ঘরেই। গৃহ-দেবতা মদনমোহনও এসেছেন পালিয়ে; যথন পৌছুলাম তাঁর ভোগের জন্যে থৈ বাছছে কয়েকজন মিলে। কেমন একটু লাগছিল বৈকি; এরকম পলায়ন-তৎপর ঠাকুরদের আর আমরা কতদিন বাঁচিয়ে রাথতে পারব এই করে?

দিনের আলো থাকতে থাকতেই মধেপুরা শেষ করে জীপে উঠলাম। এবারে শহর পেরিয়ে ওদিকটা আর দেথা হোল না। এর আগের বারে গিয়েছিলাম। কতকটা আজ যার মধ্যে দিয়ে এলাম সেইরকম, তবুও একটু প্রভেদ আছে। বিশেষ ক'রে মরা সুঁতির ধারটা। মাঝে মাঝে বদ্ধ জল, কিন্তু তীরের অতিরিক্তও দুদিকের জায়গাটা এত ভিজে যে আগা-গোড়া ঘন সবুজ ঘাসে যেন মোড়া রয়েছে। আর তাইতে দেখেছিলাম শ্বেত-বকের বাহার। ঘাস আর জল থাকার জন্যে এথানে দূর-দূর থেকে মহিষের পাল এনে জমা ক'রে। মহিষগুলো চরছে আর প্রত্যেকটির পেছনে একটি ক'রে শাদা বক ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেমন স্বচ্ছ নীল জল, তেমনি গাঢ় সবুজ ঘাস, তেমনি নিটোল কুচকুচে কালো মহিষ, তেমনি শাদা ধবধবে বক; অপরূপ দৃশ্য! কুশ্রী রিক্ততার সৃষ্টি করে, আবার যথন পূর্ণতার স্বপ্ন দেথে তথন তাও দেথে তেমনি চরম পূর্ণতায়। তারপর ঐ বকেদের ইতিহাস শুনলাম; ইংরিজিতে ওগুলোকে বলে cattle grid. এই যে মহিষগুলো ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের ক্ষুরের ঘায়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে ঘাসের ভেতরকার যত পোকা-মাকড়, সেইগুলির ওপর

লোভ বকেদের। প্রকৃতির ঘরের ব্যবস্থাগুলি এইরকমই অদ্ভুত। শুধু কি তাই?—একটি নিরুপদ্রব শান্তি, একটি সুসঙ্গতি, একটি rythme বা ছন্দ, একটি মহিষের পেছনে একটি বকই, কাড়াকাড়ি হানাহানি নেই; চারিদিকে প্রাচুর্য, তাই মহিষগুলোর গতি একই লয়ে বাঁধা, তাই থেকেই বকেদের দোলনও; কোনখানে একটু যতি-ভঙ্গ নেই; শব্দও নেই—এক শুধু একটা যেন তালের মাত্রাতেই অতগুলি মুখে ঘাস ছেঁড়ার শব্দ ছাড়া; তার সঙ্গে তৃপ্ত ভোজের টানা নিশ্বাস।

এর পরেই উঁচুনীচু বালিয়াড়ির ওপর কাশবন। একটানা নয়, এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা; সেটা পেরিয়ে বড়িয়াহির হাট, সামনে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বেড়িয়ে গেছে, মুরলীগঞ্জ হয়ে, পূর্ণিয়া হয়ে আরও কতদূর।...ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ছে, শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ঐ একটি ঘর বাঙালী পরিবার। চমৎকার লেগেছিল; একটু সাহিত্য আছে, ছেলেমেয়েদের একটু আবৃত্তি আছে, ছেলেমেয়েদের পড়বার অসুবিধার জন্যে একটু বেশ দুর্ভাবনা আছে। বাঙালী বাইরে গেলে তার প্রথম ভাবনা এ নয়, কি ক'রে একমুটো জুটবে, প্রথম ভাবনা কি ক'রে তার নিজের সংস্কৃতিটুকু বাঁচবে। এই চিন্তাতে সে মারাও যেতে বসেছে, আবার এই চিন্তাতে সে বেঁচেও আছে; নৈলে, কবে যেত মারা।

জীপ আমাদের এগিয়ে চলেছে। গাঢ় সন্ধ্যায় চারিদিক আসছে ম্লান হয়ে। এখানে-ওখানে মাঠের পথে কতকগুলি সিলুয়েট বা মসিমূর্তি—এক পাল গরু—ছুটি মহিষ, তাদের পেছনে রাখল—ছুটি শ্লথগতি বলদ, পেছনে লাঙল-কাঁধে কিষাণ—পাঁচটি নারীমূর্তি, একের পেছনে এক করে, মাথায় ঘাসের ঝুড়ি—লাঠিতে মোট বেঁধে একটি লোক সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে—এখানে ওখানে ছড়ানো, সব মন্থরগতি, যার যা সঞ্চয়ের ছিল—মাঠে, ঘাটে, বাটে—সঞ্চয় করে নিয়ে বাড়িমুখো হয়েছে...

সন্ধ্যার সঞ্চয়ে কোথা থেকে একটি হারানোর সুর এসে পড়ে; এই যে মন্থর, মসিলিপ্ত, ছবিটি, মনে হচ্ছে যেন একটি পূরবীর সুর।...আমার কি হোল সঞ্চয়—দেখি তো হিসেব ক'রে—

পিসিমার কথা বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে। ভালো লাগে বৈকি, তবে আশী ছাড়িয়ে গেছেন, সেই চিন্তাটাই বড় হয়ে উঠে কষ্টই তো বেশি। মনটাকে ঘুরিয়ে একেবারে উল্টোদিকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি—উত্তর-মেরু থেকে একেবারে দক্ষিণ-মেরুতে ; আশী থেকে একেবারে আটে-দশে ; যারা নতুন আশা নিয়ে সবে উঠছে; যারা নবজীবনের ছোঁয়াচ লাগায় মনে তাদের কথা।...ছকুর বাড়ির সেই ছোট্ট মেয়েটি, সন্দেশে বশ হয়ে যে একেবারে অত আপন হয়ে গেল। জিগ্যেস করছি—"সন্দেশ তুমি বড্ড ভালবাস, না?" খুব ঘাড় কাৎ ক'রে নিয়ে একবার আর-সবার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনলে, অর্থাৎ ওকে কেউ এতদিন জিগ্যেস করে নি, তাই, নৈলে সন্দেশ খুব ভালবাসবার মতন এইরকম বিস্ময়কর ক্ষমতাও আছে ওর মধ্যে। বলছি—"আমাদের ওখানে খুব সন্দেশ, এই যে দেয়াল দেখছ ঘরের, আমাদের ওখানে ইটের নয়, সন্দেশের, যাবে?" তেমনি কাৎ ক'রে ঘাড় নাড়ল।...হাতের আগলের মধ্যে ধ'রে রেখে আর সবার সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রশ্ন, কখন্ সন্দেশ ফুরিয়ে গেছে, আগল গলে বেরিয়ে গেছে টেরও পাইনি!

ছকুর ছোট নাতনীটি, শ্যাম বর্ণ, নরম চোখ, মিষ্টি মুখখানি। বলছি—"ছকু, তোর এই নাতনীটির জন্যে আবার না আমায় জন্মাতে হয়—সতীকে যেমন আবার জন্মে পার্বতী উমা হয়ে শিবের জন্যে তপস্যা করতে হয়েছিল।"

ছকু হিসেব না ক'রেই বলছে—"সে তো ওর সাতপুরুষের ভাগ্যি মেজদা।"

ওর মা-ও রয়েছে ব'সে, হিসেবের গলদ ধ'রে ফেলে মিঠে মিঠে হাসছে, বললে—"কিন্তু, শিব ছিলেন বেটাছেলে, জন্ম পালটেও সতীর ক্ষতি হয়নি; মেজমামা, তুমি নতুন হয়ে না হয় জন্মালে কিন্তু আমার মেয়ের চেয়ে তো বড় হয়ে জন্মাতে পারবে না; তার চেয়ে এসো, এখুনি সম্প্রদান করে দিই..."

ছকু তাড়াতাড়ি চোখ বড় বড় করে বলে উঠল—"ও দাদা, ঠিক হয়েছে! বাঃ, এইজন্যেই তো তুমিও এতদিন করনি বিয়ে..."

উচ্চ হাসির মধ্যেই বললাম—"তোর ঐ কালো নাতনীর জন্যে তপস্যা করছিলাম, বটে!"

পদ্ম হাসির মধ্যে গম্ভীর হয়ে বলছে—"এবার আমি রাগ করলাম

মেজমামা, কেন উমাও তো বুড়ো বরের জন্যেই করেছিল তপস্যা—তাঁর কথা থেকেই যখন উঠল কথা।—ইস্, কালো মেয়ে আমার ফ্যালনা!…অত হতচ্ছেদ্দা তো আরও করো তপস্যা ব'সে, তবে যদি পাও…”

কিন্তু পিসিমার কথাই থেকে থেকে মনে পড়ে যাচ্ছে, ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না।

—কুশী প্রাঙ্গণের একটি কোণে আনন্দে বেদনার মাধুর্যে ভরা একটি দিন গচ্ছিত ছিল আমার জন্যে, আমিও তাই সঞ্চয় করে নিয়ে বাড়ি ফিরছি। সব মিলিয়ে এও একটি পূরবীই।

কুশীর এখন পর্যন্ত তিনটি রূপ দেখলাম, বাদলাঘাট অঞ্চল, মাইল সাতেকের মধ্যে একটার পর একটা নদী—জনহীন, শস্যহীন, বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে ; তারপর সাহারসা-মধেপুরা, জলহীন মরু-প্রান্তর, মাঝে মাঝে যেন সান্ত্বনা হিসেবে একটি গ্রাম কিছু হরিৎ সম্পদ, তারপর এই মেহসি-বনগাঁও এলাকা।

সাহারসা-মধেপুরা অঞ্চল নিয়ে এই যেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। ওদিকে যেমন রুক্ষ-কঠোর, এদিকে কি তেমনি স্নিগ্ধ, মনোহারিণী হ'তে হয়!

মাইল বারোর পথ মেহসি, জীপে ক'রে আমরা প্রায় ন'টার সময় বেরিয়ে পড়লাম একদিন। বাজার পেরিয়েই কাঁচা রাস্তার ধুলো আর বালি। বাজার ব'লে মানুষ আর যানবাহনের চলাচল বেশি, সেইজন্যে কাঁচা রাস্তা আরও জখম হয়েছে বেশি করে। এর ওপর একটু এগিয়েই বাঁ ধারের মাঠে একটার পর একটা ইটের পাঁজা। সমারোহটা সাহারসার মতন ছোট জায়গার পক্ষে বেশি বলে মনে হওয়ায় মণিকে প্রশ্ন করলাম। বললে সিভিল টাউন অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট সংক্রান্ত বাড়িঘর তোয়ের হচ্ছে যে শহরের উত্তরে। তারই জোগান। গভর্ণমেণ্ট কয়লার ব্যবস্থা করছে, ঠিকেদাররা বসে গেছে ইট পাততে। সমস্ত ইট-কয়লার ধকলটা যে-রাস্তাকে সামলাতে হচ্ছে তার এর চেয়ে ভালো অবস্থা আশা করা অনুচিত। জীপ তাই রক্ষে, তবুও তার মিলিটারী মেজাজকে ঠাণ্ডা করে এনেছে। পদে পদেই ঠোক্কর খেতে খেতে

কোনরকমে এগিয়ে চলেছে, যারা বসে আছি তাদের নিজের নিজের আসন বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠছে। একবার ছিটকে উঠতে মাথাটা হুডের কাঠ ঘেঁষে কোনরকমে বেঁচে গেল। আহত স্থানটায় হাত চেপে একরকম চেঁচিয়েই উঠলাম—"উঃ! ভাগ্যিস গরীবের জীপ গাড়ি!!"

আঘাত সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠেছি। ছেলেরা ঘুরে চেয়েছে, মণিও প্রশ্ন করলে—"কি হোল? চোট খেয়ে হাসলে যে!"

হাসি এসে গেছে হঠাৎ বগলাবাবুর কথা মনে প'ড়ে।

"ভাগ্যিস" কথাটা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছি ধার, অবশ্য সে ছিল একটু অন্যরকম প্রসঙ্গ।

বগলাবাবু ছিলেন রাজ স্কুলের হেডমাস্টার, একসঙ্গে কাজ করেছি। পাৎলা ছিপছিপে গৌরবর্ণ মানুষটি, একটু দীর্ঘ, সামনে একটু ঝোঁকা, মাথায় একটি ঝকঝকে টাক, সব মিলিয়ে যেন একটি ধারালো অসি। ধারটা ছিল তাঁর কথায়—সেও আঘাতের ধার নয়—wit, humour, একেবারেই খাঁটি, একটুখানি ঘোরাফেরায় দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে তরোয়াল থেকে—বগলাবাবুর কাছে বসলে ক্রমাগতই হাসির ফোয়ারা! অথচ পড়াতেন একেবারে নিস্তব্ধ ক্লাসের মধ্যে ব'সে।

"ভাগ্যিসের"—ব্যাপারটা হয়েছিল চন্দননগরে। মোটরবাসে চলেছেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, চন্দননগর পেরিয়ে কোথায় যেতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে বরাবর ভালো রাস্তা, একটু দোলা নেই, একটু ঝাঁকুনি নেই, ফরাসী চন্দননগরে ঢুকেই কিন্তু চেহারা গেল বদলে, এবড়ো-খেবড়ো, ভাঙা-চোরা পাশে ইঁটের খোওয়া জড়ো করা—রাস্তায় যতরকম দোষ কল্পনা করা যেতে পারে সবগুলোই মজুদ। অনেক আগেকার কথা, সে সময় মোটরবাসও ছিল সেইরকম, সাবধানে থেকে থেকেও একবার একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে ছিটকে উঠতে মাথাটা গেল বাসের ছাতে রীতিমতো ঠুকে। "উঃ!"—ক'রে টাকে হাত দিয়ে একটা শব্দ; সে কিন্তু বলতে যতটুকু, ঐ এক মুহূর্তে, সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য—"ভাগ্যিস ডুপ্লে (Duplex) হেরেছিল!"

এত খাঁটি, এত সূক্ষ্ম wit সবার মাথায় ঢোকে না, তা ভিন্ন শিক্ষাসাপেক্ষ ও

ইতিহাসের জ্ঞান থাকা দরকার, তবুও দু'চারজন বোঝবার লোক যারা ছিল হো-হো করেই হেসে উঠল। তারপর টীকাও হোল, আলোচনাও চলল, রাস্তার উৎকট উপদ্রবের মধ্যে—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন উনি—আহা বেঁচে থাক ইংরেজ, সারা দেশটা এইরকম এদের চন্দননগর হয়ে গেলে সেরেছিল আর কি!...

কথাটার অর্থ বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসি চলল গড়িয়ে।

বগলাবাবুর কথা উঠতে তাঁর আলোচনাই চলল খানিকক্ষণ। যারা হাসির উৎস তাদের স্মৃতি থেকেও হাসি ঝরে ঝরে পড়ে, কবে কি বলেছিলেন সেই সব কথা হ'তে হ'তেই কখন্ রাস্তার ও অংশটা কাটিয়ে এসেছি খেয়াল নেই।

এখন বেশ সমতল পথ, বাঁ দিকে ফসলের জন্য চষা মাঠ, বর্ষা আসবে, তার আগে সর্বাঙ্গে সূর্যরশ্মি সঞ্চয় করে নিচ্ছে, দূরে কাছে বাড়িঘর, ডানদিকে টানা আমবাগান। এতবড় আমবাগান খুব কম দেখেছি, আর গাছগুলো তেমনি পুরনো। দেখলেই বোঝা যায় জায়গাটাতে এখন পর্যন্ত কুশীর শুভাগমন ঘটেনি। একটি বহু পুরাতন বট, কোল ঘেঁষে গ্রাম্য দেবতার আস্তানা, একটা প্রকাণ্ড ডাল নিজের ভারে মাটিতে নেমে প'ড়ে আবার উটের মতো গলা বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। রাখালের দল মাঠে গরু-মহিষ ছেড়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে; দুটি ছোট্ট মেয়ে, কোমরে হাঁটু পর্যন্ত একটু ক'রে ন্যাকড়া জড়ানো, ছোট ছোট দুটি পেথে কাঁখে ক'রে শুকনো ডাল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কতকগুলি গাভী অলসভাবে রোমন্থন-রত; একটি মহিষও রোদ থেকে এসে পা মুছে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসল। ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধ পরিবেশ, চঞ্চল জীবনের একটা অংশকে এই ক'রে নিত্য নিজের কোলে টেনে নিয়ে এসেছে, কত যুগ যুগ থেকে কে জানে। জীপের গতি মসৃণ, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি, আমার মনটাও যেন গেছে আটকে। তার কারণ আছে, ঐ বটতলাটুকুই নয়, এদিক'কার সমস্ত জায়গাটাই যেন অচেনা হ'য়েও কত চেনা। এটা ঠিক যে মধেপুরার পথের সেই উগ্র অভিজ্ঞতার পর এদিক'কার এতখানি শ্যামলতা, শান্তি, স্নিগ্ধতা আমায় একটু স্বপ্নালু করে তুলেছেই; তবু আমি এ অনুভূতিটা তো আর কোথাও পাইনি, ঠিক

যেন নিজের জায়গাটিতে ফিরে এসেছি। কেন এমনটা হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না; হঠাৎ আধ্যাত্মিক কোন ব্যাপার ঘটল নাকি? জাতিস্মর হয়ে উঠছি না তো।

অত গুরুতর ব্যাপার কিছু হয়নি; সেটা টের পেলাম ও এলাকাটুকু পেরিয়ে যখন আবার মাঠের মাঝখানে পড়েছি। ঘোরটুকু কেটে গিয়ে আসল ব্যাপারটুকু ধরা পড়েছে, জায়গাটার আমাদের ওদিকের সঙ্গে একটা মস্ত বড় মিল আছে। থাকবারই কথা, কেননা দুটোই তো মিথিলা, আর একেবারে নিজ্ মিথিলা। কিন্তু এর মধ্যে অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা থেকে বেরিয়ে এই এখানে এসে পৌঁছানোর মধ্যে যে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, অনেক ছাপ পড়েছে মনে—মানভূম, পঞ্চকোট পাহাড়ের গোড়ায় গৌরাঙ্গসেবা-সঙ্ঘের সেই উৎসব-সমারোহ,—তারপর শিবপুর-কলকাতার অতি ক্ষিপ্র জীবন, কয়েকটা দিনের মধ্যে কয়েকটা মাসকে যেন কুলিয়ে নেওয়া কোনরকমে, তারপর ভাগলপুর, জামালপুর—একটা চরখিবাজির মতন ঘুরে সাহারসায় এসে বসেছি। অবশ্য আবার মিথিলাতেই, কিন্তু কুশী যে তার সব চিহ্ন লোপ করে দিয়েছে ওদিক টায়। ঘরছাড়া বাঙালীর মন, এই সমস্ত অভিযানের মধ্যে অন্তরে অন্তরে যে ঘরকেই এসেছি খুঁজে;—সেই গাছপালা আমবাগান, সেই সবুজে ঢাকা ভিজে মাটি, সেই মাঠের পর গ্রাম, গ্রামের পর মাঠ, সেই পল্লীদেবতা বড়ম্ঠাকুরের আস্তানা, সেই মিষ্টি নরম মুখ, সেই মিষ্টি ভাষা।...আমি জাতিস্মরই হয়েছি এক হিসেবে। মাঝখানে এই দুটো মাস ধ'রে আমার একটা মৃত্যু ঘটেছিল—অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির তীব্রতার অনুপাতে সব ঘর-ছাড়াদেরই ঘটে,—আবার আমি নিজের পরিবেশে, নিজের জীবনে এসেছি ফিরে।

মণি বলছে—"আরও তোমার এইরকম মনে হবে মেজদা; বনগাঁও-মেহসীতে গিয়ে তোমার মনে হবে যেন মধুবাণীর আশে-পাশে কোনও জায়গায় গেছি এসে। আর, দূরই বা কতটুকু বলো না—কুশী মাঝখানে এসে প'ড়ে আলাদা করে দিয়েছে বৈত নয়, তা' ভিন্ন তুমি এলেও তো প্রায় সাত-আট' মাইলের চক্কোর দিয়ে, একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হবেই।"

ঠিক কথাই তো। কিন্তু এইরকমভাবে না ঘুরে এলে এ মোহটুকুও থাকত না। এই সাত-আটশ' মাইল শুধু দূরত্বের বিচ্ছেদই ঘটায়নি, আমার মনে স্বপ্নালুতা এনে দিয়েছে, আমার নয়নে ভ'রে দিয়েছে জাতিস্মরের বিস্ময়।

বড়িয়াড়ির হাতপাতাল পেরিয়ে গেলাম। সাহারসা থেকে মাইল ছয় হোল, মেহসীর প্রায় আধাআধি। বড়িয়াড়ি ছিল একটা কুঠিয়ালের আড্ডা এক সময়, এখন তার কিছু বাড়ি হয়েছে হাসপাতাল, সাহারসার সিভিল সার্জেন এখানেই থাকেন; ছোটখাট কলোনিটি ডান দিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম।

বেশি দূরে হোল না এগুতে, আবার কুশী এসে পড়ল। জীপ আমাদের নামতে আরম্ভ করেছে, নদীর একটা শুকনো খাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। কুশী এখানে একটা হানা দিয়েছিল, কিন্তু জমিটা শক্ত আর উঁচু, বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে বছর দুই থেকে পথটা দিয়েছে ছেড়ে। আমরা শুকনো খালের মধ্যে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বনগায়ের বাঁধের ওপর উঠে পড়লাম; সেটা টপকে আবার রাস্তা, আমরা বনগায়ে এসে পড়েছি। দেখলেই বোধ হবে খুব পুরনো জায়গা; পুরনো-পুরনো আমের গাছে তার সাক্ষী দিচ্ছে, আমরা একটা বাগানের ভেতর দিয়ে চলেছি—বাঁ দিকে রাস্তার সমান্তরালে চলেছে বাঁধটা, ডান দিকে স্কুল, থানা, ডাকবাংলো। ঘনচ্ছায় গাছের নিচে সবগুলিতে চমৎকার একটি ঐক্য এসে গিয়েছে, সব মিলিয়ে যেন একটি পরিবার। আমরা চলেছি গ্রামের বাইরে বাইরে দিয়ে, এটা বেশ বোঝা যায় যে খুব ঘন বসতির একটা বড় গ্রামকে পরিক্রমা ক'রে চলেছি। পুরনো গ্রামের গায়ে কোথায় একটা আভিজাত্যের ছাপ থাকেই; কি ক'রে বুঝতে পারছি না, কিন্তু সেটা করছি অনুভব আকাশে-বাতাসে কি যেন একটা রয়েছে। কিম্বা কে জানে, মেহসী বনগায়ের ইতিহাসটা যে জানি, সেইটেই বোধ হয় একটা সম্ভ্রম জাগিয়ে মনটা আমার শ্রদ্ধা-স্তম্ভিত করে রেখেছে।

বাঙলার যেমন বিক্রমপুর আর নবদ্বীপ, এক সময় তেমনি মিথিলার সংস্কৃতি ভাগাভাগি করে রেখেছিল এদিকে মেহসী-বনগাঁও আর ওদিকে

মধুবাণী। মেহসীর মণ্ডনমিশ্র উভয়-ভারতী যাঁদের কাছে শঙ্করাচার্যের বিজয়-অভিযান পেলে প্রথম এবং একমাত্র পরাভব; আর মধুবাণীর পক্ষধরমিশ্র, বাঙলার নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। এর বেশি পরিচয় দিতে হবে?

আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি তার বাঁ দিকে গ্রামটা কয়েকটা কুঁড়ে ঘরে শেষ হয়ে গেছে। চেহারা দেখে মনে হয় লোকগুলো দুসাধ-মুহ্‌সর জাতীয় হবে; এদিককার সবচেয়ে যারা নিচু জাত বলে গণ্য। অত্যন্ত গরীব, ঘরের দেওয়ালগুলো সব মাটিরও নয়, কিছু ছ্যাঁচা বাঁশ, কিছু নলখাগড়া, কুশীর ধার থেকে সঞ্চয় করা, কিছু যা-খুশী তাই,—খানিকটা ভাঙা তক্তা, একটা টিনের পাত ছেঁড়া তালপাতার চাটাইয়ের খানিকটা, একটা ভাঙা পাখা—গেরস্ত অপ্রয়োজন বলে পাঁশ-গাদার ওপর সব ফেলে দিয়েছিল; ওরা কুড়িয়ে এনে ঘর বেঁধেছে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জাত এরা; সবার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এদের দিন গুজরান; ইতিহাসের গোড়া থেকে এইভাবে কাটিয়ে আসছে। আমাদের সমাজশাস্ত্রে এরা হোল অন্তে-বাসী; গ্রাম যেখানে শেষ হয়েছে, গ্রামের যেটা খিড়কি, আবর্জনা ফেলার জায়গা, এদের সেইখানে গোড়াপত্তন। ভিন্ন ভিন্ন সময় যা নাম পেয়ে এসেছে তার অর্থও সেই রকম—অন্তে-বাসী হোল যাদের বাস অন্তে অর্থাৎ শেষ দিকে, তারা 'চণ্ডাল' অর্থাৎ প্রচণ্ড; 'দুসাধ' কথাটারও অর্থ সেদিন একজন মৈথিল পণ্ডিতের কাছে শুনলাম; অর্থাৎ 'দুঃসাধ্য'—ওদের এঁটে ওঠা যায় না—**Past all surgery, past all cure.** সেটা সত্যি কথাই। ওদের এই যে গ্রামের শেষ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে ঘর-বাঁধতে দিলে না সমাজ, এতে ওদের প্রকৃতি কতকটা বড়ই থেকে গেল—খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, ঘর বাঁধবার তাগিদ নেই, (অবশ্য অবস্থাও নেই); সমাজের পরিচর্যার মধ্যেও যেটা নিকৃষ্ট অংশ সেইটে নিয়েই থাকতে হোল ব'লে, সমাজ-জীবনকে দরদ দিয়ে বোঝবারও অবসর হোল না ওদের; তাইতে একসময় যদি **criminal tribe** ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে ওরা তো তার জন্যে খুব বেশি দায়ী ওরাই নয়।

সমাজ এলে দিলেও প্রকৃতি কিন্তু এলে দেননি ওদের ; যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, যা খাচ্ছে তাই অমৃত, গৃহে-প্রান্তরে তফাৎ নেই, তাই 'সব ঠাঁই মোর ঘর' ; সঞ্চয় নেই, তাই কালকের ভাবনা নেই ; পাপপুণ্য নেই, তাই যেমনি নরকের বিভীষিকা নেই, তেমনি নেই স্বর্গের দুরাকাজ্ক্ষা। ওদের কেউ ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের আসন দখল করবার জন্যে পঞ্চতপা হয়েছে, আর তাঁরা শঙ্কিত হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু বা মহেশ্বরের দারস্থ হয়েছেন—এমন কথা শাস্ত্র ঘেঁটে পাওয়া যায় না। নোংরা, কালো, কদর্য ; সুস্থ, সবল, সদাপ্রসন্ন—সভ্যতার যা কিছু মাপকাঠি গড়েছ তোমরা তার কোনটার মধ্যে ওরা পড়ে না, কোনটারই তোয়াক্কা রাখে না—দেহধর্মের দিক দিয়ে হাইজীনই বলো বা মনোধর্মের দিক দিয়ে Ethics বা নীতিশাস্ত্রই বল, ধর্মশাস্ত্র তো বহুদূর।

ওদের দেখে দুঃখ হয় তো বটেই। সেটা নিজেদের বিবেক দংশন ; তবে হিংসেও হয়। নগ্ন, অর্ধনগ্ন, ধূলিধূসর শিশুর পাল খেলায় মত্ত—প্রতি অঙ্গ থেকে প্রাণের প্রাচুর্য ঠিকরে পড়ছে,—বাড়িতে আয়া চাকরের হেপাজতে যে-ছেলেটিকে মাপা হর্লিক্স, মাপা গতিবিধি আর মাপা আলোবাতাসের মধ্যে মানুষ (?) ক'রে তোলবার অসাধ্য সাধন করছি, তার চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কদিন আগে এখানে নাকি একটা বিশ্রী রকম ট্রাজেডী হয়ে গেছে। গল্পটা বলেছে মণির আরদালি লছমী সিং। লোকটার কথা তোমায় বলিনি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী, কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় যে ওর পেটে এত কথা-ঠাসা রয়েছে যে যে-কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। কথাগুলো যে কি ধরণের তার কতক কতক আন্দাজও পেয়েছি। তোমাদের ধারণা শুধু নভেল-লিখিয়েরা রোম্যান্টিসিস্ট্ হ'তে পারে। সর্বৈব ভুল। নীরব কবির মতন কত নীরব রোম্যান্টিসিস্ট যে আমাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে না, তার আন্দাজ করতে পারবে না। লছমী সিং একজন। পৃথিবীর মধ্যে যেসব রোমাঞ্চকর ঘটনা নিত্য ঘটছে, কিম্বা ঘটে উঠতে পারছে না, অথচ ঘটা উচিত ছিল, লছমী সিংয়ের কাছে তার একটা সুদীর্ঘ তালিকা

বলে মনে হয়। যেগুলো অল্প-রোমাঞ্চকর হয়ে ঘটেছে সেগুলোকে উপযুক্ত ভাষা আর ভঙ্গী প্রচুর রোমাঞ্চকর করে তোলবার ওর চমৎকার প্রতিভা আছে; যেগুলো একেবারেই ঘটতে পারেনি সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে ওর সেই প্রতিভা যেন আরও মুক্তপক্ষ হয়ে ওঠে।

"বাবু, সাহেব আপনাকে সেবারের বাদলাঘাটের বন্যার কথা যে বলেছিলেন, আমারও কানে গেল একটু; পাশেই সিঁড়ির ওদিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম কিনা......"

'সাহেব' হোল মণি, ওর মনিব। সে উঠে যেতেই ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে, একটা চাপা রহস্যে দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে, গুরুতর কিছু বলতে চায়।

প্রশ্ন করলাম—"তুই কিছু জানিস নাকি?"

একবার মণির ঘরের দিকে দেখে নিয়ে এগিয়ে এসে আমার চেয়ারের অল্প দূরে উবুড় হয়ে বসল।

"জানি মানে?......হুজুরের তো মাত্র শোনা গল্প......"

"তুই ছিলি নাকি?—পুলটা যখন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল......"

"সেই গাড়িতে হুজুর......"

"গাড়িও ছিল?...কৈ, তোর সাহেব তো সেকথা বললে না।"

"গাড়ি ছিল ঠিক পুলের মাঝখানে, বানের স্রোত—যেন চিড়িয়াখানা থেকে দশ হাজার-বিশ হাজার শেরের খাঁচা একসঙ্গে খুলে দিয়েছে—ফার্স্ট গিলাসে আমার তখনকার অফ্‌সর বেণীমাধো লাল, আমি রয়েছি পাশেই সারভিন্ট্‌দের থার্ট গিলাসে—গাড়ি চলেছে খুব ধীরে ধীরে, মালুমও হয় না যে চলেছে—এমন সময়—লে তামাসা!—পুলের সামনের দুটো থাম কাৎ হয়ে স্রোতে উলটে পড়ল—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই লাপাত্তা! আর দু' গজ এগুলে হুজুরের গোলামকে আর এখানে বসে গল্প বলতে হোত না।..... ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে পেছনে বেক্‌ করাবে, চার পাঁচ গজ এসেছে, পেছনের একটা থাম সাফ্‌! কোশী বললে—আগে মৌৎ, পিছে মৌৎ, যাও, কোন্‌ দিকে যাবে।"

মণি ওকে ডাক দিতে গল্পটাও আর এগুতে পারেনি; আমার মাথার মধ্যে গাড়িটাকে ঐ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে ঐ রকম অসম্পূর্ণতার বিভীষিকায় স্থায়ী ক'রে রেখেছে—চারিদিকে জল আর জল—উন্মত্ত স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুলটা—শুধু পুলের মাঝখানটা—গাড়িটা নিরুপায়, নিশ্চল—উৎকণ্ঠিত যাত্রীর দল নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে একটি ক'রে মুহূর্ত গুণছে······

—রোম্যান্স আর কাকে বলে?

মণি এই লোকটাকেই কাছে কাছে বেশি রাখে; ওর গল্প শোনবার জন্যে নয়, গল্প বন্ধ করবার জন্যে। বলে—"কী রোগ মেজদা। একটা কিছু যদি cue পেলে তো আরম্ভ করে দেবে সত্য সত্য—বেশির ভাগই বানিয়ে, আর প্রত্যেকটি একসে এক পিলে চমকানো!" বেশিক্ষণ বসতেও দেয় না, বিশেষ করে যদি কাছে কেউ থাকে; একটা ছুতো ক'রে ডেকে নেয়।

লছমী সিংয়ের একটা রোম্যান্সের নমুনা দিলাম; ওর গল্পের আকাশে শনি হয়ে উদয় হয়েছে মণি, কোনটাকেই শেষ হতে দেয় না।

আবার এই এক আরম্ভ করেছে—

আমরা যে চলেছি, আমাদের বাঁয়ে দুসাধ-পল্লীটা, ডাইনে একটা ডোবা। বেশ গভীর, আর ডোবা হলেও বেশ বড়, তবে এই মাঝ-বৈশাখে জল একেবারে নিচে, তাও ঘোলানো; দুসাধ-পল্লীর ছেলেমেয়েরা হয়তো ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ ধরে।

সমস্ত জায়গাটুকু কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাস্তাটা এখানে আস্তে আস্তে উঁচুর দিক উঠে গেছে, পুরনো জায়গায় এই রকম ঢিবি—প্রত্নতাত্ত্বিকের মুখে নাল গড়াতো। ডোবার এদিকটা শুধু রাস্তাই, গোল হয়ে ঢিবির ওপর উঠে গেছে; ওপরটায় কিন্তু বাড়ির গায়ে বাড়ি, নানা আকারের, একেবারে যেন চাপ বেঁধে আছে। তুলনা চলে না, তবু কাশীর গঙ্গার ধারের বাড়িগুলোর কথা মনে করলে অনেকটা ধারণা হবে। গঙ্গা নয়, ডোবা; পাথরের সৌধ নয়, মাটি, বাঁশ, কচিৎ পুরনো ইঁটের দেওয়াল

দেওয়া মামুলি ঘর, তবু সব জায়গাটায় একটা যেন কিছু আছে, মনে হতেই হবে ডোবাটার অর্ধেকখানি ঘিরে থাকে-থাকে উঠে-যাওয়া ঐ বাড়িগুলোর দৃষ্টির নিচে একটা কিছু না ঘটলে জায়গাটার ঠিক এই রকমভাবে গড়ে ওঠা যেন নিতান্ত নিরর্থক হয়ে ওঠে।

আমার এই রকম মনে হয়েছিল—সামান্য দু' একখানা বই লিখেছি, পরিবেশে একটা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলে মনে নাড়া দেয়। সে জায়গায় লছমী সিং, যার সমস্ত মনটাই রোম্যান্সে গাদা অথচ কখনও প্রকাশের পথ পায়নি—তার মনের অবস্থা কিরকম হওয়া সম্ভব অনেকটা আন্দাজ করা যায়।

লছমী বললে—"বাবু, এই ডোবাটা ভালো করে দেখে রাখুন, এই সেদিন ওর মধ্যে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে।"

মাণ স্টীয়ারিং ধরে সামনে রয়েছে, আমি রয়েছি পেছনকার আসনে, পাশের আসনে রয়েছে লছমী সিং। মণির সঙ্গে আমার বুনো শুওর নিয়ে গল্প হচ্ছিল, এদিকে ওটা বড্ড বেশি, প্রায়ই দেখা যায় এদিকের উলুখড় বা ঝাউয়ের বন থেকে ওদিকের বনে ঢুকল; কখনও দু' চারটে, কখনও বা একটাই। গ্রামের কাছেও এসে পড়ছে, আখের খেত যদি রইল কাছে-পিঠে তো ওদের পোয়াবারো, গাছগুনোকে পেড়ে ফেলে পরম পরিতোষের সঙ্গে চিবিয়ে যাচ্ছে, দু' পাঁচজন এক সঙ্গে থাক, চেঁচামেচি করলে, তাড়া দিলে, পালাল; একা থাকলেই বিপদ, বিশেষ করে যদি দেঁতেলের পাল্লায় পড়লে। প্রায়ই দুর্ঘটনার রিপোর্ট আসছে।

মণি পথের দিকে আবার মন দিলে লছমী সিং আমার দিকে গলাটা একটু বাড়িয়ে আমায় ডোবাটা একটু লক্ষ্য করে রাখতে বললে—যেমন বলে, চাপা গলায়, গল্পের বেশ গোড়া বেঁধে—একটা জমাট কিছু শোনাবার জন্যে মনটাকে সতর্ক করে দিয়ে। প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারখানা কি?"

"এমন বিশেষ কিছুই নয়, আখচারই হচ্ছে এসব এলাকায়, তবে ছেলেটা শুনছি ছিল মায়ের এক ছেলে আর নাকি সবে বিয়ে করেছিল।"

একটু ভালো ক'রে ওর দিকে ফিরে বসতে হোল। টোপ গিলেছি দেখে লছমী সিং বলে চলল—

"ঐ যে বুনোশুওরের কথা সায়েব বলছিলেন হুজুর—রোজই তো একটা না একটা উপদ্রব ঘটাচ্ছে, সেদিন আবার একটা দেঁতেল কি করে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গোটাকতক গরু আর দুটো ঘোড়াকে ঘায়েল করলে, একটা ছাগলের পেট চিরে দিয়ে একেবারে সাবাড় করে দিলে, তারপর লোকেরা তাকে ঘেরে ফেললে। ঘেরে ফেলা মানে অবশ্য সবাই দু'শো হাত দূরে থেকে ঘেরে ফেলা। শুওর যেদিকে ছোটে সবাই লাঠি বর্শা নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে আগলে ধরে; আবার অন্যদিকে ছুটলে তারা ঐরকম হৈ-হৈ- করে রুখে দাঁড়ায়; এই ক'রে তাকে আগলে আগলে ওরা এই পুকুরের ধারে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে দু'তিনবার সেটা মরিয়া হয়ে ভিটের মধ্যে ঢুকে পড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছে, তাতে মানুষও কয়েকজন ঘায়েল হয়েছে, শুওরটাও বেশ কিছু জখম হয়েছে। একটা দাঁত গেছে ভেঙে, রক্ত পড়ছে; এই পুকুরের কাছে যখন নিয়ে এসেছে, মতলবটা বুঝতে পেরে কিনারায় একবার রুখে দাঁড়াল। তখন কিন্তু হালৎ অনেকটা রদ্দি, দু' একজন গোঁয়ার গোছের লাঠি নিয়ে এগিয়ে যেতে ঘুরে সরাসরি নেমে গিয়ে একেবারে জলে দাখিল হোল।

"একবার জলে পডলে আর ওঠবার উপায় রইল না; এদিকে লোকেরা লাঠি শড়কি নিয়ে, ওদিকে একটার ওপর একটা বাড়ি, কিনারাটা খাড়া উঁচু হয়ে গেছে, যাবেন কোন্ দিকে দোস্ত্? ইটপাটকেল বর্ষাচ্ছে চারিদিক থেকে; ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাঁক গুলিয়ে পুকুরটা তোলপাড় করলে খানিকক্ষণ ধরে, তারপর একবার পুকুরের খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে সেই যে ডুবল, আর উঠল না। সন্ধ্যের মুখে ছিটকে বেরিয়েছিল শুওরটা, আঁধিয়ার হয়ে গেছে, খানিকক্ষণ সবাই জটলা করলে পুকুরের ধারে, তারপর যখন টের পেলে দোস্ত্‌কে এ-জিন্দগিতে আর উঠতে হবে না, যে-যার বাড়ি চলে গেল।

"গেল না শুধু ঐ ছেলেটা হুজুর, যার কথা আপনাকে বললাম গোড়ায়। দুসাধের ছেলে, এই কাছে পিঠে বাড়ি। বয়স হয়েছে, প্রায় বিশ-বাইশ বছরের জোয়ান, তবে বিয়ে হয়েছে এই সবে মাসখানেক হোল। ওদের আবার আমাদের চেয়েও বেশি ছেলেবেলায় বিয়ে সাদি হয়ে যায়; তবে ছেলেবেলায় বাপ হারিয়েছে, এক মা ভিন্ন কেউ নেই, তায় আখ্‌রি গরীব,

এতদিন ওকাজটা হয়নি। বেশি বয়সে বিয়ে হয়েছে, তায় বাড়িতে লোকাভাব, বৌটা এলে সে বদন্‌সে খেটে যে রোজগারটা করে সেটাও এদেরই হকে এসে যায়, কাজেই মা-ব্যাটা দু'জনেরই ইচ্ছে দ্বিরাগমন করে নিয়ে আসে ঘরে বৌ। কিন্তু জাতভাইকে একটা ভোজতাড়ি তো দিতে হবে, সে অবস্থাটা নেই, কাজেই হয়ে উঠছে না। ঠিক এই সময়টিতে শুওর শিকারের ব্যাপারটা ঘটল। এর পরে যা হোল সেটা সম্বন্ধে দু'রকম রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে হুজুর, কোন্‌টে সত্যি, কোন্‌টি ঝুট হনুমানজী জানেন। কেউ বলছে ছেলেটা নিজের মতলবেই গিয়েছিল, আবার কেউ বলছে, আকিলটা ওর মেহরারুর মাথা থেকেই বেরোয়। যদি জিগ্যেস করেন তোমার নিজের কি মনে হয় তো আমি বলব, আমার বিশ্বাস, সলাহ্‌টা ছুঁড়িই দিয়েছে, কেননা, নি-খরচায় বাজিমাত করবার কূটবুদ্ধি যেমন মেয়েদের মাথায় আসে, পুরুষদের মাথায় তেমন করে আসে না। বেশি দূর না গিয়ে জানকীজীর কথাই ধরুন না হুজুর, রামচন্দ্রজী পিতৃসত্য পালন করতে রাজ্য ছেড়ে জঙ্গলে গেলেন, জানকীজী মতলব বের করলেন—সোনার হরিণটা যদি হাত করতে পারি তো আমার এই জঙ্গলই ছোটামোটা এক অযোধ্যা করে তুলব ..."

আমরা গ্রামটা ছেড়ে এইবার একটা মোড় ঘুরে বাঁয়ে নেমে চললাম। ওদিক থেকে অতটা বোঝা যায় না , বেরিয়ে এসে একটু দূরের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু বেশ টের পাওয়া যায়, সত্যিই একটা বড় গ্রাম, আর তার গায়ে প্রাচীনত্বের একটা স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। বাংলার গ্রামে আর এদিককার গ্রামে বেশ একটা প্রভেদ আছে। বাংলায় গৃহস্থ একটু সম্পন্ন হলেই তার বাড়ি ঘিরে একটু বাগান আছে, আগে বা পেছনে ছোট একটা পুকুর—অন্তত থান তিন-চাব বাড়ি ঘিরে এইরকম একটু আছেই—হয়তো জ্ঞাতি, ঐ এক পুকুর বা বাগানটুকু ঘেরে ঘুরে বসত তুলেছে। এতে সমস্ত গ্রামটা একটা চাপ বেঁধে উঠতে পারে না। এদিকে অন্যরকম—বাড়ির গায়ে বাড়ি, তার গায়ে বাড়ি, মাঝখান দিয়ে সরু সরু পথ এদিক ওদিক হ'য়ে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গেছে। এখানে ইঁদারার ওপর নির্ভর, তাই সদর হোক, খিড়কি হোক, বেরুতেই পুকুর বা ডোবার ধারে গিয়ে পড়তে হয় না। বাসন মাজার পাট বাড়িতে, তাই

চারটে ঘাটে কুঁদুলির গলা ওঠে না ; নাকের সামনে মোটা মোটা কাঁসার গয়না নেড়ে ইঁদারার চাতালে যেটুকু হোল নগদ নগদ মিটে গেল, অবশ্য নগদ মেটায় কলসী ভাঙা আছে, মাথা ভাঙায় বাদ যায় না। হাতে দেড় সের দু'সের পর্যন্ত নিরেট গয়না থাকে, ভরিখানেক কি ভরি দুয়েকের চুড়ি শাঁখা মাত্র সম্বল নয় তো।

সুবিধে-অসুবিধের কথা বাদ দিলে চাপবাঁধা গ্রামে অন্তত দূর থেকে একটা বাহার আছে, একটা mass-effect. সমষ্টিগত সৌন্দর্য। এদিককার গ্রামে গাছপালা কম থাকে বলে সে-সৌন্দর্যটা আরও খোলে, যেটাকে sky-line বলা হয় সেটা স্পষ্ট, ঘোমটা খোলা মুখের মতন সমস্তটুকুই এক সঙ্গে যায় দেখা।

এত পুরনো গ্রাম একটু ভালো করে দেখতে হোত।···মণি বললে, ফেরবার সময় আমরা গ্রামের ভেতর দিয়েই যাব, ওব একটু কাজও আছে। ওর জেলায় যে কৌতূহল জাগাবার মতন কিছু কিছু পেয়ে যাচ্ছি তাতে ও ভেতরে ভেতরে খুশি, মাঝে মাঝে কিছু দেখবার থাকলে বলে দিচ্ছে, কিন্তু রাস্তা খারাপ, হাতে স্টীয়ারিং, গল্প করতে পারছে না।

তা না পারুক, খেদ নেই আমার, লছমী সিং বেশ জমিয়ে এনেছে ; জীপের নিজের ঘর্ঘরানি আছে, তার ওপর ভাঙ্গা রাস্তার ঝাঁকানির শব্দে ওর আরও সুবিধে হয়েছে, 'সাহেবে'র কানে ওর রোম্যান্স পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই, দিব্যি নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে—

"বনগাঁওয়ের ঐ বড় বাড়িটার কথা জিগ্যেস করছিলেন হুজুর সায়েবকে ? —ও নিয়েও একটা রহস্য আছে মস্ত বড়, পরে বলব, এখন দূর থেকে একটু ভালো করে দেখে রাখুন। আপাতত যা বলছিলাম সেটা শেষ করি।

"বলছিলাম, বিনা পুঁজিতে বাজিমাৎ করবার আকিলটা মেয়েদের মাথাতেই গজায় বেশি করে, সেইজন্যে আমার নিজের আন্দাজ মতলবটা ছোঁড়াটার মাথা থেকে বের হয় নি, বের হয়েছিল ওর মেহ্‌রারুর মাথা থেকে। স্বামী, স্ত্রী দুটোরই বিয়ে হয়েছে ডাগর হয়ে, সুতরাং দ্বিরাগমন ক'রে ঘরে না নিয়ে আসতে পারুক, এখানে-ওখানে ভেঁট-মোলাকাৎটা হয়। নিশ্চয় এসেছিল ছুঁড়িটা তামাসা দেখতে, সবাই গেলে ওই নিশ্চয় সলাহ্‌

দিলে যে, জাতভাইকে ভোজ দেবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, হাতছাড়া হয়ে গেলে আপশোতে হবে—একটা ধেড়ে, দেঁতেল বুনো শুওর, সোজা কথা নয় তো, অমন তিনখানা গ্রামের সমাজকে ডেকে পাত পাতানো যায়।

"এটা যখন আমার আন্দাজই হুজুর তখন আরও একটা আন্দাজ নিশ্চয় সত্যিই হবে। কথা হচ্ছে, অমন একটা পাকা শুওরের ওজন আছে তো— মণ দেড়েকের কম নয়, মরে আরও কোন্ না আধমোণটাক বেড়ে গিয়ে থাকবে—ছেলেটা সাজোয়ান, কিন্তু একলা তো টেনে তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না, এদিকে আবার সঙ্গী ডাকলেও বখ্রা দিতে হবে, ছুঁড়িটাও রয়ে গেল। আপনাকে পুকুরের চারিদিকটা ভালো ক'রে দেখে রাখতে বলেছিলাম হুজুর। নজরে পড়েছে কিনা জানি না, পুকুরের উত্তর দিকটায়, বাড়িগুলো থেকে খানিটকটা নেমে, আলাদা হ'য়ে একটা ইটের ভাঙা খুবরির মতন আছে—কোনও সময় একটা ছোট মন্দির কিম্বা বড়মস্থান ছিল; অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে নামতে ছেলেটা গাঢাকা দিয়ে তার মধ্যে গিয়ে বসল। মেয়েটাও আশে পাশে ঘোরাঘরি করছিল, জায়গাটা একেবারে নির্জন হয়ে গেলে সেও চুপি চুপি গিয়ে ঢুকল খুবরিটার মধ্যে।

"খুবরিটা—ভাঙা মন্দিরই বলুন বা বড়মস্থানই বলুন—জল থেকে হাত পাঁচেক ওপরে। লোকে নামে না, চারিদিকে একটু ঝোপঝাড়ও হয়ে পড়েছে, ওরা দু'টিতে অপেক্ষা করতে লাগল কখন গ্রাম একেবারে নিশুতি হয়ে যাবে, ছেলেটা আস্তে আস্তে জলে নেমে নিঃসাড়ে তুলবে শুওরটাকে, রাস্তার দিকের কিনারাতে নিয়ে যাবে, তারপরে দু'জনেমিলে টানতেটানতে রাস্তায় তুলে ফেলবে। রাস্তার পাশেই ওদের বস্তিটা, হুজুর দেখলেনই; ঠিক হলো এরপর ছুঁড়িটাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি রেখে আসবে ছেলেটা—জোয়ান মেয়ে, এত রাত পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে রয়েছে, চাপা খোঁজাখুঁজি তো পড়ে গেছে ওদিকে—ওটুকু সেরে ছেলেটা একা পারে একাই, নয়তো বাড়ি থেকে মা-বুড়িকে ডেকে এনে শুওরটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

"চুপটি করে জলের দিকে চেয়ে বসে রইল দু'জনে। একটু একটু করে

গ্রাম একেবারে শান্ত হয়ে এল, অন্ধকারে ওদের নজরও বেশ বরদাস্ত হয়ে এসেছে, ছেলেটা বললে, এবার নেমে পড়া যাক।

"কপালের লেখন হুজুর, যদি তখুনি নেমে পড়ে তো বোধহয় ওরকম করে জানটা আর দিতে হয় না—গ্রাম সন্নাটা হলেও তখনও তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েনি, তাড়াতাড়ি আলো লাঠি সড়কি নিয়ে এসে একটা হয়তো বিহিত করতে পারত লোকেরা—কিন্তু কপালের লেখন, ছুঁড়িটা দিলে টুকে। সেই সস্তায় কেল্লা ফতে করবার ব্যাপার হুজুর ; বললে—খানিকটা সবুরই করো না, এখন যদি নামো তো তোমায় সারা পুকুরটা ঘেঁটে দেখতে হবে শুওরটা তলিয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে, তার চেয়ে যদি একটু সবুর কর তো চাই কি ওটা ভেসে উঠতে পারে—অনেকক্ষণ তো মরেছে—তখন খুঁজতেও হবে না, দিব্যি ভাসিয়ে নিয়েও যেতে পারবে ওদিকে।

"গেরো, কালে পেয়েছে কিনা, ছেলেটা বললে—সেই ভালো। নও-জোয়ান, সে আবার নিজের আকিলের চেয়ে মেহরারুর আকিলের বেশি তারিফ করতে পারলে বাঁচে কিনা ; আগেইতো বলেছি হুজুর, নৈলে অত বড় রামায়ণটাও তো তোয়ের হোত না।

"বসে রইল দু'জনে। চারিদিকে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার, ওদিকে দু'একটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ের কান্না নিয়েও যা একটু আধটু আওয়াজ উঠছিল থেকে থেকে, তাও গেল বন্ধ হয়ে, এক এখানে ওখানে গোটাকতক কুকুরের ঘেউ-ঘেউয়েনি ছাড়া একেবারে সব স্তব্ধ। ওরা দু'জনে চুপ করে বসে আছে পুকুরের দিকে চেয়ে—নিশ্চয় খেয়ালী পোলাও-ও খাচ্ছে দু'জনে—শুওর ভেসে উঠবে, ভোজ হবে, দ্বিরাগমন, তারপর সংসার-পাতা।

"কিন্তু শুওর যে ওঠে না! কুকুরগুলোও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, রাত বোধহয় শেষের দিকে কদম বাড়িয়েছে। কিন্তু শুওর ভাসে কৈ? ছেলেটা বোধ হয় ধীরজ্ হারাচ্ছিল, জোয়ান বেটাছেলেই তো, মেয়েটা বললে—আরও একটু না হয় বোসই না, যখন মরেছে উঠতেই হবে ওকে ভেসে, কোন ওজর-আপত্তি খাটবে না।...আমি আন্দাজেই বলছি হুজুর, তবে আন্দাজ আমার ভুল হয় না,—মেয়েরা আবার নি-খরচার একটু তামাসা

দেখতেও ভালোবাসে,—ঐ যে ওকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে একটা খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে, অথচ ও যে নিজের খসমের কাছেই রয়েছে, খানিক পরে তারই সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উঠে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে, এই খেয়ালে ওর তামাসাও লাগছিল খুব। ছেলেটা উঠতে গেলেই বলে—আর একটু দেখো না, ওকে উঠতেই হবে ভেসে, যাবে কোথায়?

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বসা চলল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত, এক সময় পুবের আকাশ আস্তে আস্তে একটু সাফ হয়ে উঠল, তারপরেই চাঁদ বেরিয়ে এল আম-গাছটার পেছন থেকে।

"আর সবুর করা চলে না। চাঁদনি উঠলেই জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা, চারিদিকেই তো বাড়ি। একটা হৈ হৈ পড়েই যাবে, আর, আর কিছু না হোক, ভাগ-বাঁটরার ব্যাপারটাও তো পড়বে এসে। তা ভিন্ন, সঙ্গে একটা মেয়েছেলে রয়েছে—অবিশ্যি নিজেরই মেহরারু, কিন্তু চেনাচেনি হবার আগেই এক প্রস্থ কিলচড় লাঠিবাজি যা হবে তাইতেই তো আদ্দেক কাবার হয়ে যেতে হবে—হয়তো দু'জনকেই,—ছেলেটা নেমে পড়ল।

"ঐ তো জল দেখলেন হুজুর, গভীরও ঐরকম, মাঝখানে একবুকও হবে না, নেমে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলে। প্রথমটা রাস্তার দিকেই যেখানটায় ডুবেছিল, পা বাড়িয়ে বাড়িয়েই দেখলে, না পেয়ে ডুবও দিলে গোটাকতক, কিন্তু হাত লাগল না। খানিকটা এদিক-ওদিকও খুঁজলে ঐ ক'রে, মরবার আগে হাঁকুপাঁকু করতে করতে ছিটকেও তো পড়তে পারে শুওরটা। না পেয়ে মাঝখানে চলে গেল।

"খুবরিটার দিকে খানিকটা এগিয়েও গেছে, মেয়েটা হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে এসে চাপা গলায় বললে—আমিও নামব না হয়?

"যদি নেমেই পড়তো ব্যাপারটা বোধহয় অন্যরকম দাঁড়াত—একটা মেয়েলোকের ওপর দিয়েই কেটে যেত ফাঁড়াটা, কিন্তু বোধহয় একটু দুষ্টুমিতে করবারই ইচ্ছে ছিল, মেয়েরা মাঝে মাঝে যেমন করে—নিজের ভাগটা সরিয়ে রেখে যেমন বলে—আর দুখানা মাছ দোব না হয়?—মোট কথা বললে, কিন্তু নামল না, ছেলেটাও মানা করলে, তারপর আবার খুঁজতে লেগে গেল।

"পা চালিয়ে চালিয়েই তল্লাস্‌তে লাগল হুজুর; পায় না, পায় না, তারপর হঠাৎ ফুর্তিতে একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল—'পেয়েছিরে! শক্ত, কিন্তু যেন কাঁটার মতন।' মেয়েটা বললে—'চুপ, উঠে পড়বে লোকে; কাঁটা মনে হচ্ছে—নিশ্চয় দাঁতে পা ঠেকেছে, ডুব মেরে ধরে ফেল, কিম্বা না হয় কোমরের কাপড়টা খুলে বেঁধেই ফেল ভালো করে, টেনে নিয়ে যাবার সুবিধে হবে।'

"ছেলেটা পা দিয়ে ঠাহর ক'রে ক'রে বললে—একটু যেন নড়ল মনে হোল।

'ভুল তোর, সে দু'পহর হোল মরেছে, রূপনাথপুরের যোগী মহারাজ তো নয় যে, ঘণ্টাভর মাটিতে পোতা থাকার পর বেরিয়ে এসে ভানুমতীর খেল্ দেখাবে, তুই ডুব দিয়ে বেঁধে ফেল—ওদিকে চাঁদ উঠে ইজোরিয়া বেড়ে যাচ্ছে, রাতও বেশি নেই আর।

'নারে, সত্যিই নড়ছে যেন।'—বলেই ছেলেটা একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠল—'ধরেছেরে, বুঝি গেলুম!'

ব্যস, বলেই চুপচাপ, শব্দ যা হোল তা খানিকটা হাত পা আছড়ানর, তারপরে জলের ওপর কতকগুলো ভুড়্‌ভুড়ি—"

খুব উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে, আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম—"মানে!"

"সে-কথা বলতে হলে কুমীরদের স্বভাবের কথা তুলতে হয় হুজুর—বিশেষ করে এই কোশী অঞ্চলের কুমীরদের; ওরকম শয়তান, ধূর্ত কুমীর ধরতীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, এইরকম চোখে ধূলো দিয়ে ·"

একটা বড় সুঁতির ধারে এসে পড়েছি, মোটরটা থামাবার মুখে মণির কানে বোধহয় শেষের গোটাকতক কথা গিয়ে থাকবে, বললে—"খুব জমিয়েছে যে?…লছমী সিং, উতর্ করকে দেখো তো, কেত্তা পানি হ্যায়, জীপ যা সকেগা কি নেহি—"

তাড়াতাড়ি বললাম—"থাক না হয়…নৌকোর ব্যবস্থা হতে পারে না? …কথা হচ্ছে…"

মণি প্রশ্ন করলে—"কেন?"

লছমী সিং ততক্ষণে চকিতে একবার যেন আমার দিকে একটু অনুনয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে জীপ থেকে লাফিয়েই নেমে নদীর মাঝামাঝি চলে গেছে।

বললাম—"না, বলছিল, এখানে নাকি বড্ড কুমীরের উপদ্রব—ঐ যে ছোট্ট ডোবাটা—বনগাঁয়ে দেখলাম, তাতে নাকি লুকিয়েছিল,—একটা বুনো শুওর, আর খানিক বাদেই একটা জোয়ান ছোঁড়াকে···"

মণি ভাল ভাবে ঘুরে বসল, অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"কবে !" গল্পটা আর একটু এগিয়ে বলতে হো-হো ক'রে হেসে উঠল, বললে—"তোমার কাছে আস্কারা পেয়ে ওর আর কিছু আটকাচ্ছে না মেজদা··· পরশুকার কথা—শুওরটা ভালো করে মরে নি, পাঁকে পড়েছিল, গয়লাদের একটা দশ বারো বছরের ছোঁড়া ছোট একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতে যায়, উঠে তাকে ঘায়েল করে—তুপুরবেলার কথা—চোট্‌টা খুব বেশিও নয়···আর তোমাকে কিনা···"

হো-হো করে আবার হেসে উঠল। লছমী সিং ওপারের কাছাকাছি চলে গেছে, বললে—মোটর বেশ স্বচ্ছন্দেই যাবে।

"তুম হুঁসিয়ারিসে চলে আও, গোঁই পকড়ে গা।"

একটু কাঁচুমাচু হয়ে মোটরে এসে উঠল লছমী সিং। মণি স্টার্ট দিয়ে সামনেই মুখটা করে বললে—"ক্যা কহা থা বাবুকো?—ডবড়েমে এক গোঁই··"

আরদালিকে নিয়ে বেশি ঠাট্টাও করতে পারে না, চাপা হাসিতে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। লছমী সিং আমার দৃষ্টি এড়িয়ে বললে—"নাহি হুজুর, যো হামকো বোলায়া উসকো হাম তো ধমকি দিয়া—এ্যায়সা কভি নেহি হো সাকতা···"

আমিও একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়েছি বৈকি; অবশ্য সব লছমীরই গল্প এ জ্ঞানটা ছিল, তবে একেবারেই যে মূলে হাবাৎ তা কি করে জানব? আর, দিনতুপুরের কাণ্ড ও সেটাকে রাতত্বপুর করছে, নায়ক নায়িকা একত্র করেছে, জ্যোৎস্না এনেছে, তারপরে ঐ ট্রাজেডী!···সেই কথাই বললাম—"সব কি বিশ্বাসই করেছি, কিন্তু যেমন বাঁধুনি গল্পের একটু বুঝে দেখবার কি সময় দিয়েছে এতটা সত্যি হওয়া সম্ভব কিনা। আমি তো ভাবছিলাম—কলম ধরতে জানলে ও আমাদের রুজি মারত।"

অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল বৈকি ; এতক্ষণে কোথায় রয়েছি ভালো করে খেয়াল হোল।

দৃশ্যটা বদলে গেছে, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। রাহারসার পর থেকে সেই যে একটানা ভাব,—গ্রাম, বাগান, মাঠ, পুকুর ; ছেলে-মেয়ে, গোরু-বাছুর ; ত্রিহুত পল্লীঅঞ্চলের লোকে-জনে, ফুলে-ফসলে পূর্ণতায় শ্রী, সেটা কখন্ শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন স্তব্ধ, জনহীন নদীপ্রান্তে।... মুহূর্তেই ফিরে এসেছি লছমীর রোম্যান্সের রাজত্ব থেকে, মণিকে বললাম—"জীপটা না হয় একটু থামাবি এখানে? বেশ জায়গাটি, নেমে একটু আড়মোড়া ভেঙে নেওয়া যেত, নদীর জলটাও বেশ তরতরে।"

ভিজে মাটির ওপর নেমে দাঁড়ালাম। এ আবার একেবারে ভাবান্তর, বাদলাঘাট থেকে মধেপুরা অঞ্চল পর্যন্ত এতক্ষণ যা দেখে এসেছি তার থেকে একেবারে আলাদা। বালির জায়গা নয়, এখানে যা ভাঙন কুশীর, তা ভালো ক'রে যেন গড়বে ব'লে, অবশ্য ওর মনের মতন ক'রে। ওর কবিতায় এখানকার লাইনটা যেন পছন্দ হচ্ছিল না, কেটে ভালো ক'রে লিখেছে, কাটার দাগ আছে, কিন্তু লাইনটা হয়েছে এত মিষ্টি যে, তোমার কোনও খেদ থাকবেই না কোন মতে। ··রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি দেখছ তো—কাটা লাইনের ওপর আরও মিষ্টি—আরও মিষ্টি ··

বালির এলাকা নয়। বালির সেই চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি নেই, তার জায়গায় সেই একই দীপ্ত আকাশের নিচে শ্যামলিমা ঝলমল করছে। অল্পখানি নিয়ে নয়তো, বাঁদিকে যে মাঠটা বিছানো রয়েছে সেটা যে কতদূর তা বলতে পারি না—বহুদূরে দিকরেখায় দূরে দূরে তিন চারটি তালগাছের মাথা দেখা যায়, আকাশের গায়ে তিন চারটে কালো ছোপ, দিগ্বধূর গালের তিল। এর মধ্যে যে মাঠটা, তাতে সাহারসার মাঠের অমন বোধ হয় হাজারটা এঁটে যায়। আর সমস্ত মাঠটা সবুজ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে নিয়ে একেবারে সেই তিলবিন্দু পর্যন্ত। উলুখড়, কাশ, ঝাউ, তার সঙ্গে মানুষের সবুজ আশা—বৈশাখী শস্য, গম, নতুন

মকাই, বাজরা, মুগ, আরও কি সব—করুণা যেন উথলে পড়ছে কুশীর। চণ্ডাশোক কলিঙ্গ ধ্বংস করে ধর্মাশোক হয়ে উঠেছে।

মণি বললে—গতবার বন্যা আসেনি, এবারেও বিশেষজ্ঞদের আন্দাজ, আসবে না ; গভর্ণমেণ্ট পুরো উদ্যমে রিক্লেমেশান লাগিয়েছে। দেখলামও—ট্রাক্‌টার পড়ে রয়েছে মাঠে, বড় বড় চাকলা নিয়ে আবাদ হচ্ছে—গ্রাম থেকে দূরে আরও দূরে—উলুখড়, কাশ, ঝাউয়ের বন শেষ করতে করতে এগিয়ে চলেছে আবাদ—। সেই চিরন্তন ইতিহাস—মানুষের আশা, মানুষের পুরুষকার দিকচক্র লক্ষ্য করে চলবে এগিয়ে, দিকচক্রও যাবে এগিয়ে—মায়ের প্রবঞ্চনা, শিশুকে হাঁটাবার জন্যেই হাত বাড়িয়ে, "আয় আয়" বলে নিজে যাচ্ছে পিছু হটে ; পডতে পডতে, উঠতে উঠতে শিশু চলেছে এগিয়ে। নৈলে মানুষ হবে কি করে?

আমাদের সামনেই নদীটা ডান দিক থেকে ঘুরে এসে বাঁদিকে ঘুরে কাশঝাউয়ের বনে ঢুকে পডেছে। কাশীর গঙ্গা, বাঁকা চাঁদ, শিবের পা ধুয়ে যায়, শিব নেন আদর ক'রে মাথায় তুলে। এখানে কুশী একটি রেখা মাত্র, শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ, আছে কি নেই। সেই শিবেরই বিরহে শীর্ণা বনবিহারিণী তপস্বিনী। আমাদের পাশেই ডানদিকে একটি ভাঙা নৌকা পড়ে আছে। আবার এও বলতে হয়—আজ যতোই ভেক বদলাও, কুশী তুমি কিন্তু নিতান্ত করুণাময়ীই নও।

একটা জলের শাখা ঘুরে একটু ভেতরের দিকে চ'লে গেছে। তারই মুখটিতে একজন ব্রাহ্মণ স্নান করে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করছে ঃ সব নিস্তব্ধ। গ্রামের দিক থেকে একজন পথিক এল, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। দূরের যাত্রী। লোকটা গামছার গেরো খুলে চিঁড়ে বের করলে খানিকটা, সেই গামছাতেই ছড়িয়ে জলের ছিটে দিয়ে মাখলে, তারপর—দুজনে খেতে আরম্ভ করে দিলে।

একটা কথা কইতে ইচ্ছে করছে না, বিশ্বনাথ যেন ধ্যানে বসে আছেন, তপঃবিঘ্ন হবে। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে চাকার যেটুকু শব্দ সেও যেন অপরাধ।

যদি সমস্ত জায়গাটা উচ্চকিত করে হো-হো করে হেসে উঠেছে একেবারে ; চমকে উঠেছি।

এও এক আশ্চর্য ব্যাপার,—একজনের মনের চিন্তার সঙ্গে অন্যজনের চিন্তা যে কী অদ্ভুতভাবে মিলে যায় এক এক সময়।

জিগ্যেস করলাম—"হেসে উঠলি যে?"

ওর মুখটা হাসিতে রাঙা হয়ে উঠেছে, বললে—"ওপারে নদীর ধারেই ঐ ভাঙা দেয়াল দুটো দেখছ?"

দেখিয়ে দিতে হয় না, চারিদিকের সবুজ আর নীলের মাঝখানে টুকটুকে রাঙা ইটের দেড়খানা দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। টিসিয়েনের মত শিল্পী হলে এঁকে নেবাব লোভ সামলাতে পারত না। বললাম,—"দেখছি তো, তা কি?"

"একটা মন্দিব ছিল—শিবমন্দিব "

"বেশ তো, তা এত হাসি কিসের তোর?"

"পূজো কি করে হোত জান?—পূজোই বলো বা ঠাকুরের চৈতন্যসঞ্চারই বলো—ধ্যানী দেবতা তো? —নিজেব তপস্যা নিয়েই আছেন—এদিকে ধ্যানভঙ্গের ব্যবস্থাও তেমনি· ·আন্দাজ করতে পার?·· "

হাসিতে কথা শেষ কবে উঠতে পারছে না।

"মাথায় সুপুরি ভেঙে পুজোর ব্যবস্থা ছিল, অবশ্য, চাঁক হ'লে তারপর ফুলবিল্বপত্রটাও পেতেন "

ভেবেছিলাম পুরুত এসে সকালবেলায় ঐ কবে চৈতন্যসঞ্চার ক'বে নাইয়ে ধুইয়ে দিত, তারপর চলত পূজা। তাও নয়। ভাণ্ডের কথায় কথায় ভুল ধরে যে, তাই যেই না পূজো কবতে আসুক, প্রতিবারে মাথায় একটি করে সুপুরি ভেঙে চাঙ্গা করে নেবে, তারপর—নমঃ শিবায়।

হাসি পায় বৈকি, আমায় কিন্তু অন্যমনস্ক করেই দিয়েছে বেশি। চমৎকার লাগে এই দেবতাটিকে আমার। আমাদের শাস্ত্রে তো দেবত্বের এত পূর্ণরূপ কোন দেবতাই পাননি, অন্য কোন জাতের দেব-কল্পনায় কেউ পেয়েছেন কিনা জানি না। আর যত সব দেবতা কেউ করুণার চরমোৎকর্ষ, কেউ

ক্রোধের, কেউ ভীষণতার ; শিবের মধ্যে সব হয়েছে একত্র—শিবও শিব, অশিবও শিব। চন্দ্রচূড়ের রূপেরও অন্ত নেই ; ভস্মাঙ্গ জটাধর, দিগম্বরের ভীষণতাবও নেই শেষ ; করুণায় জাহ্নবী মাথায়, এদিকে তৃতীয় নয়নের বহ্নিকটাক্ষে ত্রিপুরনাশ, সৃষ্টির সবচেয়ে শক্তিধর যে মদন সে মুহূর্তে অঙ্গার-মূর্তি। শাপ দেন, কিন্তু প্রসন্ন 'বরং-ব্রুহি'-রূপই যেন আসল রূপ ; মাথায় বিল্বপত্র জেনে দিলে কি গাছে উঠতে গিয়ে আপনি খসে পড়ল হিসেব ক'রে দেখেন না। চাওনা বব, ধূলিমুষ্টি বত্নমুষ্টি দুই-ই যাঁর কাছে সমান, অন্নপূর্ণা ঘরণী হয়েও যাঁকে গৃহবাসী করতে পারলেন না, তিনি দেবেন বৈকি দু'হাত ভরে। দরকার নেই ষোডশোপচারেব পুজো, সে, যে-দেবতারা হিসেব বোঝেন, তাঁদের কাছে, একমুঠো বিল্বপত্র, দুটো ধুতরো দিলেই হবে- - ব্যাধ গাছে চড়তে গিয়েছিল, দুটো পাতা আপনি পড়েছিল খ'সে, তাইতেই হয়েছিল। যদি মনে হয়—কে জানে, ভোলানাথেব ভুলো মন—কোথায় বয়েছে পড়ে—তো মাথায় সুপুরি ভেঙেই না হয় তুলো সজাগ ক'রে, ভয় নেই, মন বোঝেন, যোগীশ্ববেব তো মন নিয়েই কারবার, তৃতীয় নয়নের বহ্নি ছিটকে বেরুবে না।

সত্যি চমৎকার লাগে। কিছু নেই, কিছু অভাবও নেই, কোন সমস্যাও নেই। সব দেবতাকেই কোন না কোন সময় অন্য কোনও দেবতার দ্বারস্থ হতে হয়েছে, কখনও শিবকে দেখেছ কারুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ?

বলবে—কেন, অন্নপূর্ণাব সোনাব হাতাব নিচে তো হাত পাততে হয়েছিল।

তা'হলে বলব—সে লজ্জাটুকুও জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিলেন বলেই তো।

মন্দিরের এখন ঐ দেড়খানি দেয়াল। দেয়ালের মাথায় একটি অশথ গাছ, ছোট হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট, শিবকে ঘর-ছাড়া ক'রে যেন বর পেয়েছে উলটে। ওটাকে দেখলে আর অবিশ্বাস থাকবে না যে, এ-শিবের মাথায় সুপুরি ভেঙে লোকে পান-সুপুরি খাবার সঙ্গতি করে নিতই।

নদীর ওপারে মণ্ডন মিশ্রের মাহিষ্মতী দেখা যায়, বাঁ দিকে এখান থেকে সোজা পথে ক্রোশখানেকের বেশি হবে না। কিন্তু পথ নেই একেবারেই ;

দী, তারপরেই ঝাউ আর কাশের বন, আমাদের চেঁসকেল ঘুরে কটক যেতে হবে; প্রায় ক্রোশ দু'য়েকের ধাক্কা।

পায়ে হেঁটে নদী পেরুলাম। এক হাঁটুও জল নয়, স্বচ্ছ, তলায় বালি চিকমিক করছে; শান্ত প্রবাহ, পায়ের ঐটুকু ডুবিয়েই সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। এই জলে স্নান করে যে ব্রাহ্মণটি সন্ধ্যাবন্দনায় রত তার দিকে একবার ফিরে চাইলাম। আকাশ থেকে নিয়ে পায়ের নিচের মাটি পর্যন্ত কোনখানে এতটুকু ময়লা নেই, আবর্জনা নেই, এই শুচিতারই ও যেন আত্মিক মূর্তি। মনে হচ্ছে স্নান না করেও, বন্দনা না ক'রেও শুধু এইখানে—এই নিষ্কলুষ বিরাট আবহের মধ্যে দাঁড়িয়েই যেন শুচিশুভ্র হয়ে ওঠা যান, যেন হয়ে গেছি তাই।

নদী শীর্ণ হয়ে গিয়ে ওপারে খানিকটা বালির চরা পড়েছে, সেটা পেরিয়ে আমরা জম্বুদ্বীপে গিয়ে পড়লাম।

সত্যই জম্বুদ্বীপ, আর কিছুই নাম দেওয়া যায় না, এমন জামগাছের ঘটা দেখা যায় না কোথাও। একটা আধটা নয়—ছোট, বড়, মাঝারি গাছে একেবারে ঘন জঙ্গল। তাও দু'দশ বিঘে নয়, সামনে তো বটেই ডাইনে বাঁয়েও যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর এপারের কিনারা ধ'রে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত শুধু জামেরই বন। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। দ্বীপে ক'রে যেতে যেতে অন্য একটা গাছ চোখে পড়ল না, শুধু জামের উপর জাম। অন্য কোন গাছ হতে দেয় না, ক্ষেত-আবাদ তো দূরের কথা। বন দেখছি, কিন্তু একই জাতের গাছের এরকম এক-ছত্র রাজত্ব আর কোথাও দেখছি বলে মনে হয় না। রাস্তার ধারে ধারে খানিকটা ভেতর পর্যন্ত কিছু কিছু কাটা গাছের গুঁড়ি দেখলাম, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় এ-বন কখন উৎখাত হবে বলে মনে তো হয় না।

মাঝখানে বেশ অন্ধকার গোছের। লোক-চলাচল নেই বললেই চলে। শুনলাম বুনো শূয়োরের আড্ডা, তা ভিন্ন চিতে বাঘও বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে, হরিণ তো আছেই। আমাদের চোখে পড়ল একটা নীলগাই। খুব বড় নয়, বড় একটা হরিণের মতন। চলে যাচ্ছিল, রাস্তা থেকে

খানিকটা ভেতরের দিকে আমাদের জীপের আওয়াজ শুনে চমৎকার একটি ভঙ্গি নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে—ক্যামেরা-শটের দুর্লভ একটি পোজ। একটু গিয়ে একটা শুকনো কচুরিপানায় ঢাকা ডোবায় সারসের পাল—কালো-শাদায়—লম্বা ঠোঁট বুকের ওপর চেপে গম্ভীরভাবে ধ্যানমগ্ন। বকেরাও আছে, ওরা তো বনেদী ধ্যানীই; তার ওপর ধ্যানের রাজ্যই, ভিজে মাটির জঙ্গলে এতটুকু কোথাও শব্দ নেই, আমাদের জীপ শুধু তার কর্কশ ঘষরানি দিয়ে আশ্রমপীড়া ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মাহিষ্মতী অর্থাৎ মেহসী গ্রামে এসে পড়লাম। মাঝখানটায় বেশ ঘন বসতি, তারপর একটা নাবাল জমি, বর্ষায় কুশী ঢুকে পড়ে; তারপর বেশ খানিকটা নিয়ে একটা উঁচু পোতা। এইখানেই উগ্রতারা দেবীর মন্দির, এ-অঞ্চলের খুব বিশিষ্ট এক তীর্থস্থান, এইখানেই আশেপাশে কোথায় মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি ছিল। জান তো সে ইতিহাস? শঙ্করাচার্য দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত উত্তর-ভারত পর্যন্ত দিগ্বিজয় করে এসে মণ্ডন মিশ্রেব পত্নী উভয়ভারতীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। তবে, কোথায় কী যেন একটা রয়ে গেছে, আজন্ম ব্রহ্মচারীকে উভয়ভারতী আহ্বান কবলেন কামশাস্ত্রের তর্কযুদ্ধে!

আমরা জীপশুদ্ধ একটা বিস্তীর্ণ ঘনপল্লবিত পাকুর গাছের তলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বেশ গমগমে জায়গাটা, নানারকম গাছে সমস্তটুকু ছায়াশীতল। বেশি-ভাগই পুরনো-পুরনো গাছ, গোটাকতক নারকোল গাছও দেখলাম যা এদিকে একরকম দুর্লভ। আমরা যে-গাছটার নিচে উপস্থিত হয়েছি তার ডানদিকে একটুখানি গিয়ে মন্দিরটা। বাঁদিকে বিশ পঁচিশ গজ দূরে একটা মাইনর স্কুল; বেশ টানা বাড়ি, সামনে খানিকটা বাগান। আমাদের সামনে ডিস্‌পেন-সারি; ইংরেজদের আমলেই ভোর-স্কীমে (Bhore Scheme) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সঙ্গেই ডাক্তারের বাসা। এমনি ডিস্‌পেনসারি, স্কুল নিয়ে বেশ লোক-সমাগম, জেলার হাকিম এসে পড়তে বেশ একটু চাঞ্চল্যও প'ড়ে গেল। ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন, স্কুল থেকে দু'জন ছাত্র চেয়ার

নিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাড়াতাড়ি সামলেসুমলে নিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়ানর মোতায়েন হ'য়ে উঠলেন। একজন বেশ বৃদ্ধগোছের শিক্ষক—বেচারা বয়সের ভারে বেশ একটু কোল-কুঁজোই হয়ে পড়েছেন—এখন খাড়া হয়ে বসে ছেলেদের বসার আদর্শ বিলি করতে লাগলেন, মণিকে বলতে হোল—বেশিক্ষণ বসা চলবে না এখানে, পুণ্য করতে এসে উলটো ফল না হয়। আমরা না বিদায় হ'লে তো উনি আর আদর্শভ্রষ্ট হবেন না, ইতিমধ্যে পিঠের টনটনানিতে যে অভিশাপ ঝাড়তে থাকবেন।

ডাক্তারে-হাকিমে কাজের কথা হোতে লাগল, আমি উঠে পড়লাম,—একটু ঘুরেফিরে দেখে আসি জায়গাটা।

মন্দিরটি যে খুবই পুরনো তাতে সন্দেহ নেই, এখানকার লোকেদের মতে মণ্ডন মিশ্রেরও আগেকার। তা যদি হয় তো হাজার বৎসরেরও বেশি; শঙ্করাচার্যের জন্ম ৭৮৮ খৃস্টাব্দে। খুব মোটা দেয়ালের অতি সাধারণ মন্দির, সামনে ছাড়া পেছনেও একটা দরজা, তবে দু'টো দরজাই খুব নিচু। ভেতবটা বেশই অন্ধকার, তাব মধ্যে দেবীমূর্তি যতটা দেখা গেল তাতে মনে হোল নাকে-মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মাথায় রূপার মুকুট, ওপরটায় সোনা, পেছনে পিতলের একটা ছত্র বা চালচিত্র আছে। বেশ বোঝা যায় মন্দিবে যাত্রিসমাগম যথেষ্ট হয়। একজন অশীতিপরা বৃদ্ধা পুজো করছেন; মন্দিরের ধারে একজন নিষ্ঠাভরে বসে চণ্ডীপাঠ করছেন; বাইরে গান করছে একটি বৃদ্ধ। বেশ একটি সাত্বিকভাবে সমস্ত জায়গাটি সমাচ্ছন্ন। এরা বলে পীঠস্থান, দেবীর কোন অঙ্গ-বিশেষ পড়েছিল। হ'তে পারে, অত জানি ন', তবে তীর্থস্থানের একটা ভাব আছে চারিদিকে। আর-সবে বোধ হয় আধুনিকতা বা প্রগতির ভাবটা ভালো, কিন্তু দেবস্থান যত অতীতের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় ততই যেন তার মাহাত্মটা ফুটে ওঠে ভালো করে। এর কারণ, মনের দিক থেকে দেখলে বোধ হয় এই যে, প্রগতি জিনিসটাই আধুনিক এবং সেই জন্যেই বর্তমানটাকে স্পষ্ট করে তুলে কালকে করে দেয় সঙ্কীর্ণ। একেবারে অনন্তের ধারণায় কোথা দিয়ে যেন

একটা বাধা উপস্থিত হয়। একেবারে যে বর্তমান তাতে দৌড়বার অবকাশ নেই, সেটা আছে অতীতের কিম্বা ভবিষ্যতের মধ্যে।···উগ্রতারার মন্দির এই অতীতকে নিজের মধ্যে ধারণ ক'রে রয়েছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা খালি জায়গার পর একটা টানা ঘর, তাতে সারবন্দী ক'রে অনেকগুলি মূর্তি বসানো, আস্ত, ভাঙা, হরেক রকম। শুধু তাই নয়, সিঁদুর মাখানো একটি যা পাথর দেখলাম, সেটি কোন মূর্তিই নয়, স্পষ্টই একটা থামের গোড়ার দিকটা, আর-সব ঠাকুরের সঙ্গে বসে দিব্যি পূজো পেয়ে যাচ্ছে। অবশ্য মন্দিরের বাইরের দেবতাদের জন্যে পাইকিরি ব্যবস্থা—একছিটে জল আর গোটাকতক আলোচাল, কিন্তু থামের গায়েও যদি তাই পড়ে, অর্থাৎ যে একসময় মাত্র ছাত মাথায় করে থাকত, আর যাঁরা সৃষ্টিকে মাথায় করে রয়েছেন উভয়েরই যদি এক ব্যবস্থা হয় তো চিন্তিত হবার কথা বৈকি।

আমাদের বলে পৌত্তলিক। একেবারে ভুল আখ্যা। মন্দিরে ঐ যে পুতুলটিকে নিয়ে পূজো হচ্ছে—ঐ অশীতিপরা বৃদ্ধার মন্ত্রপূত অর্ঘ্যদান, ঐ চণ্ডীপাঠ, ওখানে বাইরের কোন ধর্মই আমাদের নাগাল পাবে না, ওখানে আমরা মূর্তিকে সামনে রেখে অমূর্তের কাছে চলে গেছি, সে রহস্য, যারা ভগবানকে কথায় অমূর্ত ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের আসনে বসিয়ে হাতে শাসনদণ্ড তুলে দেয়, তারা বুঝবে না। কিন্তু বাইরে এসে সেই-আমরাই পৌত্তলিকের চেয়েও নিচে পড়ে গেছি,—একটা থামের ভাঙা পায়া, সে যে পুতুলও নয়। তাই বলছিলাম—পৌত্তলিক আখ্যাটা আমাদের কোন্‌দিক দিয়েই দেওয়া যায় না; আমরা হয় তার বহু উর্ধ্বে, নয়, তারও বহু নিচে।···আসল কথা হচ্ছে, এগুলো তো পূজো নয়, এ তো 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'ও নয়, প্রহ্লাদের সেই 'স্তম্ভের মধ্যেও আমার শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন'-ও নয়; এ হচ্ছে কাউকে না চটাবার দুর্বলতা, তারই সুযোগ নিয়ে থামের ভ্রূকুটি করে তণ্ডুলতোয় আদায় করে নিচ্ছে খানিকটা।

ঘুরে এসে পোতাটার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম, আরও উঁচু হয়ে এসেছে একদিকটায়। একটা বাড়ির আদল মাটির ওপর রয়েছে জেগে। একটা

মাঝারি গোছের পুকুর, শুনলাম এরই ওপারে নাকি ছিল মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি। ঠিক কোন্‌খানটায় কেউ বলতে পারলে না। দোষ দেওয়াও যায় না। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি, হয়তো রঘুনাথ শিরোমণির মতন স্বেচ্ছাদারিদ্র্যব্রতীই, ক'টা মাসেই তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাজার বছরের এদিকে সে আর নিজের অস্তিত্বের কী প্রমাণ ধ'রে রাখবে?

ওদিকটায় আর গ্রাম নেই, পুকুরটার ওপার থেকে আগাছার বনজঙ্গল, তার পরেই আবার কুশীর নিজের এলাকা। যতটা বুঝতে পারছি, এই তারাপীঠের পোতাটুকুই এদিকে সবচেয়ে উঁচু জায়গা, এইখানে দাঁড়িয়ে চক্রবালরেখা থেকে সমস্ত জায়গাটা এক নজরে দেখে নিতে পারছি—একেবারে রেখালগ্ন হয়ে সেই চারপাঁচটা কৃষ্ণবিন্দু, সেই তালগাছের মাথা কটা—এখান থেকে বিশত্রিশ মাইল দূর হলেও আশ্চর্য হব না, তারপরেই ঝাউকাশের সবুজ ফিকে হ'তে হ'তে ঘন হ'য়ে এসেছে—এসেছে মাঝে মাঝে কুশীর বালুলেখা। কাছে এক জায়গায় স্রোতের খানিকটা যায় দেখা, জলের ওপর মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণ পড়ে ঠিকরে পড়ছে।

কালের স্রোতও জলের স্রোতের সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে, সেখানেও এইরকম অবলুপ্তি, নিজের হাতের ভাঙা-গড়ার মধ্যে, তারই ভিতর একটা জায়গায় এই তীব্র আলো মেহসী-বনগাঁওয়ে এক গৃহপ্রাঙ্গণে করে এসে পড়েছিল—কত ভাঙা-গড়া হোল, কত আলো গেল নিভে, তার দ্যুতি কিন্তু এখনও মলিন হয়নি।

ইচ্ছে করছে কাউকে কাছে ডেকে সেই কথা শুনি, সেই আলোচনা করি একটু, এইখানে দাঁড়িয়ে তার যেন একটা বিশেষ মূল্য আছে। বই খুলে পড়ার মতন সেই ক'টা দিনকে একটু স্পষ্ট করে অনুভব ক'রে নিই।

কিন্তু কে বুঝবে, কে খোঁজ রাখে? ডাক্তার তরুণ, প্রবাসী, স্যুটপরা আধুনিক, হয়তো খোঁজই রাখে না, রাখলেও কেমন যেন বে-মানান, ওকে হাজার বছর আগের সেই দীর্ঘশিখ নগ্নগাত্র ব্রাহ্মণের গৃহে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না—অত্যাচার হবে উভয়ত। স্কুলের ঐ বৃদ্ধ মাস্টারটিকে পেলে হোত বোধহয়।· "পণ্ডিতজী, জানেন মণ্ডনমিশ্রের সেই কাহিনী?· ·· মুখে মুখে

অলিখিত কাহিনী নেমে এসেছে কিছু? করতে পারবেন কিছু নতুন আলোকসম্পাত?"

ওর মুখে মানাত, গাঁয়ের গুমর ক'রে যদি দু'টো কথা বানিয়ে বলত ফলাও করে, বেশিই মানাত; কিন্তু যা ডিসিপ্লিনের কাঠামোতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে কায়েমী হয়ে বসেছে, ও কি নড়ে আসতে পারবে?

তবুও খানিকটা আপসোস মিটল, ফেরবার পথে বনগাঁওে শ্রীদীননাথ ঝাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'তে। মৈথিলী ব্রাহ্মণই; আসলে ওঁরা ঝা, বাঙালীর মত মৈথিলীদের মধ্যেও যে ঐ মুসলমানী খেতাবটা আছে তা এই প্রথম জানলাম। গ্রামের মধ্যে খুব একজন বনেদী গৃহস্থ; নিজে শিক্ষিত, বেশ ভাল চাকরিও করেন, বেহার সরকারের কৃষিবিভাগের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন সম্প্রতি। মণির সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়, এদিকে এসেছে তাই দেখা করে যাচ্ছে। মাঝবয়সের মানুষটি, বেশ সুপুরুষ।

চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

তারা দেবীর যা কাহিনা বললেন তাতে—আমি তো মোটে শঙ্কর—মণ্ডন মিশ্রের সময় ধ'রে ইতিহাসের পাতা ওলটাছিলাম, উনি একেবারে পুরাণের যুগে নিয়ে গেলেন। বললেন, বশিষ্ঠ কর্তৃক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হন; ইনি ত্রিকোণ-তারার তিন মূর্তির মধ্যে এক মূর্তি, ত্রিকোণ এই জন্যে যে, তিনটি সরলরেখার (অবশ্য কাল্পনিক) মধ্যে নিবদ্ধ এই ত্রিমূর্তি—সমব্যবধানে, এক রয়েছেন এখানে, এক বাংলায় (কালীঘাট হওয়া সম্ভব) আর এক মধ্যপ্রদেশে, কোথায় ঠিক বলতে পারলেন না। কোন্ এক পুরানো গ্রন্থের কথাও বললেন তাইতে এই বিবরণের সঙ্গে বশিষ্ঠের আবাসের কথাও লেখা রয়েছে, এই তারামন্দির থেকে কত কোদণ্ড দূরে। কোদণ্ড হোল ধনুক, মাপের পরিমাণটা হোল দু'টো হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দিলে যতটা হয় ততটা। সেইখানে এখন একটি শিবমন্দির রয়েছে···মাপজোখের একটা পুরানো ভারতীয় পদ্ধতি শেখা গেল। বললেন, কুমারিকা থেকে একজন পরিব্রাজক সম্প্রতি উগ্র তারাপীঠ দর্শন করবার জন্যে কিছুদিন থেকে এখানে এসে রয়েছেন।

মণ্ডন মিশ্র সম্বন্ধেও অনেক শ্রুত-অশ্রুত কাহিনী বললেন। এই গ্রামের লোক, সেই মহান্ যশের উত্তরাধিকারী, উনি বলে যাচ্ছেন, আমি শুনে যাচ্ছি, যদি বা কোথাও অলৌকিকত্ব এসে পড়ছে তো সেদিকে ওঁরও হুঁশ নেই, আমারও হুঁশ নেই; বলা আর শোনার আনন্দে দু'জনে মশগুল হয়ে রয়েছি।

আর এই যে মহাপুরুষের চরিত্রে-কর্মে অলৌকিকত্ব অর্পণ, ওটা আমি সেভাবে গ্রহণ করি না। ওটা মহত্ত্বের প্রতি মানবমনের ট্রিবিউট্ (tribute), এটা যদি দুর্বলতাই হয় তো যেন অপরিহার্যভাবেই মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা ..., চিরকালই দিয়ে আসছে মানুষ। এই করে, ভগবান যাকে বড় করেছেন তার সেই বড় হওয়াকে পূর্ণতর ক'রে তুলেছে, নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী। মিথ্যা কথনটা গর্হিত, কিন্তু অতি-কথনটা অলঙ্কার। বলবে তফাৎটা কোথায় দু'টোতে? আছে তফাৎ—গোড়ার উদ্দেশ্যে।

খাঁ-মশাইয়ের বাড়ি থেকে আমরা উঠলাম। গ্রামের মধ্যস্থলে বাড়ি, বিদায় নিয়ে একটুখানি এগিয়ে মাণকে বললাম—"এইটুকু একটু আস্তে করে দে।"

জিগ্যেস করলে—"কেন?"

"রাস্তাটা সরু, তায় গ্রামের মধ্যে—তায় ছেলেগুলো দেখছি বড্ড দুষ্টু..."

—কথাটা মিথ্যে নয়, এদিকে ছেলেগুলোর একটা অব্যেসই দেখছি, মোটর দেখলেই তাল ঠোকে আর দুলতে থাকে, যেন পড়ল লাফিয়ে। কিন্তু সে-ভয়ে নয়: বীরত্বের ভাঁওতাতে তালিম নিচ্ছে মাত্র, পড়বে না লাফিয়ে। মণির কাছে আসল কথাটা লুকোলাম। সেটা তোমায় বলি—পাড়াগাঁয়ে যখন যাবে একটা জিনিস লক্ষ্য কোর, তার একটা অপূর্ব সঙ্গীত আছে। গানও নয়, যন্ত্রও নয়, এমনি নিয়ত সে শব্দতরঙ্গ উঠছে চারিধারে—আপন খুশি-খেয়ালেই—তার একটা মিশ্রধ্বনি—কারুর হেঁসেল থেকে, কারুর গোয়াল থেকে; কারুর পূজোর ঘরের ঘণ্টি উঠল বেজে, কোন মা ছেলেকে দিলে ডাক, কোন শাশুড়ী বধূকে করলে ফরমাস; কোথাও কচি ছেলের কান্না উঠল আকাশ চিরে, কোথাও কিশোরী মেয়ের হাসি উঠল ছলছলিয়ে—এখানে ওখানে, কোনটা মৃদু, কোনটা তীব্র, একটার ঘাড়ে

একটা—প্রতি মুহূর্তেই তাল কাটছে লয় ভাঙছে—তবুও এ সঙ্গীত কান পেতে শোনবার।

আমি তো কান পেতে দিই; বাংলায় গেলে দিই-ই, তার কারণ ভিন্ন সুরে অত বাংলা শোনা তো জোটে না কপালে। আর দিয়েছি এইখানে, খাঁটি মৈথিলীও জোটে না মিথিলায় থেকেও; শহরের জগাখিঁচুড়ি, দশ দিক থেকে দশরকম ভাষা কান করছে ঝালাপালা, তার ওপর আছে মোটর, রিক্শা, টমটম, বাস, লরি, সর্বোপরি লাউডস্পীকার—রীতিমত বাইবেলের সেই বেবেল। আর শুধু মৈথিলভাষা শোনাও তো সঙ্গীত শোনাই। বাংলার সহোদরা,—ঐরকম নরম, ঐরকম মিষ্টি; শুধু সহোদরাই নয়, সংস্কৃত মায়ের যমজ মেয়ে দু'টি; এক মুখ, এক চোখ, এক গড়ন, এক চলন।

গ্রামের শেষদিকে এসে পড়েছি আমরা, বাড়িঘর পাৎলা হ'য়ে এসেছে, গাছপালা এসেছে বেড়ে। রোদের তাত বাড়ায় ছায়া খুঁজতে আরম্ভ করেছে লোকে, কোথায় গাছের তলায় জটলা, কোথাও কারুর দুরুক্ষির দাওয়ায়,—দুরুক্ষিটা হচ্ছে সদরঘর; ঠিক ঘর নয়, চওড়া বারান্দা, দোর জানালা নেই।..... খৈনি মাড়া হচ্ছে বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ড'লে, টেপার তালে মাথা দুলছে একটু একটু, চুণ কম হয়েছে, একজন নিজের 'চুণৌটি' থেকে একটু বের করে এগিয়ে দিলে। ..জোর গল্প জমেছে—"পরন্ত্ রমাকান্তক্ কুটুম্ব্ নৈ নিক ভেলৈন্"—পরন্তু রমাকান্তের কুটুম্ সুবিধের হয় নি।......অর্থাৎ বাংলা দেশের চণ্ডীমণ্ডপের সেই কেচ্ছা।

বেরিয়ে এসেছি গ্রাম ছেড়ে, খুব দূর না হ'লেও অনেকখানি। একটি বড় ইঁদারা, পাশেই একটা বড় জেয়ল গাছ, তার ছায়ায় মেয়েদের জটলা, বেশ ধীরে সুস্থে, থিতিয়ে-জিরিয়ে জল নিয়ে যাবে; কেউ আস্তে কলসী ভরছে, কেউ ধোওয়া কলসী আবার নতুন ক'রে ধুচ্ছে—মা-বোন, কি শাশুড়ী-ননদ দূরে, তাগাদার ভয় নেই, বেহায়াপনার ধমকানি নেই। যে বর্ষীয়সী, সে গ্রামে ফিরে করবেখন নিন্দে—"দাই হে, রবিনাথক্ বেটি যে ভেলি হ্যা, ইস! গোড় লাগৈছি......?"—মাগো, রবিনাথের মেয়েটি যা হয়েছেন! ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার!...এখন কিন্তু নিজেও দলেই গেছে মিশে।

আমাদের মোটর মোড় ঘুরে সামনে এসে পড়তেই সবাই সতর্ক হয়ে পড়ল। জনদু'য়েক—বোধহয় গ্রামের বৌ; ঘোমটা টেনে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই হাতেই আবার সেটা ঘুরিয়ে চোখের সামনে একটা ঘুলঘুলির মতন ক'রে দিলে,—কারা যায়, কি বৃত্তান্ত তারও আবার একটু খোঁজ নিতে হবে তো!

এগিয়ে চললাম আমরা; কূপের ধারের এই ছবিটুকু কিন্তু মনে গেঁথে গেছে।

হাজার বছর আগের কথা। এইরকম একটি কূপের ধার, এইরকমই মেয়েদের জটলা, এই মেহসী-বনগাঁওয়েরই কাছাকাছি কোথাও।

একজন দীপ্তকান্তি দণ্ডী সন্ন্যাসী গ্রামপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। নবীন বয়স, মুণ্ডিত কেশ, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য। কাছে পিঠে কাউকে না দেখে কপেব কাছেই এলেন এগিয়ে। তাপসের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন কবলেন—"ভদ্রে, এইতো বনগ্রাম-মহিস্মতী?"

উত্তর হোল—"আজ্ঞে, হ্যাঁ, আপনি কোথা থেকে আসছেন? কাকে চান?"

"সন্ন্যাসীর দেশ নেই, পরিচয় নেই। আমি এসেছি পণ্ডিতপ্রবর-সার্ব-ভৌম মণ্ডন মিশ্রেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

মেয়েদের প্রগলভতা শান্ত হয়ে গিয়েছিল, আবার কিন্তু একটু টেপাটিপি আরম্ভ হোল, কয়েকটি ঠোঁট একটু বিদ্যুতাভাস—ব্যঙ্গের; মণ্ডন মিশ্রের গ্রামের কথাও জিগ্যেস ক'রে জানতে হয় নাকি! ওটুকু কিন্তু নিতান্তই নারীচরিত্রের দুর্বলতা হিসেবে, তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর সামনে তখনই যেন আপনিই সে-প্রগলভতা গেল মিলিয়ে। একজন শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে, অথচ তারই সঙ্গে নিজের গ্রামের গৌরব মিশিয়ে বললেন—"ভগবান, আপনি এগিয়ে যান; ন্যায়শাস্ত্রের উভয়বিধ প্রমাণ নিয়োগ করেই আপনি তাঁর আলয় চিনে নিতে পারবেন, আমরা সংকেত দিয়ে দিচ্ছি—

**স্বতঃ প্রমাণম্ পরতঃ প্রমাণম্,**

**শুকাঙ্গনা যত্র গীরো গীরন্তি,**

শিষ্যোপশিষ্যৈরুপগীয়মানম্
অবেহি তন্মণ্ডণ মিশ্র ধামম্।

—সন্ন্যাসী উপলব্ধি করলেন, এসে গেছেন গন্তব্যস্থানে, নৈলে গৃহস্থ অন্তঃপুরিকা এভাবে মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে নিজেদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় ?

উপস্থিত হলেন মণ্ডন মিশ্রের আলয়ে।

"আমি শঙ্কর, দাক্ষিণাত্য জয় করে, আর্যাবর্তের আর সমস্ত স্থানই জয় ক'রে মিথিলায় আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে এসেছি। আপনিই এখন মিথিলার শাস্ত্রাধিপতি সার্বভৌম পণ্ডিত; আপনাকে শাস্ত্রার্থে আহ্বান করছি।"

"তথাস্তু। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপনি যে আমার কুটীরে পদার্পণ করেছেন, পরম সৌভাগ্য আমার, আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করে তৃপ্ত হ'ন প্রথমে।"

শিষ্ট বচনাদি দ্বারা আতিথ্যে নিরত হলেন মণ্ডন মিশ্র।

'শঙ্করঃ শঙ্করো বা' স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্করের মূর্তি যে শঙ্কর তিনি এসেছেন দিগ্বিজয়ে, সমস্ত মিথিলায় সাড়া পড়ে গেল; দলে দলে পণ্ডিত সমাগম হ'তে লাগল এই বনগাঁও-মেহসী—বনগ্রাম-মহিস্মতীতে।

পরাস্ত হলেন মণ্ডন মিশ্র।

পত্নী উভয়ভারতী বললেন,—"আমি স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, আমায় নিয়ে তাঁর সত্তা পূর্ণ, আপনি আমাকেও যদি পরাস্ত করতে পারেন তবেই আপনার বিজয় পূর্ণ বলে স্বীকৃত হবে, আমি আপনাকে শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করছি।"

"ভবতু, তাই হোক, কী শাস্ত্রে অভিরুচি আপনার ?"

"কামশাস্ত্র; আমি নারী, এইতেই আমার সহজ অধিকার।" বুঝলেন শঙ্কর। বিরাট শাস্ত্র-সমুদ্র করেছেন মন্থন, কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী কাম-শাস্ত্রের তিনি কি বোঝেন।

তবু শাস্ত্র, ফেরবার উপায় নেই।...নিতেই হল পরাজয় স্বীকার ক'রে।

মেহলী-বনগাঁওয়ের ধূলিতে তার গৌরব-মেশানো আছে; কিন্তু তার লজ্জাও তো আছে কোথাও। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছি। বিজয়টা হোল নিতান্তই যেন টেক্‌নিকাল। চাঁদে একটু কলঙ্ক লেগেই রইল যেন।

জীপ থেকে নেমেই নূতন খবর; ডিটু জানালে—"অপুবাবু আসছেন মেজকাকা।"

প্রশ্ন করলাম—"লোকটা কে?"

"লোক হ'তে যাবে কেন? ছোট ছেলে—এইটুকু—আমার বুক পর্যন্ত—ভাইপো হয় আমার—কাকা বলে।"

কেন যে হঠাৎ পাট-ভাঙা হাফ্‌প্যাণ্ট, শার্ট পরে একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে ভারিক্কে হ'য়ে চলেছে ডিটু তার রহস্যটা বোঝা গেল; মুরব্বির মতন "অপু-বাবু" বলারও। কিন্তু ছেলেটি কে?—ভাইপোর-ভাইপো অথচ আমি জানি না……

টীকা করলে মিটু, টিপ্পনীও—

"অক্ষয়দাদার ছেলে মেজ্‌কা'। আজ ওরা সেরামপুর থেকে আসছে তো। ….হুঁঃ, তাই বলে, একটু কাকা বলে ডাকবে বলে ফরসা জামা-কাপড় পরতে হবে!……দায়টা পড়ছে।"

ডিটু পিছনদিকে কোমরের ওপর হাত দুটো জড়ো করে শুনছিল, একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে ঠোঁটের কোণ কুঁচকে বললে—"কাকা হওয়া এম্‌নি!"

"খুব যেন শক্ত! কাকা তো পথেঘাটে ছড়ানো রয়েছে, কি বলো মেজ্‌কা?"

বললাম—"মেজকাকার তো তাই মনে হয়; এই দেখোনা, এখনও পথের ধুলোই ঝাড়া হয়নি।

অপুরা এল সন্ধ্যের গাড়িতে, শ্রীরামপুরে মামার বাড়িতে গিয়েছিল কিছুদিন আগে।

ডিটু হাত ধ'রে দেখিয়ে নিয়ে গেল। ফুটফুটে ছেলেটি, 'বুক পর্যন্ত'—ওটা ডিটুর বাড়িয়ে বলা—নেহাৎ কাকা-গিরি; বছর ছয়েকের হবে।

চনমনে, চোখে কথার খৈ ফুটছে। ভিটু একবার মুখাবলা করিয়ে দিলে—"আমি তোমার কাকা হইনা অপুবাবু?"

একটা নিমকি খাচ্ছিল, কামড় দিয়ে মাথাটা তুলিয়ে বললে—"পোনাম তো করেছি।"

ভিটু চকিতে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে গম্ভীরভাবে দেখে নিলে, বললে—"দাদুকে পেন্নাম করেছ? বোকা ছেলে। মা বলে দিলেন না?"

আমি কোলে তুলে নিলাম, বললাম—"থাক্ দরকার নেই, দাদু তো খেলার জুটি, তাকে আবার প্রণাম কি? নয় অপুবাবু?"

সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ায় খুশিই হয়েছে, মাথা দোলালে।

"আসছো তো কাল সকালে?"

মাথা কাৎ ক'রে বললে—"হুঁ· কি আচে?"

"থাকবেই কিছু· ·"

"টফি?"

"তাও থাকবে, আসবে, তুমি···"

কাকা তাগাদা দিলে—"এখন নামিয়ে দাও 'মেজকা', ওর এখন বিস্তর কাজ।"

অন্তত বছর দশেক বেড়ে গেছে। ভাইপোর হাত ধ'রে হন হন ক'রে চলে গেল।

আর কিন্তু দেখা নেই অপুর। শুধু এইটুকু টের পাই যে এই বাড়িরই কোথাও না কোথাও আছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না।

অথচ ওকে দরকার ছিল আমার, কুশীগ্রস্ত জীবনটা বেশ একটু একঘেয়ে হয়ে আসছে বৈকি। এ একঘেয়েমি যদি কেউ নষ্ট করতে পারে তো সে অপু।

কিম্বা অপুর পদস্থ কেউ, কিন্তু সে আর পাই কোথায়?

কথাটা কি জান? এখন আমাদের সেই বয়স যখন নাতি-নাতনীদের সংগে কাটাতে পারলেই কাটে ভালো—নাতনী হ'লে তো কথাই নেই। প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সমস্ত সময়টা হচ্ছে জীবনের রোমন্থনকাল।

পূর্বজীবনে যা যা পেয়েছি—শৈশবে, কৈশোরে বা যৌবনে—(পেয়েছি কিংবা পাওয়া যেত)—কতকটা কল্পনায়, কতকটা আধা বাস্তবে—মনে মনে সেইগুলির রসাস্বাদ করে কাটতে হয় এ সময়টা। বাস্তবের অংশে সহায় হয় নাতিনাতনীরা। ওদের সাথী ক'রে নিয়ে দিব্যি অনায়াসেই চলে যাই ওদের বয়সে। আমরা সংসারের লাগাম মুখে করি দায়ে প'ড়ে মাথা ঝাঁকাই, কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করি লাগামটা, কিন্তু ঠাকুরদাদা যখন ঘোড়া হয়ে নাতির-হাতের লাগাম মুখে করে তখন সে সেই ছেলেবেলার মন নিয়েই করে,—সেটা চেহারার দিক দিয়ে যদিই বা বেমানান হয়, মনের দিক দিয়ে মোটেই হয় না। বাপকেও হয়তো ছেলের কাছে ঘোড়া সাজতে দেখে থাকতে পার। যদি দেখে থাক তো জেনো সেটা ছেলের মায়ের মন যোগাবার জন্যে—খুব সম্ভব দ্বিতীয় পক্ষ ; প্রাণের তাগিদে শিশুর সঙ্গে শিশু হ'য়ে যাবার ব্যাপার নয়। বাপে-ছেলেয় ঠিক সে-ভাবে খেলার জুটি হতে পারে না, নাতিই জানে ওর যাদুমন্ত্র, আর সে-মন্ত্র দাদুরই ওপর খাটে।

শুধু শৈশব নয়, যৌবনকেও ফিরিয়ে আনে নাতি-নাতনীর দল। জীবনে ঠাট্টা-তামাশা-রসিকতা যা কিছু বাকি-বকেয়া ছিল মনের কোণে-কোণে, সব আবার নূতন হয়ে ভিড় ক'রে বেরিয়ে আসে এরা যখন এক এক করে এসে জোটে।

রাণুর মেয়ে সেজে-গুজে এসে পাশে দাঁড়ায়। "মেজ-দাদু, আমি হচ্ছি অর্চনা, চেয়ে দেখো!"··· সোজা নয়, দাম্ভিকা নায়িকা! একটু চোখ পিটপিট ক'রে চেয়ে থাকি, বলি—"তাইতো ভাই, ভাগ্যিস বলে দিলে, চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেছে, চিনতেই পারছিলাম না!" কখন দল বেঁধে উপস্থিত—,ঝগড়া হয়েছে—কে বেশি সুন্দরী, সালিশী ক'রে দিতে হবে। বলি—"আমার চক্ষে সবাই সুন্দর ভাই, কাকে মন্দ বলে নিজের ঘর ভাঙব বলো।"

আমি বেগম মহলের সাহানশা বাদশা এখন।

নাতিদের অন্তরালে থাকে আবার নাৎবৌ, সে যেন আরও মিষ্টি। বৈষ্ণবসাহিত্যের পরকীয়া যে!

নাতি-নাতনী হচ্ছে যাওয়ার মুখের পিছু-ডাকা, ঘুরে চাইয়ে ছাড়ে। জানই তো ছেড়ে যাওয়ার মুখে ঘুরে চাওয়া কত করুণ, কত মধুর।

আর, যেমন বলছিলাম, একঘেয়েও হয়ে এসেছে সাহারসার জীবন, এর বালির মতনই বিরস। একটি জলধারা চাই এবার, যেমনটি ছিল মাঠাইয়ের সেই নীল ধারাটুকু—নাকাল করবে না, ডোবাবে না, তার হাঁটুজলের ছলছলানি দিয়ে খেলার সাথীটি হয়ে থাকবে।

খুঁজছি অপুকে, কিন্তু ধরা দিতে নারাজ। তারপর মণির কাছে একদিন রহস্যটা প্রকাশ হোল, বললে—

"ওকে তো বাইরের দিকে পাবে না।"

জিগ্যেস করলাম—"কেন?"

"রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর থেকে বেশি দূরে থাকা ওর পলিসি নয়।"

মিলিয়ে দেখলাম ঠিকই বলেছে বটে। ভাত খাবার সময় কি জলখাবার খেতে যখনই ভিতরে যাই, দেখি অপু বৌমাকে আগলে রয়েছে, যেখানে যাচ্ছেন ও-ও পেছন পেছন চলেছে, যদি বসে কোনও কাজ করছেন তো ও-ও কাছাকাছি খেলার সরঞ্জাম পেতে বসেছে; কখনও আলাদা দেখলাম না।" সর্বদা যে মুখ চলছে এমন নয়, অধ্যবসায় সহকারে লেগে থাকলে মাঝে মাঝে এক আধবার যে চলতে পারে এই প্রত্যাশায় বৌমাকে অষ্টপ্রহর ঘেরে থাকে বেচারি! সম্বন্ধে দিদিমণি, যখন খাবার পায় না, মিষ্টি কথাটা পায়ই, বেশ পছন্দ মতন কেটে যাচ্ছে ওর। ওদিকে বৌমার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে বোধহয়। কাছ ছাড়া হলে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, কাজে মন বসে না, মাঝে মাঝে ঘুষ দিয়ে লোভটা জীইয়ে রাখেন।

কিন্তু একটা দোষ তো হচ্ছেই। ছেলেমানুষের মন, এখন একটু বাইরে এসে খেলাধুলা না করলে, পাঁচটা জিনিস না দেখলে মাথা খুলবে কেন?

সে কথাই ওর বাবা অক্ষয়বাবুকে বলছিলাম।

বললেন—"আপাতত উপায় তো নেই, ওকে কোন রকম কাউণ্টার-অ্যাট্র্যাক্‌শন্ (counter attraction) দিয়ে বের করে আনলে মাসীমার

কষ্ট হবে, এখানে এসেছেন পর্যন্ত এই ব্যাপার চলছে। আর মাথা খোলার কথা বলছেন, সে দিক দিয়ে বোধহয় ক্ষতি হচ্ছে না।"

জিগ্যেস করলাম—"কি রকম?"

"খাবার সংগ্রহ করবার জন্যে যেটুকু মাথা ঘামাতে হয় তাইতে পুষিয়ে যায়। এক একটা বেশ অরিজিনাল্ও, আপনার লেখার খোরাক হতে পারে।"

একটার কথা বললেন—আমি অবশ্য এখানে-ওখানে একটু রং চড়িয়েই লিখছি—

সকালে উঠে এসেই এক প্রস্থ হয় অপুর, কিন্তু সেটা নিতান্ত সাদামাটা আর সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি,—খান দুই বিস্কুট আর দুটো ল্যাবান্‌চুস কি টফি! বাড়ি থেকে একটু কিছু মুখে দিয়েই আসে, তা ভিন্ন ওর দিদিমণি বাসী কোনও জিনিসের হাঙ্গাম রাখেনও না, এলে বাঁধা-বরাদ্দ হিসেবে ঐগুলি হাতে দিয়ে প্রথম ঝোঁকটা সামলান্।

তারপর ঠাকুরের প্রসাদ, অপুই মনে করিয়ে দেয়—"এইবার ভগবান্‌জীর পর্‌সাদি, না দিদিমণি?"

—হিন্দীর আবহাওয়াতেই তো মানুষ হচ্ছে।

নিত্যদিনের ব্যাপার, তবু বোধহয় কথাটুকু বলবার আনন্দেই মনে করিয়ে দেয় অপু। এবারে বেশ একটু বৈচিত্র্য থাকে—ফলমূলের যেদিন যেমন জোগাড় হয়, কিস্‌মিস্ মনাক্কা পর্যন্ত, এদিকে থাকে ক্ষীর বা সন্দেশ, এক একদিন দুটোই, এক একদিন তৃতীয় একটা কিছুর আমদানি হয়ে গেল। এক একটা পদের অল্প একটু করে পেলেও একটা ছোট রেকাবি ভরে যায়। বেশ লোভনীয় ব্যাপার। ভগবানজীর জিনিসের দিকে পূজোর আগে চাইতে নেই, ভগবানজী ভয়ানক চটে যান, তাই তাঁকে খুব লুকিয়ে চুপি চুপি যে দু' একবার চেয়ে নেয় অপু, তাইতেই মুখে জল এসে শুকনো বিস্কুট পায়েসের মতন নরম হয়ে যায়।

আরও একটা সুবিধা আছে, চাইলে পাওয়া যায়ই। যদিও নাকি চাইতে নেই।

সে-কথা প্রায়ই মনে করিয়ে দেন দিদিমণি, কিন্তু প্রায়ই মনে থাকে না অপুর যে ভুলে যেতে নেই।

দিদিমণি বলেন—"আর কখনও চেও না অপু; চাইবে না তো?"

"না, কেন দিদিমণি?"

"ঠাকুরের প্রসাদ হাত পেতে চাইলে যে না বলতে নেই।"

"ঠাকুর রাগ করেন?"

"যে না দেবে তার ওপর রাগ করেন বৈকি। দিতেই হয় একটু। দিলে বেশিও তো হয়ে যায়; বাড়িতে খেয়ে এসেছ, তার ওপর বিস্কুট টফি হয়েছে, বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে তো? অসুখ করবে যে।"

"ভগবানজী ভালো করিয়ে দেবেন না তাহলে?"

এক একদিন দিদিমণির হঠাৎ কোন কাজ এসে যায় হাতে বলে চুপ করে যান, এক একদিন রেগেই বলেন—"ভগবানজী তো আমার পেটের ঠিকে নেননি অপু, তুমি অনাচার করে যাবে আর তিনি সারিয়ে যাবেন।"

ভগবানজীর রূপটা কি রকম জানে না অপু, তবে দিদিমণির রাগটা চেনে, সদ্য সদ্য ঠাণ্ডা করে দেবার চেষ্টা করে—তার কলা-কৌশল জানা আছে ওর—"ভগবানজীর তো অনেক কাজ, না দিদিমণি?"

"হ্যাঁ, কাজ নয়?—বোঝ তো সব, তবু ভুলে যাও কেন? আমি ঠিক দোব, তোমার পেট বুঝে।"

অপু খেতে খেতে বলে—"আর ভুলব না, অ্যাঁ?"

ভুলুক বা মনে থাক, কম পাক বেশি পাক, উঠে পর্যন্ত এই সময়টুকুর দিকে মনটা পড়ে থাকে অপুর। কিন্তু এর জন্যে যা সাধনা করতে হয় তাতে বেচারির অবস্থা কাহিল করে দেয়। ওকে বিস্কুট বের করে দেওয়ার পর দিদিমণির অনেক কাজ—ঝি-চাকর ঠাকুরদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন, মুখ ধোবেন, এরপর আনাজগুলো একত্র করে কুটনো কুটতে বসবেন, তারপর আবার রান্নাঘরে কতদূর কি হোল একবার ঘুরে দেখে আসা, নাওয়ার পাট, তার পরে গিয়ে ঠাকুর ঘর। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় অপু, কি করে যে কাটে সময় এক সেই জানে। ঠাকুর ঘরে গিয়েই না হয় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে

যাক্ ল্যাঠা, তাও তো নয়। ফুল সাজাবেন, ঘাস সাজাবেন, চন্দন ঘসবেন, খাবারগুলোকে নৈবিদ্যি করে আস্তে আস্তে সাজাবেন, তারপর পূজো। এই সময়টুকু আরও কষ্টে কাটে অপুর; ভগবানজী তখন ওদিকে দিদিমণির মন্তর শুনতে থাকেন বলে নৈবিদ্যির দিকে ভালো করে চেয়ে থাকে অপু, এত কষ্ট হয়!

যেদিনকার কথা সেদিন দিদিমণির কাজ আরও গেছে বেড়ে। দাদু জীপ করে বাইরে যাবে, আরও তিনচারজন লোক কোথা থেকে এসেছে, সবাইকে সঙ্গে করে; দিদিমণির যেমন ঘোরাঘুরি বেড়েছে, তেমনি রান্নার জোগাড়ও বেড়েছে, একচোট ঘোরাঘুরি করে এসে এক গাদা কুটনো নিয়ে বসলেন। ওরা নাকি এখানে থাবে।

অপুও এসে বসল নিজের জায়গায়। বসল খেলার সব সরঞ্জাম নিয়েই, যেমন বসে রোজ, কিন্তু কুটনোর বহর দেখে আর খেলায় মন বসাতে পারছে না। হলঘরেরই ওদিকটায় জলচৌকির ওপর যে ফল, প্যাড়া, সন্দেশগুলো নৈবিদ্যি হবে সেগুলো রাখা রয়েছে, দেখতে যে নেই সেটা আজ বেশি বেশি করে ভুলে যাচ্ছে বলে ধৈর্য রাখা যেন আরও দুষ্কর হয়ে উঠছে অপুর, আজ আবার বড় শাদা পাথর-বাটিটায় কি একটা নতুন জিনিস ঢাকা, তার কৌতূহলটা দুর্বার হয়ে উঠে অশান্তিটা আরও তুলেছে বাড়িয়ে।

"আজ ভগবানজীর বড় কষ্ট হচ্ছে, না দিদিমণি? খিদে পাচ্ছে তো।"

"হচ্ছে তো কি করব বলো ভাই? একলা মানুষ, আর দেখো না, এতগুলো কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন। ভুগুন, আমার কি; এগুলি সারতে হবে তো আমাকে, দলবল নিয়ে তোমার দাদু একটু পরেই বেরুবেন। ঠিক করে দিতে হবে তো? থাকুন উপোষ করে ততক্ষণ, আমি কি করব?"—গর গর করে যান।

দেখতে নেই ভুলে গিয়ে জলচৌকিটার ওপর নজর গিয়ে পড়ে। ফোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। খানিকক্ষণ চুপচাপ যায়।

"দিদিমণি!"

"কি ভাই, বলো। তোমারও আজ কষ্ট হচ্ছে, না? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।"

"কষ্ট হচ্ছে বলতে নেই তো। তা'হলে আরও কষ্ট দেবেন ভগবানজী, না?"

"আমি হাত চালিয়ে নিচ্ছি, তারপর এদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাব পূজোর ঘরে। আর একটুখানি বোস, বেশ তো?"

অপু আনাজের গাদার দিকে চায়, একটুখানি যে কতখানি সেই কথা ভেবে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। খানিকক্ষণ শুধু তরকারি কোটার খস্ খস্ আওয়াজ হতে থাকে ঘরে।

দিদিমণি এক একবার আড় চোখে মুখের পানে চান, অপুর দৃ জলচৌকির দিকে। কুটনোর হাতটা দ্রুত করে দেন আরও। বলেন— "খেলনাগুলো নিয়ে ততক্ষণ না হয় একটু খেলো না অপু, অন্যমনস্ক থাকবে'খন। আমার হোল বলে।"

"ভগবানজীর কষ্ট হচ্ছে বলে খেলতে যে ভালো লাগছে না দিদিমণি।"

দিদিমণির ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু ওঠে কোন রকমে চেপে দেন। দয়াও হয়, আহা!—

কিন্তু উপায়ই বা কি? বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আর একটু হলে বুড়ো আঙুলটা কেটে গিয়েছিল বঁটিতে।

কথায়ই ভুলিয়ে রাখতে চান খানিকক্ষণ।

"এসো তাহলে আমরা গল্প করি ততক্ষণ। আমি কুটনো কুটতে কুটতে বলি, তুমি শোন। কোন্ গল্পটা বলি বল তো—সেই লালপরী আর নীলপরীর গল্পটা, কি বল?—সাতসমুদ্র-তেরনদীর পারে এক যে আছে···"

"দিদিমণি···!"

"কি বলো; ওটা নয়?"

"গল্প ভালো লাগছে না।···কুটনো কুটতে কুটতে ঠাকুরকে মন্তর বলবে?"

এবার আর হাসি চেপে রাখা সম্ভব হয় না।

"তা কি হয় ভাই? কোথায় ঠাকুর, কোথায় আমি···"

"ডেকে আনো না দিদিমণি।"

"ডাকলে যদি আসতেন তো আর ভাবনা কি ছিল ভাই?"

"এলে বেশ হোত, না দিদিমণি?—তুমি কুটনো কুটতে আর মন্তর বলতে, ভগবানজী ঐখানে বসে বসে পরসাদি করতেন আর খিদে পেত না ভগবানজীর।"

দিদিমণি যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি একটু ভাবেন, মুখে আবার একটু হাসি ফোটে, এবারে যেন একটু দুষ্টুমির হাসি, বলেন—"এই বা কি মন্দ বলো? ডাকলে আসেন না, উপোষ করিয়ে রাখলে যদি আসেন ক্ষিদের টানে…"

অপু একটু হাসলে, কথাটা একদিক দিয়ে তো বেশ মনের মতনই হয়েছে। তারপরেই কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল। দিদিমণি বার দুই আড়চোখে চেয়ে দেখলেন এবার আর জলচৌকির দিকেও নজর নেই, বেশ চিন্তিত হয়েই কি ভাবছে। কুটনো কোটা শেষ হলে ঝিকে ডেকে সেগুলো নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন।

'পরসাদি' না পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গছাড়া অপুর নিয়ম নয়। এবার কিন্তু গেল না। দিদিমণির শেষ কথাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছে, কথাটার মধ্যে ভগবানজীর জব্দ হওয়া নিয়ে যেমন কৌতুক আছে তেমনই আছে একটা মস্ত বড় সম্ভাবনা, মনে হচ্ছে যেন একটা সুরাহা হলেও হতে পারে।

অপু আগে একটু হিসেব করে নিলে—রান্না ঘরে আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরি হবে, তারপর নাওয়ার পালা, তারপরে গিয়ে পূজোর ঘর; অনেক দেরি।… কে যেন অপুর ভেতরে কোথায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, একটু একটু মজা মনে হচ্ছে, আবার একটু একটু ভয়ও। অনেকক্ষণ হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করে আস্তে আস্তে উঠলো। রান্নাঘরের দোরের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলে দিদিমণি ওখানেই, একটা মোড়া টেনে যেমন গুছিয়ে বসেছেন উঠতে দেরি হবে। পা টিপে টিপে চলে এল, তারপর পূজোর ঘরের দিকে এগুল। চৌকাঠের কাছে এসে, সুড়-সুড়ির মজার চেয়ে ভয়ের দিকটাই যেন বেড়ে গেল অপুর; ডান হাতের চারটি আঙুল মুখের মধ্যে দিয়ে 'ভগবানজী'র

দিকে ঠায় চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একখানি পট ছোট একটি চৌকির ওপর বসানো। পটটাতে আছে মাঝখানে একটা চৌকি, চারিদিকে ঘেরা, তার ওপর একটি ন্যাংটো কালো ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে, ডানহাতে একটা কি, মাথায় বড় বড় চুলগুলো জড়ো করে কি একটা বাঁধা, কোমরে একটা গয়না।···অপুর চেয়ে ঢের ছোট, একেবারে ভয় করবার মতন নয়, অন্য কোন দিনই করেনি, আজ কিন্তু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে যতই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ততই যেন সেই ভয়ের ভাবটা বেড়ে যেতে লাগল অপুর। তবুও রইল দাঁড়িয়ে, একবার পা ও তুললে চৌকাঠ ডিঙোবার জন্যে, কিন্তু পারলে না, যেমন এসেছিল, আবার পা টিপে টিপে ফিরে গেল।

এ ঘরে এসে 'ভগবানজীর' খাবারের জলচৌকিটার সামনে সেই চারটি আঙুল মুখে পুরে ভাবতে লাগল অপু। যতই ভাবছে দেখে দেখে, ততই মুখে জল জমে উঠছে, আর ততই ভয়টাও যাচ্ছে কেটে। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আর একবার রান্নাঘরের দিকে গেল। এখনও বসে দিদিমণি, বকাবকি করে ঠাকুরটাকে কি দেখিয়ে দিচ্ছেন।· তাহলে এখনও অনেক দেরি। এবার বাড়ি থেকে 'দাই'ও আসবে বোধ হয় ভাত খেতে ডাকতে, ব্যস, পরসাদি খাওয়া আর হবে না অপুর আজ।

আর একবার জলচৌকিটার সামনে দাড়াল অপু, তারপব হলঘর পেরিয়ে, দিদিমণির শোবার ঘর পেরিয়ে মিটু-ডিটু-কাকাদের পড়বার ঘব পেরিয়ে আবার ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়ল, একবার এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর চৌকির মাঝখান থেকে-'ভগবানজী'কে তুলে নিয়ে, আর কোন দিকে না চেয়ে হনহন করে এসে একেবারে ফল সন্দেশ ক্ষীরের বড় থালাটার ওপর।

"দিদিমণি! দেখবে এস, ভগবানজী খিদের টানে চলে এসেছেন, পরসাদি হয়ে গেছে—দেবে এসো··· !"

—ছুটে গিয়ে কথাগুলো বলবার জন্যে এইবার পা বাড়াবে, একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল অপু। ব্যাপারটাতে মজার আর একটুও কিছু নেই, যে ভয়টা এতক্ষণ কোথায় চলে গিয়েছিল, যেন হুড়মুড়িয়ে এসে অপুর পা দুটো আটকে ধরলে। এত ভয় তার কখনও হয়নি, একবার মনে হল

এবার চেঁচিয়ে উঠবে, কিন্তু ভয়ে গলায় কথা বেরুচ্ছে না।...রেখে আসুক 'ভগবানজী'কে, কিন্তু যে 'ভগবানজী'কে এক্ষুনি অনায়াসে দু' হাতে জড়িয়ে নিয়ে এল, তাঁর দিকে হাত বাড়ালে যেন হাত উঠছে না ভয়ে। কাঠ হয়ে সামনে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপু, তারপর সেদিক থেকে যেন টেনে চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে এক ছুটে নিজেদের বাড়ি।

দিদিমণি রান্নাঘর থেকে সোজা গোসুল ঘরেই চলে গেলেন,—ঠাকুরেরও বেলা হয়ে গেল, তার ওপর একটা ঐ শিশু হা-পিত্যেস করে মুখ বুজে বসে রয়েছে ; একটা শুধু হাঁক দিয়ে গেলেন—"তুমি বোস অপু, আমি এই এলুম বলে।"

তাড়াতাড়ি সেরে' নিলেন স্নানটা আজকে। হলঘরে কিন্তু এসে দেখেন অপু নেই। ডাক দিলেন--'অপু'! আরও জোরে ডাক দিলেন—উত্তর নেই। ঘর তিনটেতে এক এক করে গিয়ে দেখলেনও যদি থাকে, অপু বাড়িতেই নেই।... ছেলেমানুষ, এই খাওয়াটাই ওর বড় জলখাবার, আজ সময় অনেকক্ষণ উতরে গেছে, নিশ্চয় মার কাছে কিছু খেয়ে আসতে গেছে। ঝিকে ছেলেদেব পড়ার ঘর থেকেই ডেকে বললেন—"দেখ্‌তো, ডেকে নিয়ে আয়—বলবি আমার হয়ে এল বলে..."

তাড়াতাড়ি শোবার ঘর পেরিয়ে হলঘরে এসে নৈবিদ্যের থালাটা তুলতে যাবেন, থমকে দাঁড়াতে হোল, একটা যেন ছবি উলটে সবগুলো ঢাকা। ঠাকুরের জিনিস, প্রথমটা অশুচিতার ভয়েই মনটা শিউরে উঠল।

তারপর ছবিটা উলটে নিয়ে বুঝতে পারা গেল ব্যাপারটা—শিউরোবার কিছু নেই ; নাড়ুগোপাল আর পেটের জ্বালা বরদাস্ত করতে না পেরে ছুটে এসে নৈবিদ্যির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন।

এক দিকে হাসি পেটে গুড়গুড়িয়ে উঠছে, এক দিকে কি একটা কিসের জন্যে চোখে আসছে জল ঠেলে।...অপু যাই ভেবেই কাণ্ডটা করুক, দিদিমণি আর আসনে বসে বিধিমতে পূজোটা করতে পারলেন না সেদিন—ক্রমাগতই

কেমন যেন মনে হোতে লাগল—আজ ছুটি শিশুর এই খেলার মধ্যে প্রবেশ করতে যাওয়া কোথা দিয়ে যেন মস্তবড় একটা অন্যায় হয়ে যাবে।

ওই মন্ত্রহীন খাওয়াতেই প্রসাদ হয়ে গেল আজ। বুঝলেন অপু আসবে না, ভয়েই হোক, লজ্জাতেই হোক; নিজেই খানিকটা খাবার রেকাবিতে করে নিয়ে ও বাড়ির দিকে চললেন।

আমরা এখন স্থপৌলের ডাকবাংলোয়; এই অল্পক্ষণ হোল এসেছি। এই ত্রিশ মাইল পথের ধুলোবালি ঝেড়ে, হাত-পা ধুয়ে নেয়ারের খাটে গা এলিয়ে পড়ে আছি। এবারে সাথীর মধ্যে অক্ষয়বাবুও রয়েছেন, ওঁদের কতকগুলো কি আফিসগত তদ্বিরতদারক আছে। মণির ইচ্ছে ছিল না আসি, ক'দিন থেকে ঘোরাফেরার বড় মেহনৎ হচ্ছে, এই গরম, তারপর এই রাস্তা, তার ওপর এই জীপ; ওর ইচ্ছে ছিল না মোটেই। আমি অক্ষয়বাবুকে হাত করলাম। যাদের বয়স কম, তাদের দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম এসবকে হাল্কা ক'রে দেখাবার একটা ভাষা তখনও বেশ আয়ত্ত থাকে, ওর ওকালতিতে মণির আশঙ্কা অনেকটা কমল। কিম্বা হয়তো এও খতিয়ে দেখলে যে-রেটে যুক্তিটা হজম করছি, তাতে শত্রুমুখে ছাই দিয়ে ওদের মেজদা' এখনও বেশ ডাঁটোই আছে। আপত্তির মধ্যে শুধু বললে—"বড্ড দূর… তোমার পক্ষে…"

হেসে বললাম—"তা বলে তেমন দূর নয়—আমার পক্ষেও—সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারা যাবে না বলে তোর ভয় হচ্ছে।"

এর পর আর কথা বাড়াতে পারলে না। আমার দৃষ্টি যে আরও কত দূরপ্রসারী, সেকথা আর না বলে উঠে পড়লাম। সেকথা শুনলে তো অক্ষয়বাবুও শিউরে উঠতেন।…খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি—এবার তাঁকে কি মন্ত্রে হাত করা যায়।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যাচ্ছে পথের ছবিগুলি—যে পথটা এই অতিক্রম করে এলাম। মনটা ক্লান্ত ব'লে ছবির রীলটা (reel) একটানা নয়, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে—শুধু কতগুলো কি করে যেন হয়ে রয়েছে উজ্জ্বল—সেইগুলোই ফুটে ফুটে উঠছে।

উজ্জ্বল হলেও তার সবগুলোই যে বিশিষ্ট তাও নয়—

—দুটি ভাইবোন (তাই বলেই ধরে নিচ্ছি) মাঠ ভেঙে হনহনিয়ে চলেছে—দূরে, আমাদের দিকে পেছন, বছর সাত-আট হবে—বোনের মাথায় একটা থালা, ওপরে গামছা দিয়ে ঢাকা, বোধ হয় বাপের জন্যে ভাত নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। একটু নুন পাতের ধারে, শাকও আছে কি একটু? কিন্তু সে ভাবনা আমি ভেবে মরছি কেন? মোড় ঘুরেই একটা চেনা মিষ্টি গন্ধে ফিরে চাইলাম—এমন কিছু নয়, শুধু একটা ঝাঁকড়া গাছে একরাশ কলকে ফুল ফুটে রয়েছে, তখন চলেও এসেছি অনেকখানি। গ্রাম থেকে বাইরে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর একজন বেদেকে ঘিরে একপাল ছেলে জুটেছে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা—ধারেই একটি বাড়ি—হাত পনেরো চওড়া একটা উঠোনের পরেই একটা টানা দাওয়া (এরা বলে ওসারা)—উঠোনটা ঢালু হয়ে এসে রাস্তায় মিশেছে। একদিকে দুটো ধানের মরাই, উল্টো দিকে তিনটে খুঁটির ওপর বড় মাটির গামলা ছোট একটা আমলকী গাছের নীচে, দুটো বলদ জাবনা খাচ্ছে তাই থেকে। এটাকে একটু বিশিষ্ট করেছে ঐ মেয়েটি—বছর আটেকেরই, টুকটুক করছে রং, শাড়িতে, আংরাখায়, রূপোর গয়নায় জমজম করছে, কপালে একরাশ সিঁদুর। বাড়ির মেয়ে, নতুন বিয়ে হয়েছে, কোথায় হায়া হবে, ভব্যতা শিখবে, তা নয়, মোটরের ডাক শুনে সবার চোখে কি করে ধুলো দিয়ে বাইরে চলে এসেছে।

বোধ হয় কাল রাত্তিরে পণ্ডিতজীর যে কথকতা শুনছিলাম—রামের বিবাহ, তাই থেকেই আমার সীতার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। সত্যি কথাটাই বলব? মোটেই দুঃখিত হচ্ছিলাম না যে, সারদা আইনের লঙ্ঘন হয়েছে। আমার কৌতুক-কৌতূহল এইখানে যে, একটু ভেতরের দিকে গিয়ে পড়তে পারলে এই মিথিলায় মা-জানকীকে এখনও তাঁর বিয়ের বয়সে এইরকম করে যায় দেখা তাহলে!

আরও দুটি ছবি স্পষ্ট হয়ে রয়েছে মনে, একটি কুশীরাণীর পরাজয়ের, অপরটি বিজয়ের—

সাহারসার নতুন শহর যেখানে গড়ে উঠেছে, পুরনো শহর থেকে

মাইল দেড়েক সরে এসে, সেটা পেছনে ফেলে খুব বড় একটা বাঁক ঘুরে আমরা যে জায়গাটায় এসে পড়লাম তার ডানদিকটা নিচু খাদ, আর বাঁদিকটা আস্তে আস্তে উঠে কচ্ছপের পিঠের মতন গোল হয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, মাঝে মাঝে একটু দোল খেয়ে একেবারে সেই আকাশরেখা পর্যন্ত। ডাইনের খাতে সবুজ লকলকে ফসল উঠেছে ; মকাই, বাজরা, মুগ ; বাঁয়ে ফসল কিছু নেই, তবে সমস্তটা একরকম অল্প লালচে চাপা ঘাসে মোড়া, যতদূর দৃষ্টি যায় এতটুকু ফাঁক নেই। বহু দূরে দূরে গোটা তিন গ্রাম, কয়েকটা বাড়ি জটলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনেই খানিকটা দূরে একপাল গরু চরছে, ঘাসের ওপর শাদা শাদা কয়েকটা ছোপ দিয়ে দিয়েছে কে যেন। গাছের মধ্যে গোটাকতক খুব পুরনো পুরনো গাছ, কোথাও ছাড়া-ছাড়া, কোথাও এক সঙ্গে কতকগুলি।

এই ধরণের জায়গা কুশী এলাকায় মাঝে মাঝে আছে। সেদিন মধেপুরায় যেতেও দেখছিলাম একটা। সে আরও অপূর্ব। সেখানে আবার এই রকম একটা শুকন খাতের ধারে একটি মন্দির, খানিকটা দূরে দূরে বড বড পুরনো গাছ, তার মধ্যে রাধাচূড়া বা গুলমোহরও আছে, সোঁদালও আছে। বেশ বোঝা যায় একটি নদী বয়েছিল একদিন ঐ খাত দিয়ে, একটি গ্রাম উঠেছিল গড়ে, কুটীরে-হর্ম্যে-মন্দিরে-উদ্যানে, তারপর গেছে সব নষ্ট হয়ে।

এগুলো সব কুশী নদীব পরাজয়। অবশ্য পরিণাম সেই ধ্বংসেই, তবু পরাজয় বলি কেন ?

—কুশী মাঝে মাঝে যেন পথ ভুলে কি করে উঁচু শক্ত জায়গার মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন দুদিকের চাপে তাব আর জারিজুরি থাকে না। কুশী তখন লক্ষ্মী মেয়ে,শান্ত-শিষ্ট,বছরের পর বছর ধীর প্রবাহে বয়ে চলেছে। রূপ দেখে মানুষের সাহস হলো, আস্তে আস্তে এসে জুটতে লাগল, গ্রাম উঠল গড়ে, উঠল সমৃদ্ধ হয়ে আস্তে আস্তে ; বাড়ি, ঘর, রাস্তাঘাট, বাগান, বাজার ; মন্দির উঠল, আরতির ঘণ্টায় গ্রামের সমৃদ্ধির ওপর দেবতার আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর কুশীর হঠাৎ একদিন মনে পড়ল—এ কি কাণ্ড, আমি তো লক্ষ্মী নই কোনকালে !

কিম্বা এই কথাই মনে পড়ে গেল যে, লক্ষ্মী তো চিরচঞ্চলা! এ কার দোরে আমি বাঁধা পড়ে গেলাম!

চঞ্চলা হয়ে ওঠে কুশী, লক্ষ্মী ধ্বংসের নেশায় ওঠে জেগে; কূল চেপে পড়ে ঝাঁপিয়ে, স্কুল ভেঙেছে এবার, ভাঙনে মাতবে। কিন্তু উঁচু, কঠিন জমির ওপর কোন আক্রোশই খাটে না, বছরের পর বছর যায় কেটে।

হার মেনে কুশী তখন যেন মানে মানে আসতে থাকে স'রে।

বছরের পর বছর আস্তে আস্তে স্রোত আসে স্তিমিত হয়ে, নীল জলের জায়গায় দুকূল চেপে সবুজ ঘাস আসে এগিয়ে। একদিন দেখা গেল স্রোত একেবারেই অবরুদ্ধ; শুধু এখানে ওখানে, বন্দী সেনার মতন খণ্ডিত জল রয়েছে আবদ্ধ হয়ে। কুশী হার মেনে গেছে সরে।

নদী-আশ্রিত গ্রামও গেল মিলিয়ে ধীরে ধীরে, পথ-ঘাট-কুটীর-হর্ম্য-উদ্যান, সব গেল। এখন প'ড়ে আছে খাতের ধারে ঐ দেবতা-হীন মন্দির, আর একদিনের যত্নে-পালিত ঐ ক'টি গাছ; বসন্তে বসন্তে যেন কবরের ওপর ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছে।...ধ্বংসই বলব, না, বলব যে কুশী একদিন কি-একটা সুখস্বপ্ন, দেখেছিল, কিন্তু কী যে অভিশাপ আছে, ও স্বপ্ন ওর টেকে না।

বিজয়ের রূপ? সে তো এসে পর্যন্ত দেখছি; বাদলাঘাটের কিনারা থেকে আরম্ভ করে। তবু আজ যা দেখলাম তা যেন সব কিছুকে গেছে ছাড়িয়ে। আজ এইমাত্র দেখে আসছি—কুশী যেখানে হয়েছে 'কীর্তিনাশা,' শুধু ক্ষেত ভাসালে, বালি ছড়ালে ঠিক এ-ধরণের ব্যাপারটা হয় না, সে-সব হচ্ছে কুশীর মাটি নিয়ে খেলা। বারিয়ারি গ্রামখানার ধ্বংসে কুশী সত্যই হয়ে উঠেছে কীর্তিনাশা মেঘনা।..কাজ হয়ে গেছে, এখন গ্রামের পাশ দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ ধারায় ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে কুশী। কিন্তু কি সর্বনাশটাই না করেছে! রাজবাড়ির বিরাট প্রাসাদ ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাদের দক্ষিণে রয়েছে দাঁড়িয়ে; মাত্র একটা গ্রামই ছিল বারিয়ারি, কিন্তু গোটা ছয় মন্দির যা এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে দাঁড়িয়ে তার একটাতেই একটা নগরী গৌরববোধ করতে পারে। দূরে কাছে আরও সব বাড়ি, সবই পরিত্যক্ত। বিরাট একটা জায়গা নিয়ে অতবড়

গ্রামটা যেন শ্মশানভূমি হয়ে গেছে, লোক নেই জন নেই, পথঘাট নেই। শুধু বালির রাশি আর কুশীর ছোট ছোট ধারা—কত যে তার ঠিক নেই, এখন শুকন, বর্ষায় জল নামলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়ায়—আর কি বাকি আছে এইরকম ক'রে বিধ্বস্ত করে ফেলবার।

সুপৌলের ডাকবাংলোটি চমৎকার। সমস্ত বাড়িটা লালরঙের, প্রশস্ত বারান্দা, বড় বড় ঘর, সৌখীনভাবে রঙ করা, বড় বড় দোর-জানালা। আমি যে জানালাটার ধারে শুয়ে আছি সেটাকে ইংরিজীতে বলে বে-উইন্‌ডো (Bay Window), দেয়ালের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ডবল ফ্রেমে (Double Frame) তৈরি। হু হু ক'রে হাওয়া ঢুকছে। সবই ভালো, কিন্তু আমার কপালদোষে সব যেন ওলটপালট হ'য়ে যাচ্ছে। কারণটা বলি—

নতুন জায়গায় এলে বড় দিক্‌ভ্রম হয় আমার। প্রথমেই যে ধারণাটা মনে বসে যায় সেটা কোনমতে সরাতে পারি না মন থেকে। যেটাকে পশ্চিম বলে ধ'রে নিয়েছি স্থানীয় লোকের কেউ যদি বলে সেটা আসলে উত্তর তো ধারণাটা যতই বদলাবার চেষ্টা করি ততই যেন অশান্তি যায় বেড়ে। ব্যাপারটা ক্রমেই যে অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে ওঠে তার কারণ অশান্তিটাকে সরাবার জন্যে উত্তরকে উত্তরই মনে করবার চেষ্টা ক্রমশ বেশি করেই হয় করতে। আমার মনের কুরুক্ষেত্রে উত্তরে পশ্চিমে যেন সমর বেধে যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ একটু ভূমির জন্যে।

হুহু করে খোলা জানালা দিয়ে আসছে হাওয়া। বাংলোর পাশে বাঁধ, তার পরেই খোলা মাঠ; বাঁধের ওধারে, ঠিক বাঁধ ঘেঁষে নতুন দুটি চালাঘর কোনও চাষা গেরস্থ সাহসে ভর দিয়ে তুলেছে; এখনও অবিশ্বাসটা যায়নি, গাছপালা কিছু বসায়নি, দুচারটি বাবলাগাছ যা বন্যার ফাঁড়া কাটিয়ে টিকে ছিল সেগুলিই দাঁড়িয়ে উঠোনটার ওপর হালকা ছায়া বোলাচ্ছে। সমস্তটুকু প'ড়ে প'ড়ে বেশ উপভোগ করছিলাম, লছমী আরদালি যে ওটাকে উত্তরে হাওয়া ব'লে গেল সেইটে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়ে মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করছে শুধু। আমি নেমেই ভেবেছিলাম সমস্ত বাড়িটা উত্তরমুখো, সেই থেকে

জানালাটা হওয়া উচিত পশ্চিমে, সুতরাং হাওয়াটাও। কোনমতেই বাড়িটাকে ঠিকমতন বসাতে পারছি না। এ ধরণের অশান্তিতে পড়েছ কখনও? শুকন ডাঙায় আছাড় খাওয়া নয় কি?

দুজন হাকিমের শুভাগমন হয়েছে শহর থেকে, তাও আবার বড়-মেজ একসঙ্গে। বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে। ডাকবাংলোর প্রায় লাগোয়া আদালত। পাশের হলঘরটায় যেরকম কথাবার্তা চলছে তাতে মনে হয় এখানকারও দু'একজন অফিসার এসেছেন, বোধ হয় কন্‌ফারেন্স গোছের কিছু হচ্ছে। বড় সমস্যা অবশ্য আসন্ন বন্যা।—এবার কোন্ দিকে নজর কুশীর? বছর দুই কুশী সুপৌল ছেড়েছে, এখন পশ্চিমমুখো; আবার যাতে ঘুরে না দাঁড়াতে পারে তার কি করা যায়?...প্রস্তাব, প্রতিপ্রস্তাব উঠছে। আমি কুশীর দিকেই, মনে মনে হাসছি। মনে হচ্ছে এই স্তব্ধ দুপুরে কুশী-সুন্দরীও যেন কাছাকাছি কোথায় ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে শুনছে এ ক'টি মূঢ় মনুসন্তানের জল্পনা-কল্পনা; সে-ও মুখে আঁচল গুঁজে হাসছে।

বেশ চনচনে খিদে হয়েছে। দোরের মধ্যে দিয়ে ডাকবাংলোর রান্নাঘরে যেরকম ব্যস্ততা দেখছি, মনে হয় আয়োজন ভালোরকমই হচ্ছে, কিন্তু জুটেছে অনেকগুলো, সেই ভয় হয়, 'Too many Cooks'-এর ব্যাপার হয়ে পড়বে না তো? বিশেষ করে ভয় লছমী আরদালিকে। ওকে ক'দিন থেকে দেখে, ওর গল্প শুনে যতটা বুঝছি, তাতে মনে হয় ও ছোটখাট কিছু করবার দিকে যাবে না। তাতে শেষ পর্যন্ত সব পণ্ড হওয়াই সম্ভব, অন্তত খুব দেরি হয়ে তো যাবেই। অথচ ওর গল্পের ভয়ে ওকে ডেকে নিতেও সাহস হয় না, কেন না, অন্তত এখন আমার এই বাস্তব পৃথিবীটাকে এতই মিষ্টি লাগছে যে, রোম্যান্সের স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করবার মোটেই উৎসাহ নেই। দোমনা হয়ে উঠেছি, এমন সময় কি একটা দরকারে লছমী এঘরে একটু এল।

জিগ্যেস করলাম—"তুইও কি রান্নায় লেগে রয়েছিস? নৈলে আসতে আসতে সেই যে গল্পটা আরম্ভ করেছিলি, শুনতাম।"

বেশি কথা কয়ই না, এক্ষেত্রে একটু লজ্জিতভাবে শুধু হাসলে। তার মানে হয়—এমন কথাও জিগ্যেস করছেন?—আমি ওখানে না হলে চলে?

"ঐদিকেই থাকবি?—থাক তাহলে; কিন্তু জানিস তো রাঁধতে?—নৈলে ডাকবাংলোর বাবুর্চির হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।"

"হুজুর, আমি দু'বছর আমার সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছি। মেমসাহেব ছ'মাস মাত্র ছিলেন, সেই যে আমায় শিখিয়ে-পড়িয়ে চলে যান মাদ্রাজে, সাহেবের বদলি হওয়া পর্যন্ত আর ফেরেন নি। রান্নাঘরের চারিজ একলা আমার হাতেই ছিল।"

আর দ্বিমত করলাম না, বললাম—"তুই গল্পটাই বল। মেমসাহেবের নিজের শেখানো রান্না—সে খেতে হবে বৈকি; বাসায় একদিন তোয়াজ করে রাঁধবি, এখানে সেসব সরঞ্জামও পাবি নি, আর তাড়াহুড়োও তো। —মাঝে পড়ে মাদ্রাজের বদনাম।"

বেশ ক্ষমতা আছে লোকটার, অত ঝোঁক, কিন্তু রান্নাঘরটাকে সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে বেশ গুছিয়ে-সুছিয়ে বসে গেল।

"আপনাকে সেই পোড়ো বাড়িটার কথা বলছিলাম—আপনি আসতে আসতে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন হুজুর যে ..."

—কিন্তু ভগবানের দয়া আছে আজ, এ নিগ্রহ থেকেও পরিত্রাণ দিলেন।

সামনের দরজা দিয়ে একটি ভদ্রলোক ভেতরে এসে হাত তুলে নমস্কার করলেন, তারপর যেন পূর্ব পরিচয়ের হাসি মুখে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চেনা মুখ বৈকি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না তো।

বেশি সময় দিলেন না, বললেন—"আমি গোপালসুন্দর··মনে পড়েছে এবার? মজঃফরপুর··"

তার আগেই সমস্ত চিত্রটুকু স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মজঃফরপুর ডিভিসনাল কমিশনারের পার্সনাল অ্যাসিস্‌টেণ্ট ভৈরববাবুর বাড়িতে জমাট কীর্তনের আসর, আমি গেছি কলেজের অধ্যাপক-বন্ধু ডাঃ হরিঞ্জন ঘোষালের সঙ্গে। মূল গায়েন ভৈরববাবুই, খোল নিয়েছেন একটি যুবক, মাতুনি এসেছে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সঙ্গত করে যাচ্ছেন। পরিচয় পেলাম,

সাবডেপুটি, এও শুনলাম দিন দুয়েকের মধ্যেই বদলি হয়ে নাকি সুপৌলে চলে যাচ্ছেন, কীর্তনের আসরে নক্তকারের অভাবে একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জের ধরে আরও মনে পড়ে গেল, পরদিন এঁর বাসাতেও যে গেলাম দুজনে, ছোট্ট সংসারটি, চা হোল, খানিকটা গল্পগুজবও, শুধু পোশাকের একটু তফাৎ হয়েছে, আর জায়গার, তাইতেই সব ভুলে বসে আছি। যাই হোক, সে লজ্জাটা চাপা দিয়ে বললাম—"খোলও নেই, ভোলও ফিরিয়েছেন, কাজেই বেশি দোষ দিতে পারেন না আমায়। বসুন। সেই থেকে বরাবরই সুপৌলে ?"

হেসে একটা চেয়ারে বসে বললেন, —"কপালের দুর্ভোগ না কাটলে তো রেহাই নেই।···মণিবাবুর মুখে শুনলাম আপনিও এসেছেন। সুপৌল হেন জায়গায় শখ করে কেউ যে আসতে পারেন·· "

বললাম—"কেন, দুর্ভোগ তো কারুব খাস সম্পত্তি নয়; আর কারুর কপালে লেখা থাকতে নেই ?"

হেসে বললেন—"কিন্তু এ যেন উল্কি দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে···শখ করেই ."

দুজনেই হেসে উঠলাম।

বললাম—"কথাটা হয়ত অস্বীকার করতে পারতাম, কিন্তু গায়ের ব্যথা এখনও মরে নি। তাই ভাবছি এর রহস্যটা কি !"

"হয়তো এই যে, পরের দুর্ভোগ দেখাটা মোটেই দুর্ভোগ নয়।"

বললাম—"কিম্বা যদি হয়ও দুর্ভোগ তো পরের দুর্ভোগ দেখার আনন্দে সেটা কেটে যায়।"

"হয় বৈকি সেরকম সন্দেহও, যে কষ্টটা মাথায় করে এসেছেন এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়·· "

—হাসি আমাদের গড়িয়ে চলল। লছমী আরদালি উঠে গিয়েছিল, আবার একবার হন্তদন্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল, খুব ব্যস্ত হয়ে এ-কোণ ও-কোণে কি যেন খুঁজলে, তারপর তেমনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা আমি বুঝলাম, ওর পেটে সেই গল্পটা গজগজ করছে, ফাঁক নেই দেখে বেরিয়ে গেল। আহা, বেচারি! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝি তো ওর যন্ত্রণাটা। তবু তো কত সুবিধে আমাদের, কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, লিখে ফেলে মনটা তো খালাস করতে পারি। ডেকে শুনতেই হবে একসময় ওর গল্পটা। অবশ্য একটা সর্ত রাখলাম মনে মনে—ও যদি এইরকম ক্ষিদের মুখে আমায় আয়ার-গৃহিণীর কাছে শেখা চালের পিঠে, কি লঙ্কা-তেঁতুলের 'রসম্' খাওয়াবার অভিসন্ধি রাখে তো ওর সম্বন্ধে আর আমার কোনও দায়িত্বই থাকবে না। তাহলে কিন্তু ওকে একটু ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়াও দরকার, নৈলে অবিচার করা হয়।

নেমে গিয়ে দরজার কাছ থেকে ডাক দিতে লছমী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রশ্ন করলাম—"আর কত দেরি রান্নার?"

"আর অল্প একটু দেরি আছে হুজুর, আমি মোতায়েন রয়েছি, তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি।"

"রাঁধছিস না তুই?"

"রাঁধতাম হুজুর; কিন্তু সরঞ্জাম জোগাড় হয়ে উঠল না এত অল্প সময়ের মধ্যে। চালের গুঁড়ো চাই, 'রসম'-এর জন্যে মাদ্রাজী তেঁতুল হলেই ভালো। আয়ার সাহেবের বাড়ি থেকে পার্সেল আসত, আর চার রকম ঝাল—তা খালি শুকন লঙ্কা আর গোলমরিচ পাওয়া গেল···জিনিসটা নষ্ট করে লাভ নেই, জোগাড়-যন্ত্র করে পরে একদিন খাওয়াব হুজুরকে·· নিশ্চয় খাওয়াব হুজুর, মেমসাহেব আমায় নিজের হাতে শিখিয়েছিলেন।"

পরের ফাঁড়া পরে কাটানো যাবে, এখন বিপদ কেটে গিয়ে মনটা এত হাল্কা হয়ে গেছে যে, ইচ্ছে হোল দুজনে মিলে ওর গল্পটা শুনি। বললামও গোপালসুন্দরবাবুকে—"বেশ গল্প জানে সব। যদি শোনেন তো···"

অক্ষয়বাবু এলেন। ডাকবাংলোতেই ওঁর কোন এক বন্ধুর সঙ্গে হয়েছে দেখা, তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এতক্ষণ; বললেন—"এর পরে আর সময় পাওয়া

যাবে না, চলুন না, সুপৌল শহরটা দেখে আসবেন ; বলছিলেন না ঘুরে আসবেন একবার ?"

আমি যে মতলব ঠাউরে বাসা থেকে বেরিয়েছি, সেটা যদি কাজে পরিণত করতে হয় তো সময় আমার আরও কম, দিয়ে আসি না একটা চক্কর জীপে করে, শহর তো সুপৌল, কতক্ষণই বা লাগবে জীপে ?

তিনজনেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

মনটা রান্নাঘরের দিকে, হেলাফেলা করেই পড়েছি বেরিয়ে, অ্যামেরিকান টুরিস্টের মতন একবার চোখ বুলিয়ে আসি শহরটার ওপর দিয়ে। বাইরে বেরুতেই কিন্তু মনে হোল সুপৌল যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল, চোখাচোখি হতেই প্রশ্ন করলে—দেখ তো চেন কি আমায় ?

সত্যিই চোখে যেন কোথা থেকে হঠাৎ একটা মোহ, একটা বিস্ময়—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মায়া-কুহেলী এসে গেছে, বড় অপরূপ দেখাচ্ছে সুপৌলকে।

এ জিনিসটা তুমি কি লক্ষ্য করেছ কখনও ? অনেক আগে দেখা কোন একটা জায়গায় যদি কখনও যাও তো দেখোতো মিলিয়ে। পুরনো চেনা জায়গার সঙ্গে আমাদের একটা মমত্ববোধ লেগে থাকে, যত চেনা, যত পুরনো, সেটা ততই নিবিড়। নতুন জায়গায় গিয়ে আমাদের যে মনের ভাবটা সেটা মাত্র বিস্ময়ের, নতুন দেখার যে চরিতার্থতা, মাত্র তাই। পরিচিত জায়গায় বহুদিন পরে গেলে ঐ দুটো যায় মনের মধ্যে মিশে, সে এক অদ্ভুত রোমান্স : মিলিয়ে দেখো।

সুপৌল নতুন নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে দেখেছিলাম, আর আজ এই প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে দেখছি। সেটা ছিল স্কুলের যুগ আমার জীবনে, সুপৌলে আসতাম স্কুলের হয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতে, বোধ হয় স্কুল ছাড়ার পর ক্লাবের হয়েও দু'একবার এসে থাকব। তখন ছিল ফ্রেণ্ডলি ম্যাচের যুগ, কম্‌পিটিশন্ একরকম আরম্ভই হয়নি, জিতলেও প্রীতি, হারলেও প্রীতি, সেই প্রীতির দৃষ্টি নিয়েই শহরটার সঙ্গে তখন মাখামাখি হয়েছে। ঘুরেছি, ফিরেছি, দেখেছি, নূতনত্বের স্বপ্ন দিয়ে ভালোবেসে গেছি—তখন তো অল্প দেখার

ব্যাপারটা আমি বুঝলাম, ওর পেটে সেই গল্পটা গজগজ করছে, ফাঁক নেই দেখে বেরিয়ে গেল। আহা, বেচারি! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝি তো ওর যন্ত্রণাটা। তবু তো কত সুবিধে আমাদের, কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, লিখে ফেলে মনটা তো খালাস করতে পারি। ডেকে শুনতেই হবে একসময় ওর গল্পটা। অবশ্য একটা সর্ত রাখলাম মনে মনে—ও যদি এইরকম ক্ষিদের মুখে আমায় আয়ার-গৃহিণীর কাছে শেখা চালের পিঠে, কি লঙ্কা-তেঁতুলের 'রসম্' খাওয়াবার অভিসন্ধি রাখে তো ওর সম্বন্ধে আর আমার কোনও দায়িত্বই থাকবে না। তাহলে কিন্তু ওকে একটু ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়াও দরকার, নৈলে অবিচার করা হয়।

নেমে গিয়ে দরজার কাছ থেকে ডাক দিতে লছমী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রশ্ন করলাম—"আর কত দেরি রান্নার?"

"আর অল্প একটু দেরি আছে হুজুর, আমি মোতায়েন রয়েছি, তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি।"

"রাঁধছিস না তুই?"

"রাঁধতাম হুজুর; কিন্তু সরঞ্জাম জোগাড় হয়ে উঠল না এত অল্প সময়ের মধ্যে। চালের গুঁড়ো চাই; 'রসম'-এর জন্যে মাদ্রাজী তেঁতুল হলেই ভালো। আয়ার সাহেবের বাড়ি থেকে পার্সেল আসত, আর চার রকম ঝাল—তা খালি শুকন লঙ্কা আর গোলমরিচ পাওয়া গেল···জিনিসটা নষ্ট করে লাভ নেই, জোগাড়-যন্ত্র করে পরে একদিন খাওয়াব হুজুরকে···নিশ্চয় খাওয়াব হুজুর, মেমসাহেব আমায় নিজের হাতে শিখিয়েছিলেন।"

পরের ফাঁড়া পরে কাটানো যাবে, এখন বিপদ কেটে গিয়ে মনটা এত হাল্কা হয়ে গেছে যে, ইচ্ছে হোল দুজনে মিলে ওর গল্পটা শুনি। বললামও গোপালসুন্দরবাবুকে—"বেশ গল্প জানে সব। যদি শোনেন তো···"

অক্ষয়বাবু এলেন। ডাকবাংলোতেই ওঁর কোন এক বন্ধুর সঙ্গে হয়েছে দেখা, তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এতক্ষণ; বললেন—"এর পরে আর সময় পাওয়া

যাবে না, চলুন না, সুপৌল শহরটা দেখে আসবেন ; বলছিলেন না ঘুরে আসবেন একবার ?"

আমি যে মতলব ঠাউরে বাসা থেকে বেরিয়েছি, সেটা যদি কাজে পরিণত করতে হয় তো সময় আমার আরও কম, দিয়ে আসি না একটা চক্কর জীপে করে, শহর তো সুপৌল, কতক্ষণই বা লাগবে জীপে ?

তিনজনেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

মনটা রান্নাঘরের দিকে, হেলাফেলা করেই পড়েছি বেরিয়ে, অ্যামেরিকান টুরিস্টের মতন একবার চোখ বুলিয়ে আসি শহরটার ওপর দিয়ে। বাইরে বেরুতেই কিন্তু মনে হোল সুপৌল যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল, চোখাচোখি হতেই প্রশ্ন করলে—দেখ তো চেন কি আমায় ?

সত্যিই চোখে যেন কোথা থেকে হঠাৎ একটা মোহ, একটা বিস্ময়—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মায়া-কুহেলী এসে গেছে, বড় অপরূপ দেখাচ্ছে সুপৌলকে।

এ জিনিসটা তুমি কি লক্ষ্য করেছ কখনও ? অনেক আগে দেখা কোন একটা জায়গায় যদি কখনও যাও তো দেখোতো মিলিয়ে। পুরনো চেনা জায়গার সঙ্গে আমাদের একটা মমত্ববোধ লেগে থাকে, যত চেনা, যত পুরনো, সেটা ততই নিবিড়। নতুন জায়গায় গিয়ে আমাদের যে মনের ভাবটা সেটা মাত্র বিস্ময়ের, নতুন দেখার যে চরিতার্থতা, মাত্র তাই। পরিচিত জায়গায় বহুদিন পরে গেলে ঐ দুটো যায় মনের মধ্যে মিশে, সে এক অদ্ভুত রোমান্স, মিলিয়ে দেখো।

সুপৌল নতুন নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে দেখেছিলাম, আর আজ এই প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে দেখছি। সেটা ছিল স্কুলের যুগ আমার জীবনে, সুপৌলে আসতাম স্কুলের হয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতে ; বোধ হয় স্কুল ছাড়ার পর ক্লাবের হয়েও দু'একবার এসে থাকব। তখন ছিল ফ্রেণ্ডলি ম্যাচের যুগ, কম্‌পিটিশন্‌ একরকম আরম্ভই হয়নি, জিতলেও প্রীতি, হারলেও প্রীতি, সেই প্রীতির দৃষ্টি নিয়েই শহরটার সঙ্গে তখন মাখামাখি হয়েছে। ঘুরেছি, ফিরেছি, দেখেছি, নূতনত্বের স্বপ্ন দিয়ে ভালোবেসে গেছি—তখন তো অল্প দেখার

বয়েস, তাই যেটুকুই-না দেখতাম সেইটুকুই হর্ষে-বিস্ময়ে যেন টলমল করে উঠত।

প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান, এমনই অনেক পরিবর্তন হবার কথা, তার ওপর কুশীর অনুগ্রহ আছে, তবুও পুরাতনের যা কিছু আছে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সেই দিনগুলিকে সামনে এনে হাজির করছে।... বাঁধের ওধারে স্কুলবাড়িটা থেকেই হোল শুরু। বাড়িটা মোটামুটি সেইরকমই আছে; ওখানেই এসে উঠেছিলাম আমরা। মনে আছে বেশ আদর-যত্ন করেছিল, এও মনে আছে যে সে আদর-যত্নটাকে অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছিলাম—মাংস, ভাত, দই, মিষ্টান্নে কাবু করে দিয়ে বাজিমাৎ করবার কু-মতলব নয় তো! সন্দেহের বশে কেউ যে কম করে খেয়েছিলাম এমন মনে পড়ে না। আসলে হুজুগের বয়স সেটা, যদি একটা কথা কেউ তুলে দিলে তো তাই নিয়েই চলল হুজুগ, তারপর খাবার সময়ে চলল ওজনের বেশি খেয়ে ফেল্ করাবার হুজুগ। বেশ বয়সটা; এখন কথায় কথায় ঐ বয়সটার ওপর করি মুরুব্বিয়ানা, মাথা দুলিয়ে, কপাল কুঁচকে, কিন্তু সত্যিই এক একবার মনে হয়—ফিরে পাওয়া যায় না একটু?...আমাদের জীপ ঘুরে ফিরে এগিয়ে চলল—আদালত, বাজার, আরও এদিক ওদিক, এক একটা জায়গা হঠাৎ যেন একটু বেশি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একপাল ছেলে—আমিও আছি তার মধ্যে, আর আছে অনিল, পালিত, শ্যামা চৌধুরী; দপ্তী, ইউসুফ, আরও সব; শহর দেখে বেড়াচ্ছি; আমাদেরও দেখুক সব; শহর থেকে এসেছি, তায় রাজস্কুলের ছেলে, তায় হয়তো জিতেও থাকব আজকের খেলায়।......এই আমরাই আবার যখন মজঃফরপুরের মতন বড় জায়গায় যেতাম, যেন থৈ পেতাম না। রাজশেখরবাবুর (পরশুরামের) 'কজ্জলী' বইখানার সেই Law of Relativity ......স্টেশনের কাছে আসতে দৃশ্যটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল...সদলবলে গাড়ি থেকে নামতেই গেম্ টীচার ফল্-ইন্ করালেন, অর্থাৎ সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে যেতে হবে শহরের ভেতর দিয়ে। একেবারে আগে তিনি, তাঁর পেছনে ক্যাপটেন্ বলটা বুকের কাছে ধরে, সব পেছনে

লাইনস্‌ম্যান, হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে—অর্থাৎ যতদূর বিসদৃশ একটা দৃশ্য সৃষ্টি করা যায় শহরের বুকের ওপর। পথ চলতে চলতে কৌতূহলী ছেলের পাল জুটে দল পুরু করছে, কুকুরের দল পেছু দিয়ে ডাক ছেড়েছে, গেম্‌ টীচার মাঝে মাঝে ঘুরে দেখে করছেন—'লেফট্‌, রাইট ; লেফ্‌ট্‌, রাইট……'

ফিরতেও এই ; অবশ্য জিতলে বা ড্র হ'লে।

মঝঃফরপুরে গেলে এসব কিছুই করতেন না ; টিকিটগুলো গেটে দাখিল করে কোন্‌ দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতেন গা ঢাকা দিয়ে। আমরাও একরকম ছত্রভঙ্গ হয়ে অচেনার মতন সাধ্যমতো তফাতে তফাতে থেকে গন্তব্যস্থানে জড়ো হতাম গিয়ে। তার কারণ মঝঃফরপুর তখনও আমাদের করুণার চক্ষে দেখে, গাড়ি থেকে নামলেই আরম্ভ করে দেয় "চুড়া দহি !" অর্থাৎ "চিঁড়ে দই !"—নেমেছে। অবশ্য ওটা মাত্র মৈথিলদেরই প্রিয় খাদ্য, তবে ওখানে তো সে-নজরে দেখছে না, খাস মিথিলা থেকে দল গেছে—মৈথিল, বাঙালী, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কায়েৎ—কোনও বাছবিচার নেই তাদের কাছে। খেলতে নামলে ঐ বলে অভ্যর্থনা করত, জিততে থাকলে ঐ বলে টিটকারি।……
এরপরও আবার নাকি 'ফল-ইন'—'লেফট্‌-রাইট্‌ !'·· বলে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি !

স্টেশনের কাছে স্মৃতিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মনটা বড় স্তিমিত হয়ে গেল। সেটা আরম্ভ হ'ল একটা ব্যাপার থেকে, কিন্তু শেষ হোল অন্য একটা ব্যাপারে গিয়ে। ··দৃষ্টিটা গিয়ে পড়েছে স্টেশনের উত্তরদিকে—ঐটে দ্বারভাঙ্গা যাবার লাইন। ঐ লাইন হয়ে আমরা আসতাম, এখন ডিস্ট্যাণ্ট্‌ সিগন্যাল্‌ পর্যন্ত গিয়ে আর লাইনটা নেই, কুশীর উদরে গেছে, এখন পড়ে আছে শুধু রাশীকৃত বালি আর মাঝে মাঝে ভাঙা রেলবাঁধের খানিকটা খানিকটা।

স্টেশনে জায়গাটাই আমার বড় ভালো লাগে, ওগুলো হচ্ছে জীবনে জীবনে নাড়ির যোগ, একটা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় আমি যেন আর একলা নয়, বাইরের স্পন্দন অনুভব-করছি।· ····নামতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ উত্তরের দিকে দৃষ্টিটা গিয়ে পড়তে মনে হ'ল সব যোগসূত্র যেন

ছিন্ন হয়ে গেছে—রোদ আর বালির বর্ণহীন, সীমাহীন শূন্যতায় শুধু যেন একটা হাহাকার আছে পড়ে। এই থেকেই কি করে মনে পড়ে গেল সেই যুগের রীডারেই পড়া Graves of a Household কবিতাটা।...হয়তো এইটেই আমার অন্তঃচেতনায় আগে মনে পড়ে গিয়ে স্টেশনের উত্তরের দৃশ্যটাকে আরও ঐরকম উদাস করে তুলে থাকবে, ফুটবলের সেই দলটি যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্মৃতির পটে।...অনিল নেই, পালিত নেই, শ্যামা চৌধুরীও সেদিন হঠাৎ গেল চলে...আরও সব কে কোথায় আছে কি গেছে কে জানে? নতুন যৌবনের পাতা গেরস্থালি—গেরস্থালিই বৈকি, না হয় স্কুলে আর খেলার মাঠে রচা, তা Graves of Household-এর মতনই কার দেহভস্ম যে কোথায় পড়ল ছড়িয়ে। অনিল আর পালিত—জীবনটাকে বড় হাল্‌কাভাবে দেখত, পড়াশোনায় মন ছিল না, শুধু ওদের চারিদিকে একটা হাসির আলো নিয়ে ফিরত, ক্লাসে প্রচ্ছন্নই থাকতো সেটা, কিন্তু প্রচ্ছন্ন থেকেও ক্লাসের গাম্ভীর্যটা তরল করে দয়ে অনেকটা সহনীয় করে রাখত..... ওরা দুজনেই আগে যায়, Household-এর দুটো আসন শূন্য করে।

অক্ষয়বাবু বলছেন—"রোদটা বড্ড কড়া, আপনি যেন একটু বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ, ফিরবেন?"

একটু যেন অপ্রতিভ হয়েই প্রশ্ন করলাম—"আর কিছু দেখবার মতন নেই?"

গোপালসুন্দরবাবু হেসে প্রতিপ্রশ্ন করলেন—"যা দেখলেন তার মধ্যেও কি কিছু দেখবার মতন ছিল?"

অক্ষয়বাবু স্টীয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন—"এর মধ্যেই নিন্দে শুরু ক'রে দিলেন কুশী-এরিয়ার? খুব আপনি! কতদিন হল?"

"মাস ছয়েক; আপনার?"

"বছর সাতেক,—সুপৌল আর সাহারসা মিলিয়ে।"

"তবুও এতটুকু নিন্দে বরদাস্ত করতে পারেন না, কুশী-এরিয়ার? ধন্য আপনি! আর কতদিনের সাধ?"

তিনজনেই হেসে উঠলাম। অক্ষয়বাবু হাসতে হাসতে দুঃখের উত্তরটা আমায় সাক্ষী মেনেই দিলেন—"এ রোলিং স্টোন্ গ্যাদার্স নো মস্ ( A rolling stone gathers no moss ) ; দরকার কি মেলা ঘোরাঘুরি ক'রে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করার, কি বলেন ?"

বললাম—"হ্যাঁ, বিশেষ করে ভাগ্যের জোরে যখন মস্ গজাবার এমন চমৎকার স্যাঁৎসেতে জায়গাটুকু পাওয়া গেছে।"

হাসিটা আরও জোর হয়ে উঠল।

আমার মনটা ভেতরে ভেতরে কিন্তু অন্যদিকে, সেই যে একটা মতলব ক'রে এসেছি, তাতে কি একটা নতুন বাধা এসে জুটল ? ক্লান্ত দেখালে তো চলবে না। সেই কথাই জিগ্যেস করলাম অক্ষয়বাবুকে, "আচ্ছা, সত্যিই কি আমাকে ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে—তখন যে বললেন ?"

অক্ষয়বাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু লক্ষ্য করতে লাগলেন, আমি বললাম—"অত পরীক্ষা না করেই বলুন না, আমি মনে হবার ভয়ে সামলে নেবার চেষ্টা করছি না।"

আবার হাসি উঠল একটু। বললেন—"তখন আপনাকে ঠিক ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না, হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা শুকন দেখাচ্ছিল।...তাই লক্ষ্য করছিলাম, এখন তো ঠিকই মনে হচ্ছে।"

এ-সুযোগটা আর হাতছাড়া করলাম না। হাসিচ্ছলেই বললাম—"এ সার্টিফিকেটটুকু আপনি আমায় আপনার অফিসারের সামনে একটু হলপ করে দিতে পারেন ? বড় উপকার হয় তাহলে।"

মুখের দিকে দুজনেই একটু কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইলেন। সব কথা বললাম খুলে।

গণপৎগঞ্জে যেতে হবে। স্টেটের ম্যানেজার সত্যেন হচ্ছে পুরনো বন্ধু, দেখা করবার এই সুযোগ, যদি পিছলে যায় তো আর বোধ হয় জীবনে দেখা হবে না।

তোমায় আরও একটু বলা দরকার, নইলে ঠিক বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা।

সত্যেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন হয় বোধ হয় সুপৌলে সেই ফুটবল খেলতে এসে। · এই সময়টা যেন আধমোছা হয়ে রয়েছে। ঠিক ধরতে পারছি না। তারপর সেটা পাকা হয় দ্বারভাঙ্গায়, ওরা দু' ভাইয়ে—সত্যেন আর গোপাল দ্বারভাঙ্গায় এসে ডেরা-ডাণ্ডা গেড়ে বসল, রাজস্কুলে পড়বে। ওরা উত্তর ভাগলপুরের লোক, জান তো—একেবারে দূর পাড়াগাঁয়ের ভেতর ওদিকে অনেক এইরকম বাঙালী আছে। যারা একেবারে বিচ্ছিন্ন তারা বাঙলা বলতে পারে না। মেয়েরা তামাক খায়, কোঁচা ক'রে শাড়িও পরে।—ঠিক আজকালকার কোঁচা নয়, যা বালিগঞ্জেও চলছে ( বরং বেশি করেই ), সে কোঁচার ওপরের পাড়টা একটা তোড়ার মতন করে একটু পাশে গোঁজা। বাঙলা বলতে পারে না, নাম জিগ্যেস করলে বেটাছেলেদের উত্তরের নমুনা হচ্ছে—"দেবেন্দর নাথ ·উর সাথে মুকুর্জিভি আছে।"· · শুনে থাকতে পার এ ধরণের গল্প, মুখে মুখে চালু আছে খানিকটা।

সত্যেনরা ঠিক সে-ধরনের নয়। যদিও উত্তর-ভাগলপুর জেলার। এখন সাহারসা খানিকটা ভেতরের দিকেই ওদের বাড়ি, তবুও বাইরের সঙ্গে ওদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ব্র্যাঞ্চ ল্যাইন হোলেও ওদের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত রেল পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সেকালের রেল লাইন ; বুঝতেই তো পার, একে বি. এন. ডব্লিউ, তার ওপর আবার ,ব্র্যাঞ্চের ব্র্যাঞ্চ তস্য ব্র্যাঞ্চ, কিন্তু তবুও রেল লাইনই তো, বাঁচিয়ে রেখেছিল সত্যেনদের। ওরা দু' ভাইয়ে যখন দ্বারভাঙ্গায় এল তখন সবই ঠিক আছে, শুধু দুজনের ভ্রূর মাঝখানে দুটি উল্‌কির টিপ। তা অত ধরলে চলে না, দেশেও তো দেখেছি ছোট ছোট ছেলেদের নাক বিঁধিয়ে ছোট ছোট নথের মতন পরিয়ে রেখেছে। এর গোড়ার কথা মায়ের সাধ, আর সে-সাধ এমনি সর্বনেশে যে, মাকে মনেই করতে দেয় না, যে, ছেলে আমার বড় হবে আর তাকে ঐ কপালের উল্‌কি কিম্বা নাকের ছেঁদা নিয়েই ঘোরাফেরা করতে হবে পাঁচজনের মধ্যে।

বেশ বড় গেরস্তর ছেলে, শহরে পড়তে এসে আলাদা বাসা ভাড়া করে আছে (রাজস্কুলে তখন বোর্ডিং-হাউস ছিল না), দিব্যি একটা জমাট আড্ডার

গোড়াপত্তন হলো। খুব ভাব জমে উঠল। আমাদের ঐ সময়ের স্কুল জীবনে সত্যেনের বাসা একটা খুব বড় অধ্যায়।

সেই প্রায় চল্লিশ বছর থেকে আরও কিছু বাদ দিতে হয়—বোধ হয় বছর পাঁচ-ছয় সত্যেনরা ছিল দ্বারভাঙ্গায়—এই প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার সত্যেনের সঙ্গে হয়েছে দেখা। সেও প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ আগে, তার কারণ এই কুশী সর্বনাশী—এমনভাবে জায়গাটাকে তছনছ ক'রে বাইরের জগৎ থেকে, বিশেষ করে আমাদের এদিক থেকে আলাদা করে দিয়েছে যে বহুদিন খোঁজখবর নেওয়ার পাটও একরকম গিয়েছিল চুকে।

মণি সাহারসা আসায় আবার আমাদের পরস্পরের খোঁজ আরম্ভ হয়েছে। ওদের বললামও—সত্যেন তাগাদা দিয়ে অস্থির করে তুলেছে—এই জীবনের শেষ সুযোগ, এটা হারালে আর হবে না দেখা।

গোপালসুন্দরবাবু হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, শুনতে শুনতেই; যেন কি একটা দ্বিধায় পড়ে গেছেন। প্রশ্ন করতে একটু হেসে বললেন—"সুযোগটা আরও বেশি বলে বলতে ভয় পাচ্ছি, আসল কথা সত্যিই কি আপনার বড্ড বেশি স্ট্রেন্ হবে না? এই প্রায় মাইল ত্রিশ কাটিয়ে এলেন —জীপ, তার ওপর এই রাস্তা; গণপৎগঞ্জ আরও মাইল কুড়ি-বাইশ, আর পথ যা তার তুলনায়…"

অক্ষয়বাবু একটু হেসেই অসহিষ্ণুভাবে বললেন—"আঃ! আপনি কি বেশি সুযোগের কথা বলছিলেন সেইটিই বলুন না আগে মশাই।"

গোপালসুন্দরবাবু বললেন—"আমার একটা দরকারী অফিশ্যাল কাজ ছিল ওদিকে, একটু বেশি দরকারী, এ. ডি. এম্ না এসে পড়লে আজই বেরুব ভেবেছিলাম।"

"তা চলুন না, গমের স্টকিস্ট্ টাকা পয়সা নিয়ে কি গোলমাল লাগাচ্ছে, চিঠিপত্রে বাগ মানছে না, এই তালে একবার ঘুরে আসি তাহলে। এ. ডি. এম্ তো খাওয়াদাওয়ার পরই ফিরে যাবেন বলছিলেন—জীপটা চেপে নেওয়া যাক্, উনি ছুটোর গাড়িতে চলে যান।"

আমার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"আপনি সত্যিই মনে করছেন পারবেন স্ট্যাণ্ড্ করতে? তাহ'লে···"

বললাম—"কিন্তু আমার মনে করার ওপর তো নির্ভর করছে না যাওয়াটা—আমি এখন কুড়ি ছেড়ে চল্লিশ মাইলের পাড়ি দিতে পারি—ঐ জীপেই। বিপদ হয়েছে—বাড়িতে একটা রব উঠেছে আমার নাকি বয়েস হয়েছে—অর্থাৎ আমি এখন বৈতরণীর তীরে, তাই যাতে পিছলে না নদীতে পড়ে যাই সেইজন্যে সবাই আগ্‌লে রেখেছে ··এর ওপর আপনারা আবার যদি বলেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তা'হলে মণি কি ছেড়ে দিতে চাইবে?"

অক্ষয়বাবু হেসে উত্তর করলেন—"বললাম তো তা নয়, অন্যমনস্ক হয়ে যেন শুকন দেখাচ্ছিল।"

"ওটুকুর জন্যেও তো আপনিই দায়ী, একটা অক্লান্ত লোককে ক্লান্ত বললে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাবেই না একটু শুকিয়ে?"

"তাহলে?·· সত্যিই তো খানিকটা কাবু করেছে—আমাদের পর্যন্ত।—আমার বয়েস তিরিশ, এ ডি এম-এর বোধ হয় চল্লিশও পেরোয় নি· "

"ঐ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে আপনাদের এ. ডি এমকে—আমি যখন থাকব না—মশাই, আপনার মেজদার বয়েস তাহলে কি তিরিশও পেরোয় নি!· ··· এতখানি এসেও উনি যেমন শক্ত রয়েছেন!··· "

এর হাসিটা মুখে করেই আমরা সবাই নামলাম জীপ থেকে। মণি বারান্দায় ছিল দাঁড়িয়ে, জিগ্যেস করলে—"এত রোদে ঘোরাঘ্‌রির মধ্যেও তোমাদের হাসি!—ব্যাপারখানা কি? আমায় তো কাবু করে দিয়েছে।"

সবচেয়ে এই বড় সুযোগটি আর হাতছাড়া করলাম না, বললাম—"সেই কথাই হচ্ছিল, অক্ষয়বাবু বলেছিলেন—'মশাই আশ্চর্য করলেন, অদ্ভুত আপনার স্ট্যামিনা! তবে কি মণিবাবুর চেয়ে আপনি বয়েসে ছোট?—ওঁরই প্রায় চল্লিশ হোল।'······আমি বললাম—বাবা পেটে, মা হাঁটে আমি তখন বছর আটে—শোনেন নি কথাটা? সে-হিসেবে মেজদা অন্তত বছর দশেকের ছোট হবে না?—আপনি যে অবাক করলেন মশাই!"

এর হাসিটা মিলুতে না মিলুতে বললাম—"ওরে, এঁরা দুজনে গণপৎগঞ্জে এনকোয়ারিতে যাচ্ছেন—বলছিলেন এমন মরুযাত্রায় এইরকম একজন শক্ত লোক পাশে থাকলে ভরসা হয়···তাহ'লে সত্যেনের সঙ্গে দেখাটা সেরেই আসি না হয়, কি বলিস্?"

খেয়ে দেয়ে তিনজনে বেরুচ্ছি, লছমী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কুণ্ঠিত স্বরে কাঁচুমাচু হয়ে জিগ্যেস করলে—"হুজুর আবার ফিরে আসছেন তো?"

বললাম—"তুই যে দেখছি আবও বেশি বয়েস হয়েছে ধরে নিলি!"

অক্ষয় আর গোপালবাবু একটু খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠায় ও যখন আরও কাঁচুমাচু হয়ে গেছে, তখন আমার মনে পড়ে গেল প্রশ্ন করার হেতুটা, ফিরে বললাম—"ও! হাঁ্যা, ফিরব বৈকি, তুই ততক্ষণ সাহারসায় গুছিয়ে বসগে যা। ·সেই বাড়িটার কথা তো?"

"আজ্ঞে, আর বাঁধের ওধারে ঐ যে নতুন চালা ঘবটা উঠেছে দেখছেন···"

"সব শুনছি এসে···"

জীপে গিয়ে বসতে অক্ষয়বাবু বললেন—"আপনার কাছে খুঁব প্রশ্রয় পায় দেখি, ভালো লাগে ওর গাঁজাখুরি সব?"

বললাম—"একটু প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার নয়? নিজের গাঁজাখুরিও তো অপরদের ঘাড়ে চাপিয়ে এলাম চিরকালটা, কী অত্যাচারটা করছি। ওর মুখ দিয়ে টের পেলে বদ অব্যেসটা কমতে পারে।"

কুশী আমার কাছে সত্যিই একটা যেন সজীব সত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ও যা আমায় দেখাচ্ছে-শোনাচ্ছে তার মধ্যে যেন একটি বেশ প্ল্যান আছে, ওব ধ্বংসের লীলা যেন সইয়ে সইয়ে দেখাচ্ছে আমায়—অন্তরীক্ষে কোথায় বসে যেন একটি একটি করে দৃশ্যপট দিচ্ছে তুলে—উগ্র আরও উগ্র, তারপর আরও উগ্র। দেখছে কতটা বরদাস্ত করতে পারি। আর, একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে।

তবুও এ-সব শুকোর ব্যাপার, তাণ্ডবের ইতিহাস মাত্র; এখনও বন্যা নামেনি, মূল তাণ্ডবটা কি তা তো এখনও দেখতে বাকিই রয়েছে।

আমরা রেল লাইনটি পেরুলাম যেখানে সেটা দ্বারভাঙ্গার দিকে একটু এগিয়েই একেবারে মুছে গেছে। তারপরেই খোলা প্রান্তর; সেটা যে কত বিপুল তা মাইলখানেক যেতে না যেতেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠিক এই ধরণের মরুভূমি কুশীও এর আগে আমাদের দেখাতে পারেনি। আমাদের বাঁ দিকে বহুদূরে একটি নীল বনানীরেখা, ডাইনে শহরের শেষ প্রান্ত; খানিকটা এগুতে ছুটোই যখন পেছনে পড়ে গেল, তখন দৃশ্যপটে বালির রাশি ছাড়া আর কিছুই নেই, একেবারেই সামনের দিক-রেখায় যে দূরে দূরে চারপাঁচটি কৃষ্ণ বিন্দু দেখা যাচ্ছে—তাল কিংবা ঐরকম উঁচু গাছের মাথা—তার একেবারে সামনের কটা বোধ হয় পনের ষোল মাইলের এদিকে নয়। পথ নেই, গরুর গাড়ি গিয়ে গিয়ে বালির বুকে যে অতিক্ষীণ একটা রেখাপাত হয়েছে—জায়গায় জায়গায় একেবারেই নিশ্চিহ্ন—তাই ধরে ধরে জীপ চলল এগিয়ে। উঁচুনিচু বালির স্তূপে আমাদেব জীপ যেন ঢেউ তুলে চলেছে, কোন বকমে এগিয়ে চলা, অপরিমিত প্রয়াসে মেশিনটা এক একবার যেন আর্তনাদ করে উঠছে।......এই করে যেতে হবে নাকি!—এই কুড়ি বাইশ মাইল! কুশী প্রলয়ংকারী, তাব সেই রূপই তো দেখতে এসেছি আমি, জেনে শুনেই. তাই শত ভীষণা হলেও এ পর্যন্ত ভয় পাইনি—বাদলাঘাট, মধেপুরা, বনগাঁও-মেহসীর মাঝখানের সেই তেপান্তর—ভয় পাইনি কোনখানেই, বরং একটা রুদ্র আনন্দ মনে ঠেলে ঠেলে উঠেছে,—এবার কিন্তু আমি যেন হারলাম—একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চয়তা, একটা আতঙ্কই বুকটাকে যেন চেপে চেপে ধরছে—কিছু না হোক, কোন রকম ছুটি পশু, ছুটি তৃণাঙ্কুর, আকাশে উড়ে যাওয়া ছুটি পাখি—একান্তই চাই যে দেখা একবার; এই রকম একেবারে কিছু না থাকা, এ যে মৃত্যুরই রূপান্তর—সে না হয় অন্ধকার, এ না হয় দীপ্ত শুভ্রতা; কিন্তু শুভ্র বলেই যে আরও স্পষ্ট, আরও ভয়ঙ্কর।

আমরা একটা নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছি। নদী—অর্থাৎ কখনও এক সময় নদী ছিল, এখন তার আকণ্ঠ বালি, শুধু নদীর বঙ্কিম রেখাটা রয়েছে পড়ে, দেখলে মনে হবে কোন্ নৃত্যশীলা অপ্সরী কোনও নষ্টতপঃ ঋষির শাপে হঠাৎ পাষাণ হয়ে গেছে।......আহা! সালঙ্কারাও!...একটা লাল রংকরা লোহার

পুল, আড়াআড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে, শুধু ওপরের অংশটা; থামগুলোর সমস্তই বালির নীচে।······জলতেষ্টা পেয়েছে, নদী দেখে যেন বেশি করেই, তাতে জল নেই দেখে যেন আরও বেশি করেই এ কোথায় এসে পড়া গেল! আরও কতদূর। হবে তো শেষ রক্ষা? একটা উঁচু জমির এদিকে—ওকি, আগুনের শিখা নাকি! খানিকটা এগুতেই বোঝা গেল, না, একটা 'খড়োর', উলু-খড়ের ক্ষেত; কিন্তু দেখার পরেও যেন মন থেকে ধারণাটা সরাতে পারছি না—তামাটে লকলকে, হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে, সূর্যকিরণে তামাটে রংটা ঝিকমিক করছে। না, উলুখড় নয়তো, আগুনই, মরুভূমিতে আগুন লেগেছে—আর কিছু নেই, তাই শুধু বালিরই খাণ্ডবদাহন—প্রচণ্ড ক্ষুধার আগুনে খাদ্যাখাদ্য ভুলেছে—চলেছে শুষ্ক বালির স্তূপ লেহন করে···

—মাথা খারাপ হয়ে যাবে না তো! শুনেছি হয়ে যায় এরকম—রাজপুতানায়, আরবে, সাহারায়···মনটাকে টেনে মোড় ফিরিয়ে না নিলে নিষ্কৃতি নেই।

ওষুধের কথা মনে পড়ল। মনটাকে স্নিগ্ধ করে আনতে হবে। By contrast, অর্থাৎ এমন একটা কিছু দিয়ে যা একান্ত এর বিরুদ্ধধর্মী। তার একটু একটু অভ্যাস আছে আমার। শিখিয়েছিল অনিল, সেই একেবারে ছেলেবেলায়, বাঙলা স্কুলের যুগে। হাসা রোগ ছিল বড্ড বেশি, আর হাসলেই তো সেকেণ্ড মাস্টারমশাইয়ের বেত। অনিল হতভাগা নিজে নির্বিকার থেকে হাসাতও বেশি, তারপর ব্যবস্থাও বাৎলে দিয়েছিল—"যত বেশি হাসি পাবে, তত ভেতরে ভেতরে কাঁদবার চেষ্টা করবি; তুই সব চেয়ে কাকে ভালোবাসিস্?"

বলি—'ঠাকুরমাকে।' তখন তিনিই কাছে, মনে পড়ে গেলেন। "মনে মনে ভাববি—তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করাচ্ছে, তুই কান্নায় আছড়ে পড়েছিস্, কোন মতেই ছাড়বি না। আমায় কখনও হাসতে দেখেছিস্—যখন চাই না?"

বলি—"না তো, কি করিস?"

"সবচেয়ে ছোট বোনটাকে ভালোবাসি তো? মনে করতে থাকি, তাকে হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিচ্ছে ··বাবা নিজে। আর হাসি পারে ত্রিসীমানার মধ্যে ঘেঁষতে?"

অত সহজ নয় বাস্তবের গায়ে কল্পনা ফোটানো, তবু করতে হবে চেষ্টা, অসহ্য হয়ে উঠেছে—

তা হলে সবচেয়ে স্নিগ্ধ কি দেখেছি জীবনে? কোথায় দেখেছি?

একটা মনে পড়ে গেল, আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি, আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—মনের কোথায়, আর এই মরুভূমির গায়েও যেন কোথায়—যেমন করে শুনেছি, মরু-মরীচিকা ওঠে জেগে—কোথাও নয়, অথচ যেন এক জায়গায়।

—শিবপুর। সাঁতরাগাছি, রেল লাইনটা এক জায়গায় পেরিয়ে গিয়েছিলাম, এমনি অনির্দিষ্ট বেড়াবার ঝোঁক, আবার পেরিয়ে ফিরছি। বিকেলের শেষ দিকটা, ভিজে মেঠো পথে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের তলায় এসে পড়লাম। রাস্তার দুটো ফিকড়ি বেরিয়ে একটা একটু বেশি সরু হয়ে বাঁদিকে কতকগুলো আগাছার মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটু দূরে আবার একটা উঁচু জায়গায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাস্তাটা, পাড়ার পথ, গুটিকতক বাড়ি, গরীব নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থের, পর্দার বালাই নেই; বাড়িগুলোকে গেঁথে গেঁথে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে চলে—একটার খিড়কির পাশ দিয়ে, একটার উঠোনের মাঝখান দিয়ে। উঠোনে দড়ির আলনায় একটা ডুরে শাড়ি মেলা, চারিদিকের সবুজের গায়ে তার রাঙা চেকটার খোলতাই যা হয়েছে!

জীপ চলেছে বালি উড়িয়ে। তা উড়ুক বালি; অনিল থাক বেঁচে, মরুর গায়ে আমার ওয়েসিস্‌কে স্পষ্ট করে আনছি—চোখ ফেরাতে পারছি না।

রাস্তার ডান দিকের যে ফিকড়িটা সেটা আরও চওড়া। অশ্বত্থ গাছ থেকে খানিকটা দূরে পথের ধারেই একটা ডোবা। পুকুরের চেয়ে ডোবাই ভালো—ছোট বলে যেন আরও আত্মীয়—একবার হাত বাড়ালে যেন

অনেকখানি বুকে জড়িয়ে ধরা যায় ; আর স্বচ্ছ জলের চেয়ে এই রকম যে ক্ষুদে পানায় ঢাকা, এই যেন আরও ভালো, আরও সবুজ যে।...একটি বউ আধ ঘোমটা দিয়ে নারকেল-গুঁড়ির রাণায় বসে বাসন মাজছে। একটি কুকুর জোড়া থাবার ওপর মুখটা চেপে ঘাটের মাথায় রয়েছে বসে, চুপ করে ; বাড়ির বৌয়ের সান্ত্রী, থালার গোছা নিয়ে উঠলে পেছনে পেছনে ফিরে যাবে...নাও গো, তোমাদের বৌ, যেমনটি নিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে এনেছি ; একটু কিছু পাব নাকি—ভরসন্ধ্যের বৌনি ?

এদিকটায় ওরা গরীব, ডান দিকের এরা ততটা নয়, ইটের বাড়ি খানকতক, একটা দোতলাও, রাস্তাটাতেও এক সময় ইটের খোয়া পড়েছিল, এখনও একটু লালচে ভাব আছে। বৌটির গায়েও আছে দুটো সোনা-দানা ·

যত পারে গর্জাক্ গিয়ে জীপ। আমার অশ্বত্থশাখার পাখিরা আসছে ফিরে, তাদের কাকলিতে পল্লীপথ মুখর।· ·বৈশাখের মধ্যাহ্ন-সূর্য নয়, আমার সূর্য বর্ষার ভাঙা মেঘের মাঝখান দিয়ে শান্ত মহিমায় অস্তাচলে যাচ্ছে নেমে...

মুছে যাচ্ছে কেন ছবিটা ?

ঠিক মোছেনি, রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

আমি এখন সত্যই গণপৎগঞ্জের পথে, আর যা দেখছি তা সত্যিই মরুর বুকে যেন একখানি মরীচিকাই। বহুদূরে একটি নীল জলের ধারা অর্ধ-চন্দ্রাকারে সূর্যকিরণে ঝিকমিক করছে, তার গায়ে গা মিশিয়ে একটু সবুজ রেখা, কোথাও একটু শীর্ণ, ফিকে ; গাঢ় সুস্পষ্ট। আমাদের সামনের বালুকা স্তূপ গোল হয়ে গেছে কচ্ছপের পিঠের মতন আস্তে আস্তে উঠে, আর তারই শেষ প্রান্তে ওই আলিঙ্গন-বদ্ধ নীল-হরিতের রেখা দুটি সত্যিই একখানি মরীচিকার মতন দিকচক্রে লেগে রয়েছে।...এগুবার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠছে স্পষ্ট, পৃথক ; জলের ধারা পাচ্ছে বিস্তার, গৈরিক তটরেখা উঠছে জেগে, সবুজের চাপটা আলাদা হয়ে উঠছে,—কোথাও তীরের ঢালু জমির ওপর শুধুই সবুজ ফসলের আস্তরণ, কোথাও ছোটবড় রকম রকম গাছপালা

মাঝে মাঝে তাল-খেজুর উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে, এগুতে এগুতে তাদের ঝাঁকড়া মাথার দোলনাও পড়ছে চোখে।...একখানি গ্রাম, চড়াইয়ের পরে ঢালু দিয়ে নামতে নামতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ক্ষেত, বাগান, বাড়ি, রাস্তা, এমনকি লোকের চলাচলও; দিনটাও যেন সেইরকম উগ্রতা থেকে হঠাৎ নরম হয়ে এল তীরস্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে।

কুশীর এখানে আরও এক অভিনব রূপ, একদিকে স্নিগ্ধ শ্যাম তৃপ্তি, এক দিকে অনন্ত দুঃস্বপ্ন। কুশী এখানে ধরেছে তারা মূর্তি—তার এক হাতে খর্পর, এক হাতে বরাভয়। কিম্বা অর্ধনারীশ্বর হর-পার্বতী। সেই স্তবটা পড়ছে মনে—

মন্দারমালা পরিশোভনায়ৈ, কপালমালা পরিশোভনায়
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

নদী বেশ চওড়া, জলের ধারাও প্রশস্ত, কিন্তু গভীর নয়, আমরা জীপসুদ্ধ আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেলাম। দূরে কাছে মাঝে মাঝে চড়া জেগে উঠেছে, কাদা-খোঁচারা খুব ব্যস্ত; হাঁটুজলে জনতিনেক ছেলে জাল নিয়ে মাছ ধরছে। জীপের গায়ে বাধা পেয়ে নদীর স্রোতে একটা মৃদু কলতান উঠছে। যেন একটা ভাষারই কাছাকাছি; নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ কৌশিকী কি কিছু বলতে চায় তার এই ক্ষণিকের অতিথিদের?

একটা কথা বিশ্বাস করবে।...অবশ্য ঘরে বসে এই লেখনী চালনা করবার সময় সে অনুভূতিটা আমিও পাচ্ছি না, তবে অবগুণ্ঠন-মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সেই রকম মুখোমুখি হয়ে বসলে সত্যিই মনে হয় তার যেন একটা ভাষা আছেই, আর অনন্তকাল ধরে তার যেন সেই অস্ফুট কাকলিকে তোমার কাছে অর্থবান করে তোলবার সাধনা; তুমি বোঝ না তাই তার বেদনাও অনন্ত...

বড্ড করুণ লাগছে আমার, কুশীকে মনে হচ্ছে অশ্রুমতী, ওর অশ্রু ধারায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলেছি আমি,...মনে পড়ছে সেই কোন্ অতীত যুগের কথা... ঋষিকন্যা ছুটি গিয়েছিল পূজার পুষ্প চয়ন করতে, কৌশিকী আর কমলা—কৈশোর চাপল্যের বেলা গেল গড়িয়ে...বিস্মিত-তপঃ ঋষি দিলেন অভিশাপ—তোরা দুই বোনে নদী হয়ে চির-বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন ধারা হয়ে

বইবি।…ধারায় হাত বুলুতে বুলুতে আমি শুনছি ওর কাকলি, অনুভব করছি ওর বেদনা, মনে মনে বলছি—'বুঝি কন্যা, বুঝি তোমার মর্মের কথা তোমার এই ধ্বংসের নিদারুণ অভিশাপ—তোমার বিচ্ছেদের জ্বালার মধ্যে যা অনিবার্যভাবেই বর্ষে বর্ষে মূর্তি নিয়ে উঠছে· ·

গ্রামটার নাম সিংগিওয়ালা। অক্ষয়বাবু বলছেন—এ গ্রামের একটু বিশেষ পরিচয় আছে, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ ঘর বাঙালী পরিবারের বাস এখানে।

নতুন খবর নয়, ভাগলপুর জেলায় ( এখন সাহারসাতে ) আছে এ রকম অনেক। মেয়েরা কোঁচা করে শাড়ি পরে, 'হুক্কা' খায়, ওপর হাত পর্যন্ত চওড়া উল্কি পরে। পুরুষেরা পরে নাগরা, এদিকে হুক্কার ওপর খৈনি। ভাষার দিক দিয়ে পুরুষানুক্রমে বাঙলা বিকৃত হতে হতে এমন বিশুদ্ধ স্থানীয় হিন্দীতে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত লাগে এই রূপান্তর, কৌতূহল হয় এদের মধ্যে প্রবেশ করে এদের জীবনপ্রণালী দেখতে। কী ভাবে, কী করে, কী খায়, বাঙালীত্বের কতটা রয়েছে এখনও, কতটা হারিয়ে ফেলেছে। ভুল বুঝো না যেন, পলিটিক্স করছি না, এদের ফিরে আসা সম্ভব কিনা, এমন কি প্রয়োজনও কিনা—সে প্রশ্ন আমার কাছে—বিশেষ করে উপাধ্যায়-পদবী-চিহ্নিত এই কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বিভূতিভূষণের কাছে বড় নয়। আমার কোনও অতিবৃদ্ধ প্র-প্র-প্রপিতামহ মাথায় বিরাট পাগড়ি বেঁধে পৌরুষ-রুক্ষ স্বরে যমুনা-সরযূ-ঘর্ঘরার তটে বসে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন। এখন আমিই কি আমাদের বাউল-কীর্তন, বঙ্কিম-রবীন্দ্র নিয়ে, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব, চাইব দাঁড়াতে, না, মানাবে দাঁড়ালে? শশাংক যে কনৌজের সর্বনাশ সাধন করলে, তাই নিয়েও আমি বাঙালীদের জয়োল্লাসে যোগ দোব, না, কনৌজিয়াদের সঙ্গে শিরে করাঘাত হানব?

মনে পড়ছে বিনয় ঝাঁর কথা। মুর্শিদাবাদে বাড়ি, মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ছোকরা এসেছিল এদিকে ( অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গায়……মিথিলাতে!) চাকরির অন্বেষণে। বিদ্যে খুব বেশিদূর পর্যন্ত ছিল না, ট্যুইশনি করে কিছু উপার্জন করত—বাঙালীদের বাড়িতেই।…এদিকে বেশি বিদ্যে ছিল না, কিন্তু তার

বাঙলা জ্ঞান !···তখনও আমি লিখছি কিছু কিছু, কিন্তু সে যখন বাঙলা পড়াত মুগ্ধ হয়ে শুনতে হোত দাঁড়িয়ে, না হয় লজ্জিত হয়ে সরে পড়তে হোত। কথাবার্তা, চেহারা, রকমসকম—সব মিলিয়ে তাকে যেন বাঙালীর চেয়েও বেশি বাঙালী বলে মনে হোত—হয়তো আমি প্রবাসী বলেই।··· এখানে তার মন বসল না ; "দেশ ছেড়ে ভালো লাগছে না"—বলে একদিন পাত্তাড়ি গুটিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেল।

বড় ইণ্টারেস্টিং লাগে এই রূপান্তর ; যুগে যুগে হয়ে এসেছে, প্রয়োজনে আবার অপ্রয়োজনেও। ওদিককার লক্ষ্মী এদিককার ঘরের ছেলেকে ডেকে পরিবেশন করছেন, এদিককার লক্ষ্মী ওদিককার ঘরের ছেলেকে ডেকে পরিবেশন করছেন ; যদি বল একই লক্ষ্মীর তুই রূপে লীলা তো সে আরও খাঁটি কথা—মূল খুঁজে দেখলে কী-ই বা তফাৎ বাঙলায়, মিথিলায় বা কান্যকুব্জেই—অথবা বাঙলায় আর গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, অন্ধ্রে !

অল্প সামান্য প্রভেদটা যদি মেনেই নেওয়া যায়, তো এও বলতে হয়,—বাঙলা আমার চেয়ে বেশি করে বিনয় ঝার বাঙলা ; মিথিলা ওর চেয়ে বেশি করে আমার মিথিলা।

তীরে বেলো চড়াই ঠেলে আমরা গ্রামের মধ্যে এসে পড়লাম। ঢুকতেই বাঁদিকে একটা পোড়া ঘর। অগ্নিকাণ্ডটা নতুন হয়েছে বলে মনে হোল, অক্ষয়বাবু জীপটা দাঁড় করালেন। দেখতে দেখতে লোক জুটে গেল, তবে খানিকটা তফাতে তফাতে। তার কারণ এসব প্রান্তে মোটর গাড়ি একটা দুর্লভ দৃশ্য হলেও জীপ সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব আছে, সে নাকি বেশি করে কর্তাদের বাহন—ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি, দারোগা এইরকম জাঁদরেল সবদের। সুতরাং যাদের যাদের তফাতে রাখতে হবে বলে চাণক্য 'শতহস্তেন' পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাদের পর্যায়ে পড়ে। অক্ষয়বাবু ডাকতে ডান দিকের দলের মধ্যে থেকে জনকয়েক বয়স্থ গোছের এগিয়ে এল।

"এটা পুড়ল কি করে ? একটা স্কুল ছিল না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপার প্রাইমারী স্কুল…"

"পুড়ল কি করে ?"

অপর একজন একটু পেছন থেকে ঠেলে এগিয়ে এল, কতকটা যেন উৎসাহের সঙ্গে বললে—"ঘরটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল হুজুর—জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গেচুরে গিয়েছিল—চালটার দুর্দশা, একটু জল পড়লে মাস্টারদের…মাস্টারদের তবুও অতটা নয়—ছেলেদের ভিজিয়ে নাইয়ে দিত—জেলা বোর্ডকে লিখে লিখেও, হুজুর…"

"আপনি একজন মাস্টার ?"

"হ্যাঁ, হুজুর, মাস্টারই আমি।"

"কিন্তু জল পড়লে বা জেলা বোর্ড কান না দিলে তো স্কুল পুড়ে যেতে পারে না।…জিগ্যেস করছি আগুনটা লাগল কি করে।"

লোকটা একটু থতমত খেয়ে যেতেই আর একজন এগিয়ে এল, বললে—"সে এক আশ্চর্য কাণ্ড হুজুর…তাই আমাদের গ্রামের সবার সন্দেহ যে 'বঢ়ম্ আগ্'।"

'বঢ়ম্ আগ্' তোমায় একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এদিকে বেশির ভাগই ঘর উলুখড়ের, জানই তো ওগুলো বিচালির চেয়ে ঢের বেশি দাহ্য, গোলপাতার চেয়ে তো বটেই। খোঁজ করে দেখা গেছে, এদেশে আগুন যে লাগে, তার একটা খুব বড় কারণ মেয়েদের তামাক খাওয়া, তবু কিন্তু আর একটা সম্ভাবনা আছেই যে, যদি ক্রমাগত ক'দিন ধরে টানা পশ্চিমা হাওয়া চলে তো একেবারে শুকন খড়-বাঁশ-বাতায় ঘষাঘষি হয়েও অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, এই হল 'বঢ়ম্ আগ্' অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নি। তবে এ যতটা হোক না হোক, ব্রহ্মাকে খাড়া করে অনেক রহস্যময় অগ্নিকাণ্ডের কিনারা করার চেষ্টা হয়। এটাও সেইরকম।

ব্যাপারখানা বুঝতেই পারা যাচ্ছে, এমনি ঘর ঠিক করে দেবে না জেলা বোর্ড, দে আগুন ধরিয়ে শেষ করে। সামলাতে 'বঢ়ম্ বাবা' তো আছেনই।

"কখন লাগল আগুনটা ?"

"কাল রাত্রে যখন প্রায় দশটা। আমরা সবাই রাস্তার ঐ বাড়িটায় ভজন করছি···গান জমে উঠেছে—এমন সময়···"

ইঙ্গিত পেয়ে শফার রামদয়াল মোটরে স্টার্ট দিয়েছে, অক্ষয়বাবু বেশ একটু ভারিক্কে হয়েই বললেন—"গানটা কি রাগে ছিল, দীপক ?···ওসব চলবে না, আগুন লাগান হয়েছে ;···বড়ম ঠাকুরটিকে বের করতে হবে, নইলে···"

শেষের দিকটা সবাই ভয়ভাঙা হয়ে মোটরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ছ-সাতটি ছেলে—নয়, দশ, বারো, তেরো এইরকম বয়স, গুটিকয়েককে একটু যেন কিরকম মনে হোল, এমনি কোন প্রভেদ নেই, তবু যেন ওরই মধ্যে একটু আলাদা। হয়তো তারা যেভাবে চেয়ে ছিল আমাদের দিকে তার জন্যেই এই রকমটা হোল মনে, রামদয়ালকে বললাম—থামাতে মোটরটা।

বাঙলাতেই জিগ্যেস করলাম —"শোন তো, তোমাদের কেউ কি বাঙালী ?"

আন্দাজ ভুল হয়নি, ঐগুলিই যেন একটু বেশি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, একটি সলজ্জভাবে মাথা দোলালে।

"নাম কি তোমার ?"

"গোবিন্দ নয়েক"···তারপর সুদরে নিয়ে বললে—'নায়ক।"

"বাঙলা বলতে পার ?"

সেইরকম লজ্জিতভাবে মাথা নাড়লে—না, পারে না। একজন একটু সাহস করলে, একটু সামনে এসে লজ্জিতভাবেই হেসে বললে—"আমার বাঙলা দেশমে বাড়ি ·"

—তাও যে ঠিক করে বলতে পারলে এমন নয়, কেমন যেন জড়িয়ে ফেললে।

জিগ্যেস করলাম—"বাঙলা দেশমে—কোথায়, জায়গাটার নাম কি ?"

আরও লজ্জিতভাবে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে পাশের ছেলেটির ঘাড়ে গুঁজে দিলে। জানেই না, কিংবা হয়তো বাঙলার পুঁজিই শেষ হয়ে গেছে, আর সাহস করলে না। রামদয়ালকে এগুতে বললাম।

ভালোই আছে সব, বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গোপালসুন্দরবাবু বললেন—শরৎ পাল সিংগিওয়ালের একজন খুব সম্পন্ন গৃহস্থ, প্রায় ত্রু-আড়াইশ' বিঘা

জমির মালিক, এ-তল্লাটে বিশেষ প্রতিপত্তি। আরও সব ছোট বড়, মাঝারি গৃহস্থ, মোটা ভাত, মোটা কাপড়টার অভাব বড় একটা নেই কারুর।...ভাত কাপড় আর স্বাস্থ্য—সাধারণ মানুষের উচ্চাশার এই তো সীমা! ভালোই আছে।

মোটর আবার ছুটল আমাদের। কি মনে হতে একবার গলা বাড়িয়ে পরে দেখলাম। জীপ যে ধূলির মেঘ উড়িয়েছে, তাতে রাস্তার কাছাকাছি কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তারপর নজর পড়ল সেই মেঘের মধ্যে থেকে একটি ছেলে ছিটকে বেরুল—গ্রামের দিকে ছুটছে, তারপর আরও দুটি, বাঙালী দেখার গল্প করতে ছুটল বাড়িতে—"মাইগে, বাঙালিয়া সবকে দেখলি!—তিন গোটে ছলেই গে! পুছল্‌কেই—'বঙলা বোলিতে পারো?' হম্‌ কহ্‌লিয়েই—'হুঁ, হামি পারে।'...সচ্চে গে, শহর কিরিয়া!

আমরা কুশীর রঙ্গমঞ্চ ওপারেই এসেছি ছেড়ে। আবার পুরনো মিথিলা—গ্রামের পর গ্রাম—উঠোনে ধানের মড়াই, মোষ, গোরু; কানে বড় বড় দুটি সোনার কুণ্ডল, ব্রাহ্মণের ছেলে ছুটে বেরুল মোটর গাড়ি দেখতে; পড়ন্ত রোদে ইঁদারায় জমে উঠেছে মেয়েদের ভিড়—সোল্‌কৈন্‌, অর্থাৎ নিচু জাতের মেয়ে দুটি একটু তটস্থ হয়ে কলসী নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে; ঝাঁকড়া পাকুড়ের নিচে বসেছে বড়দের আড্ডা—হাঁটু দুটো মুড়ে বসেছে সব, কোমর আর হাঁটু ঘেরে একটা গামছা জড়ানো—ইজিচেয়ারের আরাম, একজন খৈনি ডলছে। প্রাচুর্যে তৃপ্ত মিথিলা। আম হয়েছে ভালো এবারে, আমে ধান,—নগদ যা রয়েছে ভালোই রয়েছে, তাছাড়া ভবিষ্যতও নিরুদ্বেগ। আসল কথা, কুশীর দুঃস্বপ্ন না থাকলেই হোল। ...বালি নেই কঠিন মাটির রাস্তার ওপর দিয়ে অনায়াস গতিতে আমাদের জীপ চলেছে এগিয়ে। শুধু একটি লোকের, আর যেন সেরকম গা নেই—আমাদের ড্রাইভার রামদয়ালের। মিলিটারী লোক, ইম্ফলের যুদ্ধে আসামের পাহাড়ে-জঙ্গলে জীপ হাঁকিয়ে এসেছে, বালিয়াড়ির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, তবু জীপের মর্যাদাটা

অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, এখন গাড়ি ছেড়ে স্টীয়ারিং ধরে চুপ করে বসে আছে।—সিলিপুর মহাসেমর, সুখায়ন্, দেবীপুর—একটার পর একটা করে গ্রাম পেরিয়ে গেল। একটি জলভরা শান্ত-শিষ্ট নদীও পেরিয়েছে এর মধ্যে, যদি কুশীর শাখাই হয় তো বুনো মেয়ে, গ্রামের বৌ হয়ে লক্ষ্মী হয়ে পড়েছে। ...দূরে গাছপালার ফাঁকে যেন শহুরে বাড়ি যাচ্ছে দেখা—দোতলা, হয়তো তেতলাই ; মোড় ঘুরতেই কলের চিমনি একটা উঠল জেগে। আমরা গণপৎগঞ্জে এসে গেছি।

ছিল বাড়িতে সত্যেন। একেবারেই না বলে ক'য়ে আসা, রাস্তায় বরাবর ও ভয়টুকু ছিলই লেগে, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার, মহালে বেরিয়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয় ; হয়তো গিয়ে শুনব, পূর্ণিয়াতেই বেরিয়ে গেছে, ফিরতে সপ্তাহ খানেক। ও ধুকধুকুনিটা যাহক কাটল।

চিনলে আমায়, সম্ভবত এদিকে যে বরাবর পত্রালাপ চলে আসছে তার জন্যেই ; অবশ্য ওকে না চেনার কথা ওঠে না, ওর বাসাতেই যখন গেছি। বিশেষ পরিবর্তন নেই ; মোটা ছিলই, আরো হয়েছে। জমিদারের নায়েবীতে স্বেদ আছে নিশ্চয়, কুশীর বালির জন্যে নিশ্চয় বেশিই ; কিন্তু তেমনি মেদও থাকবেই, ভালো রকমই মোটা হয়েছে।

ছত্রিশ বছর পরে দেখা, সেই হিসাবই উঠল প্রথমে। বললাম—"কমলা-কুশীর মতন কারও বোধ হয় একটা অভিশাপ ছিল আমাদের দুজনের ওপর ...আর শাপমুক্তও যে হয়েছি, তা-ও সত্যিই এক রকম অগ্নিশুদ্ধ হয়েই। এই অগ্নিকুণ্ড ঠেলে তোমায় তো সুপৌল মধেপুরা-সাহারসায় গিয়ে আদালতের ছাপাও সামলাতে হয়।"

বললে—"গোরুর গাড়ি করে। বর্ষায় গোরুর গাড়ি, নৌকো, হণ্টন..."

ধারণায় আসে না, সদ্য যা অবস্থা, তাতে অত উগ্র কিছু ধারণা করতে যাওয়াও বোধ হয় ভুল।

বললাম—"শুনে একটা উপকার হোল, এই পথে আবার ফিরে যেতে হবে, মনটা ভয়ে গুটিয়ে আসছিল, তোমার কোনও দিনের যাত্রার ছবি মনে মনে আঁকতে আঁকতে যাব।"

হেসে বললে—"আমিও তাই করি, ভাবতে থাকি ওদের কথা, যাদের এই মরুভূমি আবার পায়ে হেঁটে পার হতে হয়।"

শিউরে উঠেই প্রশ্ন করলাম—"হয় নাকি কাউকে!"

"আমার পিয়নকেই পাঠাতে হয়; অবশ্য তেমনি দরকার পড়লে। তা ভিন্ন সব মানুষেরই তো দরকার পড়ে, জেলার কোর্ট, কাছারি তিনটেই যখন ওদিকেই। গোরুর গাড়ি তো সবার ভাগ্যে জোটে না।"

আমায় অপলকভাবে চেয়ে থাকতে দেখে বললে—"তোমায় একটু বেশী ঘাবড়ে দিলাম দেখছি।...এই রকমটাও কখনও কখনও দরকার হয়ে পড়ে, মাথার ওপর সূর্য্যি, পায়ের নিচে বালি, তবে নিতান্ত সেরকম অবস্থা না হলে লোকে দিনের বেলাটা বাদই দেয়, রাত্তিরে দু-পাঁচজন মিলে করে যাত্রা; সে তত খারাপ নয়..."

"তত খারাপ নয় মানে?"

"জন্তু-জানোয়ার সব বেরোয় রাত্তিরে, তবে তার জন্যে তারাও তোয়ের থাকে......আর একটা বিপদ, একেবারে মাঝ বালিয়াড়িতে পড়লে দিকভ্রম হবার চান্স থাকে অনেক সময়।"

"কি জন্তু সব?"

"হরিণের পাল, নীল গাই—অবশ্য এদের ভয় নেই, তবে সেরকম জানোয়ারও অনেক—বিশেষ করে বুনো শুয়োর, হুড়ার—এক রকম wild dog, কতকটা নেকড়ে গোছের, দল বেঁধে থাকে; এ ভিন্ন বাঘও বেরোয়, অবশ্য চিতে, আসল এখন জল-জঙ্গল পশ্চিমে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই চলে গেছে..."

জন দুয়েক লোক এসে সামনের বেঞ্চটাতে বসল। সত্যেন বললে—"একটু দাঁড়াও ভাই, এঁদের সঙ্গে দুটো বিশেষ দরকারী কথা আছে—মহা এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে, তোমায় বলছি পরে..."

আমি একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছি। দিনের কুশী-প্রাঙ্গণকেই দেখে এলাম, চিন্তা করে এলাম, রাত্রের কথা তো ভাবিনি। এই রুদ্র-ভীষণতার ওপিঠেই সে এক কী শান্ত সৌম্য ছবি। সন্ধ্যা নেমে

আসবার পর থেকেই মরুভূমির সাধারণ ধর্মেই বালিয়াড়ি আস্তে আস্তে শীতল হয়ে এল, যত রাত্রি এগুচ্ছে, ততই আরও শীতল। বালির তাতে যে হাওয়া উঠেছিল ক্ষিপ্ত হয়ে, তার সে মত্ত বেগ গেছে, সে মাতুনে হুঙ্কার গেছে; নিজে জুড়িয়ে আর সব কিছুতেই জুড়ুতে জুড়ুতে একটি তৃপ্ত প্রবাহে বালির ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে বয়ে চলেছে। বালির নেই চোখ-ঝলসানো দীপ্তি, নক্ষত্রে ভরা দিগ্‌লুণ্ঠিত আকাশের স্নিগ্ধতা নেমে এসেছে তার গায়ে। পথিক চলেছে জন চার-পাঁচ।···হঠাৎ দূরে বালির গায়ে একটা চঞ্চলতা জেগে উঠল—হরিণের পাল বেরিয়েছে তাদের নৈশ অভিযানে—শিঙের শাখা-প্রশাখায় একটা রীতিমতো জঙ্গল বৈকি—নক্ষত্রের আলোতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; দলটা হচ্ছে পুষ্ট। একটা থমকানো ভাব, যূথপতি বোধ হয় দাঁড়িয়ে ঠিক করে নিচ্ছে কোন্ দিক ধরে এবার হবে এগুতে, তার পরেই হঠাৎ··

কথাটা হচ্ছে, পুরোপুরিই তো শান্ত ছবি নয়। একটা আওয়াজ যেন উঠল কোথায় ঐ দলের পেছনে আরও অনেক দূরে—বোধ হয় আরও তিন-চার মাইল ওদিকে—মরুভূমির মানদণ্ডও তো আলাদা। চিতে পেয়েছে শিকারের গন্ধ।···হঠাৎ সমস্ত দলটা যেন একটু গুটিয়ে গেল, তার পরেই ছুট।···লাফিয়ে লাফিয়ে হরিণের দৌড়, ঢেউয়ের তালে; হাওয়া কাটার একটা শন্ শন্ আওয়াজ তারপর হাওয়ার চেয়েও দ্রুত সমস্ত দলটা একদিকের তরল অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুশীর নিশারঙ্গমঞ্চে একটা দৃশ্য শেষ হোল।

সত্যেনের সেই জরুরী গল্প চলেছে। অক্ষয়বাবু তাঁর সেই গমের আড়ৎদারকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সরকারী টাকা দাখিল করতে ল্যাজে খেলছে। বেশ চৌকশ বেনিয়ার বাচ্ছা মনে হচ্ছে—অক্ষয়বাবু আর গোপাল-সুন্দরবাবু—দুজন প্রতিপক্ষকে সামলে যেমন চোখে-মুখে কথা কইছে।

আমি কতকটা অন্যমনস্ক হয়ে দেখছি রাত্রের কুশীর স্বপ্ন। ভরা দুপুরের কুশীকে দেখে ফিরে যাওয়া শুধু তো অসম্পূর্ণ নয়, তার প্রতি অবিচারও।

কিন্তু তাহলে তো আজই এই অবসর, আর কবে পাব? আর, এত ভৈরব কোথায় বা কুশী যে এত সুন্দর হবে?

অক্ষয়বাবুর কাছে কথাটা পাড়লাম, অবশ্য কাব্যের দিকটা ধরে নয়; এই একটু ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া, যে ধকলটা গেল দিনের বেলা।......

কিন্তু মনের ভাবটা বুঝে নিতে বেগ পেতে হোল না ওঁকে। ঐ একটি লোক, সাহারসায় পা দিয়েছি পর্যন্ত আমায় যতখানি আর যত রকমে সম্ভব দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন জায়গাটাকে। কেন জানি না, হয়তো অনেকদিন রয়ে গেছেন বলে এক দিক দিয়ে ক্লান্তি এসে পড়লেও অন্য দিকে এক ধরনের মায়া বসে গেছে এই অভিশপ্ত ভূখণ্ডের ওপর—এক ধরনের মরুমায়াই। স্বাভাবিক সঙ্কোচবশেই মনের কথাটি লুকুবার চেষ্টা করলেও উনি আন্দাজ করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—"হ্যাঁ, রাত্তিরই চমৎকার হবে, আমার ওদিকটা খেয়াল হয়নি—মনে করেছিলাম রোদ তো পড়ে এল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব—যাতে অন্ধকার হওয়ার আগেই অন্তত বালিয়াড়িটা পেরিয়ে যেতে পারি; কিন্তু এখন ভেবে দেখছি···"

সত্যেনও মনে হোল আগন্তুকদ্বয়কে এদিককার গুরুত্বটা বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল, নিশ্চয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেড়িয়ে পড়বার কথাটা কানে যেতে। অক্ষয় বাবুকে শেষ করতে না দিয়েই বললে—"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে যাবার কথাটা বুঝলাম না তো···· সত্যি বিভূতি এসেছে কি স্বপ্ন দেখছি, এখনও সে ধোঁকাটুকুও মেটেনি আমার, ওকে টিপেটাপে দেখতে হবে আমায়......"

ওর স্থূলপুষ্ট শরীরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম,—"নিজের হাতে?···তাহলে বরং এক ঘণ্টা আগেই সরে পড়া ভালো আমার।"

হাসির মধ্যে সত্যেন এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। এখানে স্কুল নিয়ে ঘোর পলিটিক্স চলছে, সত্যেন হচ্ছে সেক্রেটারী। স্কুলটা হচ্ছে ওদের স্টেটেরই, জমি-বাড়ি দিয়ে গোড়াপত্তন করেছে স্টেটই; এখন স্টেটের কর্তৃত্বটা আর কারুর সহ্য হচ্ছে না, দুজন শিক্ষকের নিয়োগ নিয়ে গোলমালটা বেধেছে। তাঁরা

ছুজন নাকি বাঙালা। পাশে আর একটা স্কুল মাথা তোলবার চেষ্টা করছে, অলক্ষ্যে থেকে উস্কানি দিয়ে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে উঠে-পড়ে লেগেছে। আপাতত স্ট্রাইক চলেছে, ছেলেরা বলছে, নবনিযুক্ত শিক্ষক দুজনকে রীতিমতো 'শিক্ষা' দেবে। তাঁরা বলেছেন, আমাদের 'শিক্ষা' আশাতিরিক্ত হয়ে গেছে, এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। সত্যেন অভয় দিয়ে ধরে রেখেছে তাঁদের, তা ভিন্ন বেরুনোও তো বিপজ্জনক এ অবস্থায়, তাঁরা ভয় আর অভয়ের মধ্যে দোলা খাচ্ছেন।...সামনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিধানসভাব ইলেকশন, সজাগ-দৃষ্টি একজন স্থানীয় 'নেতা'ও নাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন, এই ব্যাপারটাকে ইলেকশনের ভেলা করে, কাজ হাঁসিল করতে চান, উনিই নাকি আপোষ-মীমাংসার নামে কতকগুলি গুরুতর শর্ত দিয়ে দূতটিকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে।

থাকা যে চলবে না আমাদের, একথা সত্যেনকে বোঝাতে স্বভাবতই বেগ পেতে হোল; সত্যিই তো পঞ্চাশ মাইল এই বৈশাখী রোদে ছত্রিশ বছর পরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে ফিরে যাওয়া প্রায় একটা হাস্যকর ব্যাপারই হয়ে পড়ে, পুরোপুরি না হলেও পর্বতের মূষিক প্রসবের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছেই। কিন্তু উপায়ও ছিল না, মণির সকালে জীপটা চাই-ই, যা-পথ হয়ে যে-জায়গায় এসেছি, তার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে; রাত্রি ন'টা পর্যন্ত ফেরবার সময় দিয়েছি—একটু বাড়িয়েই; তার ওপর যতই দেরি হবে, ততই উদ্বেগ বাড়বে, জায়গাও এমন নয় যে, একটা পিয়ন ছুটিয়ে একটু খোঁজ নেবে। এর ওপর দুজন অফিসার সঙ্গে, আটকে রাখা যাবে না।...

বললাম—"এর ওপর তুমি একটা মস্ত বড় ভুল করে বসে আছ আগে থাকতেই।"

সত্যেন প্রশ্ন করল—"কি সেটি?"

"আমায় বলতে পারতে—তুমি একাই থাকো না হয়! স্টেটের মোটর করে পাঠিয়ে দোব। তারপর বললেই হোত—মোটর গেছে বিগড়ে; মোটর যে থাকার চেয়ে বিগড়োয় বেশি, একথা বেশ নির্বিচারেই মেনে নিতাম; কিন্তু

আগেই বলে বসে আছ, তোমার গোরুর গাড়ি সম্বল—তাও আবার দুজন হাকিমের সামনে, কথা উল্টানো যাবে না।"

"না হয় গরুর গাড়িতেই গেলে…"

"তা তো যেতেই হবে, আমার জন্যে কি পুষ্পক রথ আসবে? কী এমন মহাপুণ্যি করেছি?"

সত্যেন বললে—"বুঝলাম না…।" ওঁরা দুজনেও একটু ধাঁধায় পড়ে চেয়ে আছেন।

বললাম—"শেষ যাওয়ার কথাই তো বলছ তুমি?—এই বালির বৈতরণী যদি গোরুর গাড়িতে ঠেলে যেতে হয়…তুমি না হয় জমিদারের নায়েব, যমেও ভয় করে…"

একটা হাসি উঠল, সত্যেন বললে—"না হে, এই সবে এলে, ছাড়তে মন চাইছে না…"

বললাম—"সে তো সেঞ্চুরি টপকাবার পরও মনে হয়, আহা, আরও কিছুদিন থাকুক…"

বহুদিন পরে প্রিয়সমাগম—কখনও হাসি, কখনও বেদনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের গল্পস্বল্প।—ছত্রিশটা বছর, তার সঞ্চয়-অপচয় দুই-ই তো আছে। ভগবানের অসীম দয়া ছত্রিশ বছর পরেও দুজনে একত্র হয়েছি—যেটুকুর জন্যেই হোক, কিন্তু অনন্ত আয়ু নিয়ে বসলেও তো কৈশোর যৌবনের সেই দলটি পূর্ণ করে পাওয়া যাবে না।…অনিল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? যুগল কোথায়?—আরও অনেকে—তাদের এতদিন খোঁজ নেই যে আর খোঁজ নিতেও বুক দুর দুর করে—সন্দেহের আলো-আঁধারি থেকে কী নিদারুণ সত্য আসতে পারে বেরিয়ে।……অতীত শেষ হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ নেই, এ-বয়সের জীবন, শুধু বর্তমানকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাওয়া—য পা এগুতে পারা যায়।

সত্যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে; এক সময় বলতেই হোল কথাটা—"তোমার সমস্ত মনটা কিন্তু যেন পাওয়া যাচ্ছে না সত্যেন।…"

বললে—"ধরে ফেলে একটু সহজ করে দিল ভাই। আমি উঠি তাহলে একটু।"

"তার মানে?......কোনও-কুকর্মে তো ধরা পড়নি যে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।"

"আরও খানিকটা সহজ করে দিলে, কু-কর্ম না করেও তো বদনাম হয় অদৃষ্টগুণে, আমারও আজ সেই দশা—মনে হতে হবে তোমাদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করে নিশ্চিন্দি হতে চাইছি।"

"ধরে নেওয়া যাক, সত্যিই সেটা আছে মনে—আমরা কিন্তু নিজেই মানে মানে সরে পড়ে তোমার কাজ আরও সহজ করে দিচ্ছি না?"

হেসে উত্তর করলে—"কৈ আর করলে?—তোমরা তো রাত্তিরে যেতে চাও; তোমাদের এক্ষুণি উঠতে হবে কিন্তু।"

বাইরের দিকে চেয়ে বেলাটা দেখে নিয়ে বললে—"আর ঘণ্টাখানেক বসতে দেওয়া যায়, খুব কান্নাকাটি করলে আরও আধ ঘণ্টা।··কথাটা হচ্ছে ভাই, যদি থেকে না যাও তো রাত্তিরে তোমাদের বেরুতে দিতে পারা যায় না। ঐ বালিয়াড়ির দশ-বারো মাইল তোমাদের যতটা সম্ভব দিনের আলো অল্প কিছুও থাকতে থাকতে পেরিয়ে যেতেই হবে। ও বড় বিষম জায়গা, তার ওপর তোমাদের ড্রাইভার নতুন এদিকে—রাত্তিরও অমাবস্যা গেছে কাল, যদি একটু দিক্ ভুলে একবার মাঝখানের দিকে ঢুকে পড়ে তো রাত পোহালেও বেরিয়ে আসা শক্ত হবে। না, ও-সাহসটা করতে পারছি না।"

একটু ম্লান হেসে বললে—"তাই তো মনে হচ্ছে, বোধ হয় না দেখা হলেই ভালো ছিল।·· আমি আসি একটু।"

ঘুরে পা বাড়াতে বললাম—"কিন্তু তাহলে তো আরও কোথায় এই ঘণ্টা দেড়েক বসবে কাছে, না···"

একটু এগিয়ে এল সত্যেন, বললে—"সে আর এক বিপদ, বোল না আর, যিনি নিশ্চিন্দি হয়ে বসতে দিতে পারতেন—তোমার বন্ধুপত্নী, কপালগুণে তিনিও নেই আজ। বেড়াতে গেছেন পাঁচ-ছ মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে—বেশি দেরি হয়ে গেলে নাও ফিরতে পারেন। গণপৎগঞ্জের

মতন জায়গা—গিন্নিই ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, খাবারের দোকান—একধারে সব। দেখি, একটু সরবতের ব্যবস্থা তো করতে হবে; যদিই সাধ্যে কুলোয়।"

চলে গেল। একটু পরেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা চাকরকে ডেকে একটা পুর্জি লিখে কোথায় দৌড় করিয়ে দিল। তারপর আবার এসে বসল। ইতিমধ্যে সেই বেনিয়া যুবকটি কথাবার্তা সেরে চলে গেছে; বেশ চৌকশ ছোকরা। অক্ষয়বাবুকে বললাম—"যাক, আপনার কাজটা যাহোক হয়ে গেল।'

বললেন—"মোটেই নয়, কোথায় আছেন আপনি? ও শেষ পর্যন্ত আদালতে না টেনে তোলা ভিন্ন উপায় নেই।"

শান্তি দূতের Embassy যে এসেছিল—বিলাতী মতে যাদের ঘুঘু এবং দেশী মতে বাস্তু ঘুঘু বলতে পার—তারা বেগতিক দেখে অনেক আগেই ডানা মেলে উড়ে গেছে, আবার আমাদের গল্প চলল।

সরবৎ খেতে ভেতরে গিয়ে আয়োজন দেখে বেশ একটু বিস্মিতই হতে হোল। প্লেট ভরে ভরে কয়েক রকম খাবার; কিন্তু সেগুলো যেমন সত্যেনের রান্নাঘরের নয়, তেমনি দোকানেরও হতে পারে না কোনমতে। কয়েকটিতে বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে, রচনাপদ্ধতিটা যেন মনে হোল বিশিষ্ট মাড়োয়ারী বা আগরওয়ালার ঘরের। খাবারের সূত্র ধরেই গণপৎগঞ্জের বড় এবং আসল পরিচয়টা পাওয়া গেল।

এখানকার জমিদারবংশ আগরওয়ালাই—এ প্রান্তে রাজা বলেই জানিত। এর মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য যে, এঁরা হচ্ছেন জগৎশেঠের বংশধর। উপস্থিত যাঁরা কর্তা—তিন ভাই—শ্রীসুরপতি সিং, শ্রীমহীপতি সিং, শ্রীভূপতি সিং। আর একটা কথা শুনলাম—বাঙলার অনেক পুরাতন এবং বনেদী মাড়োয়ারী আগরওয়ালা এবং ক্ষেত্রী পরিবারের মতন এঁদেরও শিক্ষা-দীক্ষা এমনকি অন্তঃপুরের ভাষা, সংস্কৃতি—সবই বাঙলা। অবশ্য এঁদের মূল আস্তানা কলকাতায়, এখন ব্যবসায়ের চেয়ে জমিদারীই বড়—বাইরে বহু স্থানে আছে ছড়িয়ে। এখানেও এঁদের গোড়াপত্তন অনেক আগে। আর জমিদারীও

যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টারেস্টও কমে আসছে, থাকেনও সব বেশির ভাগ কলকাতাতেই।

বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছিল। শুনলাম, এখানকার প্রাসাদেও ওঁদের একটি সুসমৃদ্ধ বাঙলা লাইব্রেরী আছে। চারিদিক দিয়েই বেশ কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবার, ছেলেমেয়েরা সবাই বইয়ের ভক্ত। এখানে অন্তঃপুরে এখন রয়েছেন বধূরাণীদের একজন, বন্ধুসমাগমের বিপদে সত্যেন তাঁর কাছেই পত্র দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল, তারই ফলে দুর্ভোগের মধ্যে আমাদের এই রাজভোগ।

আমাদের তদারক করছে একটি স্থানীয় বাঙালীর ছেলে—সাহারসা জেলাতেই বাড়ি—যেমন সেই 'গোবিন্দ নয়েক' আর কি ; গরীবের ছেলে। সত্যেনও রয়েছে।

একটি স্বপ্নময় আবহাওয়ার মধ্যে ঘণ্টা তিন কাটল আমাদের, এখনি শেষ হয়ে যাবে বলে আরও স্বপ্নময়—fleeting. সত্যেনের বাসাটি চমৎকার, এরকম একটা জায়গায় ঠিক এই ধরনের planned বাড়ি আশা করা যায় না। পাশেই ওর এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে বেড়াতে 'গোবিন্দ নয়েক' (এ-ছেলেটার নামটুকু মনে পড়ছে না) serve করছে আমাদের, গল্প-গুজব হচ্ছে। শেষ হলে বেরিয়ে এলাম সবাই। বাড়ির অনেকখানি কম্পাউণ্ড, সামনেই প্রশস্ত রাজপথ—সাহারসা জেলায় যে মাইল দুয়েক ইটের খোওয়া বেছানো পথের কথা আগে বলেছি, তার খানিকটা এখানে। রাস্তার ওধারেই প্রকাণ্ড ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে অনেকখানি ভেতরের দিকে রাজবাড়ি ; রাস্তাটি ছায়াস্নিগ্ধ-বীথিপথ। খানিকটা ডাইনে গিয়ে রাস্তাটি সোজা বাজারের দিকে চলে গেছে, আগেই পড়ে সেই স্কুলটা। ঘুরে ফিরে আর দেখা হোল না গণপৎগঞ্জ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক নজরে যেটুকু শুধু পড়ল চোখে। অপরাহ্নের ছায়ায় সমস্তটুকু বেশ স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে। শহরের দিকে গেলেই বোধ হয় কানে আসবে—ছেলেদের মধ্যে ধর্মঘটের স্লোগান আকাশ ফাটাচ্ছে। কাজ নেই, সত্যেনকে এবার যে নতুনভাবে মনে পড়বে মাঝে মাঝে—সে মনে-পড়ার সঙ্গে এই স্নিগ্ধতাটুকুই শাশ্বত হয়ে থাক।

বিদায়ের সুরটাও আর বিলম্বিত লয়ে যেতে দিলাম না; কষ্ট হচ্ছে, এসব বিদায়ে যে বর্তমানের চেয়ে অতীতই বেশি করে মনে পড়ে—সেই ছেলেবেলা; সেকথা আর সবার কাছে যতই ছেলেমানুষী হোক, নিজেদের কাছে তো নয়। একটু ম্লান হাসি বিনিময় করে জীপে উঠে বসলাম। বামগুলাম স্টার্ট দিল, হাত উল্টে দেখলাম, সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেছে।

সূর্যাস্ত হল যখন আমরা বালিয়াড়ির মাঝখানে। সে যে কী বিরাট মহিমময় দৃশ্য, কি করে বোঝাই তোমায়! শুধু বালি, আকাশ আর অস্তরাগের রাঙা আবীর; শুধু একটা বিরাট শূন্যতা, কিন্তু শূন্যতাও যে কী পূর্ণতা, জীবনে তা এই প্রথম দেখলাম; কুশীই তা দেখালে।

সুপৌল ছেড়ে সাহারসায় আসতে আসতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

সুপৌলে আমরা যখন পৌঁছলাম, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মাইল কুড়ি-বাইশ শেষ হোল, সামনে এখনও মাইল ত্রিশ পড়ে। এক নাগারে বেরিয়ে পড়লেই ভালো; কিন্তু গোপালসুন্দরবাবু ছাড়লেন না। একবার নেমে একটু কিছু মুখে না দিয়ে যাওয়া চলবে না—অন্তত একটু করে সরবৎ।

একবার গাড়ি ছেড়ে দেবার পর দেহ নিজেই এলিয়ে পড়ল। অপরিচিত জায়গায় রাত্রে বসে গল্প করার মধ্যে একটা বিশেষ মাদকতাও আছে, কখনও লক্ষ্য করেছো কি?—চারিদিকে একটি রহস্য ঘিরে থাকে কি না। বাসার সামনে প্রশস্ত ঘাস-জমিটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আমরা গল্পে আত্মসমর্পণ করছি, ওদিকে সরবৎ তোয়ের হচ্ছে। এ-সরবৎ গণপৎগঞ্জের সরবতের চেয়েও এগিয়ে যাবে সে বুঝে আরও আলগা করে দিয়েছি দেহ মন। আর আপত্তি করবার ক্ষমতাও নেই।

মাঝে মাঝে শুধু ভাবনা হচ্ছে—এখনও ত্রিশটি মাইল সামনে পড়ে। সামনের ঐ জীইয়ে রাখা পথশ্রমটার সঙ্গে এই গা-ঢালা আরামটা কেমন যেন খাপ খাওয়াতে পারা যাচ্ছে না কোন মতেই; রূঢ় ভবিষ্যৎটি স্বপ্নালু বর্তমানটুকুর ওপর যেন চেপে চেপে বসছে মাঝে মাঝে।

ভুরি-ভোজন সেরে প্রায় ন'টার সময় আমরা সেই শেষ ত্রিশ মাইলের পথে উঠলাম।

ছোট শহরের সীমানা পেরুতে দেরি হোল না; আমরা ম্যুনিসিপ্যালিটির শেষ ল্যাম্পপোস্ট ছাড়িয়ে হেডলাইটের দুটি সংকীর্ণ আলোক-বর্তিকা মাত্র সম্বল ক'রে আবার গাঢ়তর অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

* * *

অশ্রুমতী দুই কন্যা—কৌশিকী আর কমলা, নতনেত্রে রয়েছে দাঁড়িয়ে। মহর্ষি শাপ লাঘব করলেন—"বেশ, তোরা দুই ভগ্নীতে যখন অনুতপ্তা তখন চিরবিচ্ছিন্না হলেও শত বৎসরে একবার করে পরস্পরে সঙ্গে মিলিতা হবি।"

কনিষ্ঠা কমলা যেরকম লম্প-ঝম্প লাগিয়েছেন, মনে হয় তবে একটি শতাব্দী বুঝি এই বছরেই হোল পূর্ণ। লক্ষ্মী মেয়ে সাক্ষাৎ কমলাই, ঘুরে ঘুরে পশ্চিম মিথিলার ক্ষেতে-আঙনে সোনা ফলিয়েই বেড়ান, এবার কিন্তু অন্য মূর্তি। তরাইয়েব কয়েকটা বাঁধই গেছে ভেঙে, শুকন-হাজা যত সব স্ঁতি ছিল সবগুলো উঠেছে জেগে, মূল ধারা নেপাল তরাইয়ের কাছে জয়নগরকে ভাসিয়ে দক্ষিণে ছুটেছে মত্ত গতিতে, মধুবানীতে বাঁধ টপকে জল ঢুকেছে, রেলের লাইনও এবার থাকে কি না-থাকে। পাইল্-ব্রিজের ওপব দিয়ে গাড়ি চলছে পা টিপে টিপে, দুর্গানাম জপ করতে করতে; এটুকুও বন্ধ করতে হোল বলে, আর দেরি নেই, রেল-ওভারসিয়ার দিন রাত পুলের ধারে ফুট-ইঞ্চি বসানো মানদণ্ডটার দিকে চেয়ে ব'সে আছে।...আস্তে আস্তে সব ডুবছে চারিদিকে, নামাল জমির ধান, তারপর ভিৎ জমির মকাই, মড়ুয়া, তারপর উঁচু পোতার ঘরদোরও। মিথিলার মেয়ে কমলা,—বাড়িতে উৎসব হোলে পাড়ার আরও পাঁচটা মেয়েকে ডেকে গান করা এখানে রেওয়াজ নয়? কমলাও ডাক দিয়েছে পড়শীদের—বালান, তিলযুগা, জীবছ্, ছুৎহরি—সবাই গলা মিলিয়ে সমতান তুলেছে, সারা মিথিলার ঘুম গেছে ছুটে।...কমলার বাড়িতে উৎসব, তার বোন কুশী শতবৎসর পরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

বাঘমতী এখনও রয়েছে বাকি।...তবে, আগে থাকতেই বেশি আশা করে একটা বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়। বোন যদি সত্যিই পড়ে এসে,

তখন-তখনই খবরটা পৌছে দিলেই হবে বাঘমতীর কাছেও।...যা দাপট বড় বোনের! —ছোট বোনেরও সেই মতো তোড়জোড় না করলে মান থাকবে কেন ?

ভরা বর্ষা, দ্বারভাঙ্গা এসে বসে আছি অনেকদিন হোল, কুশী সাহারসাকে ভালো করে ঘেরে নেবার আগেই। সেই সময়ই দেখলাম থামারা থেকে বাদলাঘাট পর্যন্ত নেড়া পুলগুলোর নিচে কুশীর চেহারা অন্যরকম হয়ে এসেছে, আর এখন তো রেলই বন্ধ। সাহারসা, মধেপুরা, সুপৌল এখন বাইরের জগৎ থেকে আলাদা, আবার সাহারসা থেকে মধেপুরাও বিচ্ছিন্ন। মাঠাহির সেই ছোট্ট নদীটির কথা মনে আছে ?— ঝিরঝিরে নীল জল, দু'ধারে সবুজ ক্ষেত, সেই নদীই এখন ওদিককার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। মেহসী-বনগাঁওয়েরও নিশ্চয় এই অবস্থাই,—মনে আছে জামের বনের ধারে সেই শান্ত নদীটি—স্বচ্ছ জলে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ করছে ? কে জানে আজ তারই বা কী রূপ ?

দ্বারভাঙ্গায় এসে আমি প্রতীক্ষা করছি—আমার বালুকাময়ী কুশী হয়ে গেছে দেখা, প্রতীক্ষা করছি এবার জলময়ী কুশীকে দেখব। খবর নিচ্ছি, কুশী আসছে ক্রমেই পশ্চিমে এগিয়ে, খবর পাচ্ছি কমলাও আনন্দে বাঁধন-হারা হয়ে উঠছে দিন দিন। আমার অপেক্ষা মণির জন্যে, সে কবে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এইদিকে পরিদর্শনে আসবে, তার সঙ্গ নেব। সরকারী ব্যবস্থা না হলে প্লাবনের কুশী দেখতে পাওয়া বিড়ম্বনা।

শেষতম খবর কুশী সাহরসা ছাড়িয়ে দ্বারভাঙ্গা জেলায় হানা দিয়েছে।

জেলার মালিকরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছেন।

সন্ধ্যার ডাকে আমিও চিঠি পেলাম—মণি বেরিয়েছে তদারকে। সকাল বেলা পৌছুবে, সঙ্গে সঙ্গে নির্মালী যাত্রা, পরের ট্রেনেই। তারপরের প্রোগ্রাম, কুশী যেমন অবস্থা দাঁড় করিয়েছে, সরেজমিনে দেখে শুনে তার ব্যবস্থা। সোজা পথে—খানিকটা জীপ করে আর খানিকটা নৌকায় নির্মালী হোল প্রায় মাইল ত্রিশ, সেই নির্মালী তদারকে আসতে হচ্ছে একশ' ত্রিশ মাইল ঘুরে অন্য দুখানা জেলার মাটি মাড়িয়ে; এই থেকে যতটা আন্দাজ করে

নিতে পারে। সুপৌলের পর এখন সে-পথ নিশ্চিহ্ন, শুধু জল আর জল, তারই ওপর কখন্ আবার ঝড় ওঠে, মেঘ আসে ঘনিয়ে। আর আসা, সেও তো সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে বেনো জলের উজান ঠেলে ; মাল্লারা তো মানুষই।

দলের মধ্যে কে, আর, ও, অর্থাৎ কুশী রিলিফ অফিসার হিসাবে রবিবাবুকেও আসতে হয়েছে, বেশ ভালোই হোল ; আর আছে আরদালী লছমী। সেও সোনায় সোহাগাই। খুবই কাজের তো, শুধু একটু নজর রাখলেই হোল আমার গিন্নির-কাছে শেখা রান্নাগুলো না খাওয়াতে পায়। সেইরকম স্বল্পবাক্, মুখটা থমথম করছে, দেখলেই মনে হয় অনেকদিন মুখ··· খোলবার মতন লোক খুঁজে পায়নি বেচারী, গল্পে গল্পে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

সেলাম করে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি লছমী, খবর ভালো তো ?"

"এদিকের তো ভাল হুজুর কিন্তু এবার কুশী যা লাগিয়েছে···"—যেমন বলে, চাপা গলায় একটু রহস্যের ভাব ফুটিয়ে।

প্রশ্ন করলাম—"কেন ? সাহারসার ওপরও তাগ করেছে নাকি এবার ?"

"তা যদি বলেন হুজুর তো নেক-নজর তো বরাবরই আছে ; কিন্তু সে তো হবার জো নেই···"

"কেন ? বাধাটা কি ? জল যা নামে তার ওপর আরও ফুট চারেক উঁচু হয়ে জল নামলেই তো হোল—সব ফরসা।"

"কিন্তু উঁচু হতে দিচ্ছে কে ?···ফুট চারেক ছেড়ে ফুটখানেকও—মানে ঐ সাহারসার দিকে আর কি। এমনি দুনিয়া ভাসিয়ে দিক না—কুশীর মর্জি।··· কথাটা হচ্ছে বাবারও বাবা আছে তো হুজুর ?"

জমাট রহস্য।

অবসর নেই, দশটার সময় খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, একবার কিন্তু তোয়াজ ক'রে ব'সে লছমীর গল্পগুলো সব শুনতেই হবে। আমার ক্রমেই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে, ও হচ্ছে কুশী-প্রাঙ্গণের মেহের আলি। একবার ভেবে দেখো না, ও এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের আরদালি—বৎসরের পর বৎসর ধরে বিভিন্ন ঋতুতে কত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ওকে ঘুরে বেড়াতে

হয়েছে এই ধ্বংসময়ী নদীর বিচিত্ররূপ দেখে দেখে, ধ্বংসময়ী বলেই তো আবার সৃজনময়ীও ; পারে কখনও অভিভূত না হয়ে? কুশী যেন ওকে নিজের গর্ভ-রসে দিন দিন জীর্ণ করে নিচ্ছে ; হয়তো লোকটা এমনই একটু কল্পনাপ্রবণ, ওকে আরও কল্পনাপ্রবণ, আরও রোম্যান্টিক করে তুলেছে কুশী। একটা পুরনো পরিত্যক্ত ভিটে, কোন সুঁতীর ধারে আধখানা দেয়াল, কি কোনও বালির মধ্যে আধপোতা একটা নৌকো—যাই দেখুক না কেন লছমীর মাথায় একটা রোম্যান্স ওঠে গজিয়ে ; একটা কারণ, একটা কিছু গল্প ওকে আনতেই হয় টেনে চারদিকের এই রহস্য বিভীষিকার মধ্যে থেকে। ওটা তোমার আমার কাছে মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু ওর কাছে নয়,—অন্তত একদিন যতটা মিথ্যা ছিল পরে আর ততটা নেই, আজ যদিই বা একটু থাকে, ভবিষ্যতে একেবারেই থাকবে না।...এটা আমার আন্দাজ, তবুও ভয় হয় লছমীর জন্যে।—মেহের আলি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অন্তর্নিহিত তথ্য আবিষ্কার করে অমোঘ আকর্ষণে সেই প্রাসাদচত্তরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত ; প্রতি তুচ্ছতায় এইরকম করে যদি রহস্য আরোপ করতে করতে এগোয় লছমী, তো ওর পরিণামই বা হবে কি ?

থাক্, হয়তো আমারই ভুল ; লছমী নিতান্তই একজন সাধারণ আরদালি, অন্য কোন আরদালির মতন ভোজনবিলাসী বা নিদ্রাবিলাসী না হয়ে মাত্র গল্পবিলাসী হয়েছে ; কথাটা সোজাসুজি বোঝবার চেষ্টা না করে হয়তো আমিই ওকে করে তুলছি অবোধ্য।

গাড়ি একটা স্টেশন ছাড়িয়ে সাকরিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জংশন স্টেশন, নেপাল তরাই থেকে যে লাইনটা আসছে, জয়নগর-মধুবনী হয়ে, তারই একটা গাড়ির অপেক্ষা। বন্যায় গাড়ির সময় ওলট-পালট হয়ে গেছে, খবর নিয়ে জানলাম, বেশ খানিকটা দেরি আছে।

ভালোই হোল। নেমে একটু ঘুরে-ঘারে দেখে আসা যাক্।

সাকরি স্টেশন ঘুরে-ঘারে দেখা মানেই আমার শৈশবের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো কিছুক্ষণ। মাইল তিনকেও নয় পাণ্ডুল এখান থেকে ; সেখানে আমার সমস্ত শৈশব ঘিরে পাশাপাশি আমাদের দু'টি বাঙালী পরিবারের

জীবন-স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। গেট্ পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হোল যেন সেইদিনকার আমিই গাড়ি থেকে নামলাম, দাদাও কোথাও এইখানেই রয়েছেন, পাশেই ; এইবার সামনে সেইদিনকার সেই রাঙা পাতায় ঢাকা বাদাম গাছটার তলায় এসে নীলকুঠীর বলদটানা সাম্পেনীটি দাঁড়াবে—তারপর···

কল্পনার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল। পাশেই একটা লোক একটা মাঝারি সাইজের ঝুড়িতে করে এক ঝুড়ি কি নিয়ে স্টেশন ঘরের ছায়াটায় এসে বসল, ওপরে একটা পাৎলা কাপড় ঢাকা থাকায় ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, তবে বেশ একটি গোলাপী আভা আসছে বেরিয়ে।

লোকটি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ; রোগা, আধবুড়ো, মাথার টুপিতে ছোট্ট সুতো পরানো একটা সুচ গোঁজা রয়েছে দেখে মনে হোল দর্জি। সাকরি-পাণ্ডুলের লোকের সঙ্গে কেমন একটু আলাপ করতেও ইচ্ছে হচ্ছে, প্রশ্ন করলাম—"তোমার ঝুড়িতে ও কি মিঞাসাহেব ?"

"পাগ্ হুজুর, দ্বারভাঙ্গা থেকে কিনে নিয়ে আসছি, এই গাড়িতেই।"

"বিক্রির নিশ্চয় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর ; পাণ্ডুল বাজারে আমার দোকান।···সৌরাঠ মেলা যাচ্ছে তো এখন।"

কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে, আলাপ হোলও তো একেবারে আপন জনের সঙ্গে।

"পাণ্ডুল বাজারে ? ঐখানকারই লোক নাকি ?"

"একরকম বলতে গেলে তাই···জরহাটিয়ায় আমার বাড়ি, গোলামের নাম হায়দর···"

"বিপিনবাবুকে চিনতে ?—কৈলাসবাবু, বিপিনবাবু··"

"চিনব না হুজুর ? কত তাঁবেদারি করেছি তাঁদের। আমি অবশ্য ছেলে-মানুষই তখন, তবে আমার ওয়ালিদ ছিলেন কুঠির চৌকিদার।··· তাঁরা দুজনেই এখন বেহেস্তে ; কব্লাশবাবু অনেকদিন গেছেন, শুনলাম বিপিনবাবুও···"

"আমি হচ্ছি বিপিনবাবুর ছেলে—মেজ ছেলে…"

বিস্মিতভাবে মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। একটা লোক কোনও দিক দিয়ে একেবারেই কেউ নয়, অথচ এক মুহূর্তেই কত আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে, সেই এক দেখলাম। একটু চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল, শুধু বার তিনচার একসঙ্গে সেলাম করলে, ঠোঁট দুটো অল্প কাঁপছে, কি করে আনন্দটা যে প্রকাশ করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না; তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে—"হুজুর বিপিনবাবুর ছেলে ?…ভাগ্যিস খোদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, দেখলাম।…সে পাগুল আর আজকের পাগুল, হুজুর ! ..ইয়া আল্লা !"…

সে পাগুল কি—শুনতে ইচ্ছে হয়, আর শুনতে হয় তো এইসব মুখেই, এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে ?· প্রশ্ন·ক'রে ক'রে শুনেছি—ওদের আমলের পাগুল, আবার তারও আগের—ঠাকুরদাদার আমলের, হায়দর তার বাবার কাছে, খালার কাছে শুনেছে সে-সব কাহিনী। খানিকটা সময় যে কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল বুঝতেই পারা গেল না। যাবার সময় হায়দর মিঞা এক কাণ্ড ক'রে বসল, কাপড়ের ঢাকা খুলে বেছে বেছে সবচেয়ে ভাল পাগটি আমায় গছিয়ে দিলে, গোলাপী সিল্ক মোড়া চমৎকার জিনিস। কত বললাম—আমি বাঙালী মানুষ, পাগ নিয়ে করব কি, মিছিমিছি ওর একটা ক্ষতি, তাও সবচেয়ে দামী পাগটিই বের করেছে…কিন্তু কোন আপত্তিই টিঁকল না, বাবা-জ্যেঠার তাঁবেদারকে মনে রাখবার জন্যে আমায় ওটা নিতেই হবে। পরবার দরকার কি ? তুলেই রাখব আল্‌মারি সাজিয়ে, একটা 'ইয়াদ্‌গারি' অর্থাৎ স্মারক হিসাবে। দাম নিলে না, নিতান্ত জোর ক'রে একটা নোট হাতে গুঁজে দিলাম, বললাম—আমার তো কিছুই কাছে নেই, ইয়াদ্‌গারি হিসাবেই রাখো এটুকু।

এখানেও হার-মানালে হায়দর মিঞা ; ঠাকুরদাদা থেকে আমার নিজের পর্যন্ত চারজনের নাম নোটটার গায়ে লিখিয়ে নিয়ে কপালে বার তিনচার ঠেকিয়ে ফতুয়ার পকেটে ভাঁজ করে রেখে দিলে। অর্থাৎ হোলই না মূল্য

দেওয়া আমার—ওটাকে এতই অমূল্য ক'রে তুললে যে মূল্য হিসাবে ওর আর কিছুই রইল না।

পাগ জিনিসটা কি তা তোমায় এখনও বলিনি। এটা হচ্ছে মৈথিলী ব্রাহ্মণদের শিরস্ত্রাণ—টুপি আর পাগড়ির মাঝামাঝি একটা জিনিস। খুব হাল্কা, সামনের দিকে কপাল পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে নামানো, ওপরটা একেবারে চ্যাপ্টা...কথাটা অবশ্য এসেছে পাগড়ি থেকে, পগ্গও শুনেছি। আমরাও কি এক সময় এই জাতীয় কিছু দিয়ে ঢাকতাম মাথা? বাঙালী যে 'মেগের কাছে পেগের বড়াই' করত, তা, জিনিসটা তাহলে কি?

একজন সঙ্গী আছে হায়দরের, বাজারে কি সব কিনতে গিয়েছিল, ফিরে এলে ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিলে। বললে—"ওটা নষ্ট করবেন না হুজুর। আমি আপনার ওয়ালিদের তাঁবেদার, খোদা মিঞার নাম করে দোয়া বলে দিয়ে যাচ্ছি...তাঁর সময়ের 'পুরণিয়া' লোক আমি—অধিকার আছে আমার..."

—অন্তর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এসে শুকন মুখখানি করে তুলেছে অপরূপ সুন্দর, পবিত্র। আমার মনেও কী একটা পূর্ণতা এনে দিয়েছে, বললাম—"না মিঞাসাহেব, আমি কি তোমার দোয়ার অমর্যাদা করতে পারি? এই দেখো মাথায় তুলে নিচ্ছি; পরব মাঝে মাঝে, শুধু আলমারিতেই বা তোলা থাকবে কেন?"

মাথায় বসিয়ে দিলাম চেপে। হায়দরের মুখের সেই দীপ্তিটা হাসি হয়ে ফুটে উঠল, বললে—"বাঃ! হুজুরকে মানিয়েছেও তোফা; আল্লা শুকুর করুন।"

কয়েক পা গিয়ে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখলে। বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর রাস্তাটা আড়ালে পড়ে গেছে। কি মনে হোল, পাগটা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি—ও শেষবার যে আমায় ঘুরে দেখবে, যেন দেখে আমি ওর 'দোয়া' মাথায় করেই রয়েছি।...ব্যাপারটুকু যা হোল তা'তে চমৎকার একটি মিষ্টাস্বাদ মুখে লেগে রয়েছে।

এর পরের যেটুকু সেটাকে কি বলি,—অম্বল? তা-ই হোল, শেষ পর্যন্ত গাড়িতে যে তারটুকু জিভে করে উঠলাম সেটাকে অম্লমধুরই বলতে হয়। ঘটনাটুকুই বলি—

হায়দর মিঞা তখনও দৃষ্টির বাইরে চলে যায়নি, হঠাৎ একটু পেছন থেকে কানে এল—"অপ্‌নেকে ঘর?" অর্থাৎ—আপনার বাড়ি কোথায়?… ফিরে দেখি—

কিন্তু তার আগে নিজের কথাই একটু ব'লে নিই, বুঝতে সুবিধে হবে—

আমি কোঁচা দুলিয়ে কাপড় পরি না জানই, ঠিক মৈথিলদের মতন ত্রিকোচ্য না হ'লেও কতকটা ঐরকম ক'রেই কোঁচার ফুলটা ওপরে গোঁজা আছে। গায়ে একটা ঢিলা হাতের পাঞ্জাবী, তার ওপর একটা সিল্কের চাদর, লক্ষ্য করে থাকবে সাধারণ বাঙালী এ-জিনিসটাকে তালাক্ দিলেও আমি এখনও গলাব হার করে রেখেছি; এর ওপর মাথায় হায়দর মিঞার সেই গোলাপী রেশমের পাগ, আলোয় ঝলমল করছে। এরও ওপর কিছু ছিল বৈকি, একেই মৈথিল আর বাঙালীর চেহারায় প্রভেদ নেই বললেই চলে, তায় যতটুকু বা ঠাকুরদাদা নিয়ে এসে-ছিলেন—সতেরো বছর বয়সে—তিন পুরুষ মিথিলার জল হাওয়ায় কাটিয়ে একরকম মিটে এসেছে।

ব্যাপারখানা এবার নিশ্চয় বুঝেছ।

ফিরে চাইতে প্রশ্নকর্তা আর একটু এগিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন। মৈথিল ব্রাহ্মণ একজন। লম্বা, গৌরবর্ণ, রোগা-রোগা, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে, মাথার সব চুলগুলি পাকা, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। এদিকে পায়ে নাগরা জুতো, গায়ে একটা ঘুন্টিদার কুর্তা—তার ওপর দিয়ে ময়লা হলদে পৈতার খানিকটা বেরিয়ে আছে; মাথায় একটা আলগা পাগ; এই রকম দোকানে বাঁধা নয়, একটা ময়লা চাদরই পাগের মতন ক'রে জড়িয়ে পরা। এ ব্যতীত গায়ের ময়লা উড়নিতে জড়ানো একটা পুঁটুলি বগল-দাবা করে রয়েছে, দেখলে মনে হয়, যেন একতাড়া পুঁথি।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখের ভাবটা। খুব সূক্ষ্ম একটু হাসি লেগে রয়েছে, কিন্তু তার অতিরিক্ত যে জিনিসটা রয়েছে সেটাকে কি করে ডিফাইন্ করি?—খুব ধূর্ত, গোপন একটা আত্মীয়তার ভাব যেন—কিছু না বলেও যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে—O. K., সব ঠিক আছে, ভয় নেই—যদিও কি ঠিক আছে, কিসেরই বা ভয়, তুমি কোন আন্দাজই করতে পারছ না।

বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলাম একটু। তারপর একটা লোকের অপরিচ্ছন্ন মুখ এবং ততোধিক অপরিচ্ছন্ন সাজগোজের দিকে চেয়ে থাকতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় দৃষ্টিটা যখন পুঁটুলিটার ওপর নিবদ্ধ করব, সেই হাসিটুকু আর একটু স্পষ্ট হোল, একবার সতর্কভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে আশপাশে দেখে নিয়ে মুখটা একটু নামিয়ে বললে—"ঠিকই আন্দাজ করছেন, এখন আমার আন্দাজটা ঠিক কিনা বলুন তো। অবশ্য 'না' বললে শুনচে কে?···তবুও···"

হাসিটা আরও স্পষ্ট করে মাথাটা অল্প অল্প দোলাতে লাগল।

হতভম্ব হয়ে গেছি; কোনও আন্দাজই তো করতে পারছি না ওর সম্বন্ধে, তার ওপর আবার ও কী আন্দাজ ক'রে বসে আছে!

আমার ভাব দেখে হাসতেই লাগল মুখ টিপে টিপে, যেন চতুরে চতুরে মোলাকাৎ হয়েছে; তারপর পুঁটুলিটার ওপর বার দুই মৃদু আঘাত করে পুঁথির শব্দ জাগিয়ে তুলে বললে—"হ্যাঁ, আমি তো 'পাঁজিয়ার'-ই, বললাম না? ঠিক ধরেছেন; কিন্তু···"

ডান চোখের কোণটা একটু টিপে মাথা দোলাতে লাগল।

এতক্ষণে একটু যেন আলো দেখতে পেলাম। 'পাঁজিয়ার'-রা হচ্ছে মিথিলার ঘটক সম্প্রদায়। ঐ যে পুঁথি, ওর মধ্যে রাশীকৃত কুলুজী মৈথিল পরিবারদের। মনে পড়ল সৌরাঠে বরের হাটও তো এই সময়, পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষরা জুটেছে, পাঁজিয়াররা লম্বা পুঁথি মেলে সম্বন্ধ বিচার করছে—দেখেছিলাম একবার, কিন্তু তা হলেও···আমায়···

পাগটার কথা খেয়াল হতে মাথা থেকে নামিয়ে নিলাম, সন্দেহটা দূর করতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু উল্টে ফল হোল।

আরও ধূর্তভাবে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—"কিন্তু পাগ মুকুলে কি আমি ভুলি?"...

তারপরই গম্ভীর হয়ে একটু গলা নামিয়ে বললে—"তা ভালোই করেছেন কিন্তু...আজকালকার নয়া-চালের ছেলেরা যা হয়েছে—দু' কলম ইংরিজী পড়ে—যদি দেখেছে দুলহার (বরের) একটু বয়েস হয়েছে কি অমনি?..."

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ের চকিত দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলাম—মনে করেছিলাম মৈথিল ভেবে বুঝি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এ যে দেখছি একেবারে আমারই ওপর তাগ্!

কিন্তু কথাটা শুনেই একটা শক্ লাগলেও তখনই আবার এর কৌতুকের দিকটাও জমে উঠে আমার মনে কোথায় যেন সুড়সুড়ি দিতে লাগল। লগনসা চলে টানা—পনের দিন, এক মাস, যাই হোক; সেই হিড়িকে, বিশেষ করে সৌরাঠের হাট চলল তো তার হট্টগোলে, বরকে গুম করে রাতারাতি বিয়ে দিয়ে ছেড়েছে এমন ব্যাপারও হয় মাঝে মাঝে; কিন্তু দিন দুপুরে জংশনের মাঝখানে যখন সে-ভয়টা নেই তখন শ্রাদ্ধটা কতখানি গড়ায় দেখাই যাক্ না।

হঠাৎ-বিস্ময়ে যে চেয়ে ছিলাম, চেয়ে থেকেই আস্তে আস্তে মুখে একটু হাসি ফোটালাম।

বোঝাপড়াটা হয়ে যেতে মাথাটা দুলিয়ে বললে—"কেমন...হোল তো? ...আমার নাম হচ্ছে টুনমুন্ ঝা—পাঁজিয়ার!...একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসলে হয় না?—লাট্ফারমের শেষে, বেড়ার বাইরে ঐখানটায়..."

অতটা না গিয়ে কাছেই একটু নিরিবিলি দেখে এগিয়ে দাঁড়ালাম দুজনে। ...বেশ জমে আসছে।

"হ্যাঁ, বাড়ি কোথায়?...তাহলেই ঠিক পুঁথি ঘেঁটে বের করব..."

একটু ভাবতে হোল, তারপর মনে পড়ে গেল বিনয় ঝার কথা। তাহলে কুলুজী ঘাঁটবার বখেরা যেমন থাকে না, তেমনি আরও একটা সুবিধে আছে; মৈথিল বলতে পারি ভালোই, তাইতেই চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যদি কোথাও ভুলটুল হয়ে পড়ে তো ধরা পড়বার ভয় থাকবে না।

বললাম—"বাড়ি আমার মুর্শিদাবাদ জেলায়···সাতপুরুষ হয়ে গেল···"

"হয়েছে, হয়েছে, আর বলতে হবে না, আপনার ভাষার টানটোন্ দেখেই হয়েছিল একটু ঐ ধরণের ধোঁকা, এখন বুঝলাম।···তা মতলবখানা কি?—খুলে বলুন তো আমায়, ঠিক সেই মতন ব্যবস্থা হবে।"

"মতলবখানা হচ্ছে···যদি একটি···"

মুখ দিয়ে বের করবার কুণ্ঠাতেই বোধ হয় মাঝপথে চুপ করে গেলাম।

"আরে সে তো আছেই। অতদূর থেকে এসেছেন, টুনমুন ঝা পাঁজিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওতো হয়েই আছে ধরে নিন্ না,—শুধু পালকি করে ঘরে তুলতে যা দেরি। তা নয়, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম—'কনিয়া'কে সেইখানেই নিয়ে যাবেন, না, মিথিলার ছেলে মিথিলায় ফিরে এসে এইখানেই আবার···'

"সেইখানে নিয়ে গেলে ক্ষতি কি?"

পাগের এক জায়গায় আঙুল সাঁদ করিয়ে টুনমুন ঝা মাথাটা একটু চুলকাল। তারপর ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট শুকনো কয়েৎবেলের ডিবে বের করে এগিয়ে ধরে বললে "নইস।"

নিই না, তবু কোনরকমে তাল কাটতে না দেওয়াই ভালো। হাতে একটু চুয়া-দেওয়া নস্য ঢেলে নিলাম—যদি হাঁচিই আসে, সে তা আর সত্যি কোন শুভকাজের গোড়ায় পড়ছে না। ফিরিয়ে দিতে টুনমুন ঝাও হাতে তর্জনীর টোকা মেরে মেরে একটু ঢালতে ঢালতে বললে—"নিয়ে গেলেও চলে,···তবে কথা হচ্ছে তাতে টাকাটা লাগবে বেশি···অত দূরে—বিশেষ করে বাঙলায় টপ্ করে পাঠাতে চায় না মেয়ে।···পাঠাবে—তেমন পার্টিও আছে আমার হাতে···তবে ঐ যা বললাম···"

তারপর বেশ সশব্দে দু' টিপ্ দু' নাকে গুঁজে দিয়ে হাতটা ঝেড়ে নিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়েই বললে—"আমি বলি কি—ও চলেই আসুন, কী পড়ে আছেন বাঙলা মুলুকে?—অণ্ডা খায়, মাথায় টিকি রাখে না।···হ্যাঁ, কি যে বলে—ওটা কিন্তু আপনাকে···মানে টিকির কথা বলছি আর কি···"

—আমার মাথার ব্রহ্মতল থেকে নজরটি নামিয়ে একটু হাসলে।

পাগটা না নামালেই হোত, তাড়াতাড়িতে অতটা খেয়াল হয়নি। একটু লজ্জার ভাণ করতে হোল, মুখটা নিচু করে বললাম—"ওটা রেখে নিলেই হবে…"

"তার জন্যে আটকাবে না, সত্য সত্যই যদি একটা যোগাযোগ হয় তো মাঝখানটা ছেড়ে চারিদিকটা ক্ষুর বুলিয়ে দিলেই হবে। আজই হতে পারে—এখুনি—নাপতে ঐ তো বসেই রয়েছে—একটু বেড়াটার ওধারে গিয়ে…আমি বলি কি—খুঁৎটা আর রেখে কাজ কি?…ডাকি?"

বললাম—"এত তাড়াহুড়ো কেন?…ও তো হাতের পাঁচ।"

"একটু আছে তাড়াহুড়ো; আপনার সে দিকটায় খেয়াল হয়নি, সেখানে বাঙলা মুলুকে সবই টিকি-কাটা, কাজেই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল তো। আপনি এখন খাস মিথিলায়—সারকি-পাণ্ডুল-লেহরা-দুলারপুর—এসব আবার এমন জায়গা—যদি দেখে একজন মৈথিল অথচ মাথায় টিকি নেই…আপনি কংগ্রেসী না সোসালিস্ট?"

উত্তর পাবার অপেক্ষা না করেই বলে চলল—"যাই হোন্, পার নেই। যদি কংগ্রেসীরা আগে দেখে তো সোসালিস্ট বলে ধরে নিয়ে জাতধর্ম সব একাকার করলে বলে হৈচৈ তুলে একটা কাণ্ড করবে। যদি ধরুন আগে কোনও সোসালিস্ট দেখে ফেলে তো আরও খারাপ—কংগ্রেসীরা সাকুলার ইস্‌টেট্ করে টিকি-পৈতে সব জলাঞ্জলি দিলে বলে আপনাকে মাঝখানে রেখে ঝণ্ডা-পতাকা নিয়ে এখুনি এক লম্বা জুলুস্ বের করে দেবে। ভয়ানক ঝগড়া দু' পার্টিতে কিনা, খালি ছুতো খুঁজছে কি করে এ ওকে জনতার কাছে বদনাম করে নিজের খাতির জমাবে।…কি বলেন, ডাকি হাজামটাকে?"

রীতিমতো ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে যে! আসল কারণ অবশ্য অনুমান করছি—সৌরাঠ মেলায় সময় চারিদিকেই পাঁজিয়াররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোঁ মেরে নেবার জন্যে, তাড়াতাড়ি কোনও কন্যাপক্ষকে দেখিয়ে শুনিয়ে আমায় গেঁথে ফেলতে চায়। বললাম—"তেমন বেগতিক দেখি, বলে দিলেই হবে আমি বাঙালী। তাদের তো ও বালাই-ই নেই, এদিকে বাঙলা তো জানিই।"

—একটু চাতুরালির হাসি হাসলাম।

"তা অবশ্য হয়…"

একটু মিয়ে যাবার মুখে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। "হয় তা…তখনটা সামলে গেল। কিন্তু ভেবে দেখুন না, দু'দিন বাদে কাছাকাছি এইখানেই তো কোথাও বিবাহ করছেন—ফেলবেই দেখে কেউ না কেউ, তখন—"

হেসে বললাম—"বিয়ের শোভাযাত্রাটা না হয় আরও গুলজার করে হবে, পয়সা তো লাগছে না।…কিন্তু সে ভাবনা থাক্, আসল কথারই তো এখন কিছু হোল না। বিয়ে দেওয়াবেন বলছেন—পাত্রী কৈ? মেয়ে কি এখন কেউ দিতে চাইবে আমায়?"

"চাইবে না! কত পাত্রী চান আপনি? ·আমার নাম টুনমুন পাঁজিয়ার! আপনি তো শিশু—সাতাত্তর বছরের বুড়োর হাতে মেয়ে সম্প্রদান করিয়েছি আমি—অবিশ্যি এ-পানিতে নয়, নেপালে, হিন্দুস্থটা সেখানে তো এরকম একেবারে লোপ পায়নি—তবে এ-পানিতেও যে হাত গুটিয়ে বসে আছি এমন নয়—পঞ্চাশ থেকে ওপরে যারই পাত্রীর দরকার টুনমুন ঝাকে অস্মরণ করতে হবে, আপনি বাইরের লোক তাই জানে না—এই বছরই দিলাম পদুমঠাকুরের বিয়ে—তেষট্টি বছর, বিলটু ঝা উনষাট—পুরনো 'ঘর' মজুদ এখনও, পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে, বৌ, নাতি, জামাই· ·একটা শখ হোল—কাক-কোকিলেও টের পেলে না, একদিন বৈদ্যনাথধাম যাচ্ছি বলে একটা চাকর সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়ল বুড়োউ, পাঁচদিন পরে ঘর-আলো করা এক তুলহীন নিয়ে হাজির।··ভেতরে এই টুনমুন পাঁজিয়ার!"

—লোভ লাগিয়ে দেয় বৈকি। প্রশ্ন করলাম—"কি রকম বয়েসের তুলহীন্ হবে?"

"কি রকম চান আপনি?…এই-এই-এই-এই-এই-এই· ·"

—হাঁটুর কাছে থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে তুলে নিজের কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে গেল হাতটা, দু' বছরের থেকে নিয়ে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত ক'নের এক লম্বা ফিরিস্তি।…অত দুঃখেও পেটে হাসি গুড়্গুড়িয়ে উঠছে; বোধহয় পারতাম না সামলাতে, তবে এই সময় পাগুল স্কুলের একজন পুরাতন

শিক্ষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তিনি নমস্কার করতে করতে এগিয়ে এলেন—

"এই যে, আপনি এখানে—হঠাৎ!…উঃ, এতদিন পরে দেখা হোল! জন্মভূমি একেবারে ভুলে গেছেন…"

ঢুনমুন ঝা নিঃসাড়ে সরে যেতে যেতে একবার ফিরে চাইলে।

বললাম—"আপনি যতটা উল্লসিত আমি কিন্তু তার সিকিভাগও হতে পারছি না, বরং উল্ট একেবারে…"

"কি রকম?"

"একটা মস্ত বড় চান্স্ নষ্ট করলেন আপনি—বুড়ো বয়সের সম্বল; বিয়ে—প্রায় দুহাত এক করে এনেছিল…ঐ যে, যাচ্ছে…"

বন্ধু হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন—"ঢুনমুন ঝার কবলে পড়েছিলেন বুঝি? উঃ কত বড সয়তান! হোন বাঙালী, আপনাকেও ঠিক ঝুলিয়ে দিত, টেরও পেতেন না কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।… বছরে অন্তত বার দুই করে ওর ঘরে আগুন তো দিচ্ছেই লোকেরা, তবু…"

বন্ধুর বিস্মিত মুখের পানে চেয়ে বললাম—"ঢুনমুন তবু তো লাভেই যাচ্ছে,—অন্তত গোটা কুড়ি-পঁচিশ ঘরে আগুন তো লাগাচ্ছে প্রতি বছর… এদেরই কারুর না কারুর ঘর তো…"

—আবার যে দুজনেই হেসে উঠলাম সেটা নিশ্চয় এইজন্যে যে, বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় মনের উল্লাসটি সবকিছুকেই হাল্কা ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছে।

লছমী আরদালী এসে দাঁড়াল।

"হুজুর, মধুবনী লাইনের সিকন্দর ডাউন।"

সাকরি স্টেশনের ঠিক বাইরেই পাঁচ-সাত গজের ছোট পুল, তারই ওপর দিয়ে আমাদের গাড়িটা ইয়ার্ডে এসে ঢুকল তখন। নিচে দিয়ে একটি ঐ অনুপাতের ছোট্ট স্রোত, ঘোলাটে জল নেমেছে, তবে নিতান্তই নিরীহ, আশে পাশে যে এমন সমারোহ কাণ্ড চলেছে তার একেবারেই খোঁজ রাখে না, দুধারের ঘাসে-ঢাকা ঢালু তীর চেপে চিনির কলের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। 'সমারোহ কাণ্ডের' আরও বেশ কিছুদূর পর্যন্তই কোন চিহ্ন বা পরিচয় নেই।

সাকরি ছেড়ে একটা পাইল-ব্রিজের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলল এগিয়ে, নিচে চরের জল স্থির, স্বচ্ছ, জায়গায় জায়গায় ঘন কলমীলতায় ঢাকা, নতুন বৃষ্টির জলে লকলকিয়ে উঠেছে, নীল ফুলের রাশি ঝিরঝির হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দুধারে ধানের ক্ষেত, যেখানে ঘর-বাগান-খামার নেই, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ধানের ঢেউ লুটিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে একটা বড় গ্রামের আদল যায় দেখা—দূরে দূরে—ক্ষেত-আমবাগান, পুকুরের পাড়, তার মধ্যে আধঢাকা বাড়ি, কোথাও একটা মন্দিরের চূড়ো আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে—ধানের ক্ষেতের মধ্যে আধডোবা হয়ে ঘাড়ের ওপর সুস্পষ্ট ককুদটি দোলাতে দোলাতে চলেছেন এক বলিবর্দ—গম্ভীর, নিস্পৃহ, নির্বিকার; শিবের বাহন চলেছেন কি স্বয়ং শিবই, বোঝা দায়।

প্রায় মাইল পনের আমরা দুধারে এইরকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এলাম বেরিয়ে, দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ মাইল—মণিগাছি, লোহনা রোড, ঝঞ্ঝারপুর। সাকরি থেকে যতই ভেতরের দিকে আসছি, চারিদিকের সবুজ ততই গাঢ়, ধানের গোছ-বাঁধা দেখলে চাষার চোখের নিদ ছুটে যায়, এক এক জায়গায় সবুজ রংটা যেন গাঢ় নীলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশে একটা হাল্‌কা মেঘ রয়েছে নেবড়ে; এদিকে ভারী ইঞ্জিন দেয় না, গাড়ি আমাদের চলেছে ধিকির ধিকির ক'রে, শান্ত মধ্যাহ্নে চোখে যেন সবুজ সিদ্ধির নেশা ঘনিয়ে আসছে আমাদের। এখনও আমরা দ্বারভাঙ্গা জেলাতেই।

তামোরিয়ার পর থেকে একটা পরিবর্তন এল; কুশীর সূচনা, কিন্তু কুশী যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসছে। দুই বোনের ছেলেবেলার খেলা মনে পড়ে গেল নাকি? পা টিপে-টিপে এসে একেবারে চোখ চেপে ধরবে?—"কে বল্‌তো—দেখি, কেমন পারিস!"···পা টিপেটিপেই আসছে কুশী। তামোরিয়ার পর থেকে লাইনের দুধারেই জল, প্রথমটা স্বচ্ছ কালো জলই, তারপর অল্প ঘোলাটে—বেশ বোঝা যায় বর্ষায় যে জলটা নেমেছে চারিদিকে, অন্য একটা জলের চাপ সেটাকে ঠেলে ঠেলে যেন সামনে নিয়ে আসছে। বন্যাই, মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে, পুকুর ভাসিয়ে এগিয়ে আসছে জল, কিন্তু বন্যার জলও নয়, সে তোড়ও নেই কোথাও। এ যেন আরও অস্বস্তি জাগায় মনে, একটা যেন

প্রবঞ্চনা চলছে। ভেতরে ভেতরে, একটা চাপা ষড়যন্ত্র।…লোকদের মুখেও একটা চাপা আতঙ্ক; তেমনি কিছু নেই, হয়তো একটু ভয় দেখানো খেলা। খেলে ফিরেও যেতে পারে কুশী…

চিক্‌না হণ্টে গিয়ে সে-আতঙ্কটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, অর্থাৎ প্রায় মাইল চার-পাঁচ পরে।

কুশী এসে গেছে, এদিককার লোকেরা ওর জলও চেনে। স্টেশনের দুধারেই গ্রাম, রাস্তা ঘাট সব ডুবে গেছে গেরুয়া জলে, নামাল জমির বাড়িও, যেখানটা উঁচু, লোকেরা জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে জড়ো করছে,—ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই গেছে লেগে; চালা খুলে নিয়ে এসে তুলছেও জায়গায় জায়গায়। কুশী তো একলা নয়, বর্ষার আকাশও তো রয়েছে সঙ্গে। জল ঠেলে রেলের বাঁধেও লোকেরা আসছে উঠে। একটা উঁচু পোতায় কতকগুলো গোরু-মহিষ হয়েছে জড়ো, মাথা ঘুরিয়ে অসহায়ভাবে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—এ কি কাণ্ড! ঘাস কোথায়!

গাড়ি আসতে দেখেই স্টেশনে লোক জড়ো হয়েছে, জেলা শহর থেকে অফিসার আসতে পারে, অবস্থা জানাবে, রিলিফ্ চাইবে। ফার্স্ট ক্লাসে সত্যিই অফিসার জাতীয় লোক দেখে ভিড় চাপ বেঁধে উঠল। অন্য জেলার অফিসার শুনে মুখে একটা নিরাশার ছায়া পড়েছে।…এঁরা কবে আসবেন? আমাদের কর্তারা? সব ডুবে গেল?…যতটা সম্ভব ভরসা দিলে মণি, রবিবাবুও দিলেন। কিন্তু কেমন যেন বিশ্বাস হারিয়েছে—স্বাধীনতা তো হোল, এখন যে কাছে এসেও একবার দাঁড়ায় না…

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা, এদের কথা নয়, একেবারে দিল্লীর কথা।… কোথায় গেল কুশী প্রজেক্ট, কোথায় গেল কি?—খালি টুর আর লেকচার! বেচারা চুনোপুঁটিদের টুর আর লেকচারে ঘেন্না যদি নাই ধরে থাকে, লজ্জা তো এসে পড়তে পারে, কোন্ মুখে এসে দাঁড়াবে?…সর্বনাশ আর সর্বনাশ! শুধু দিল্লীর রাজপথ বেয়ে চলেছে চোখ-ধাঁধান প্রসেশনের স্রোত—একটার ঘাড়ে একটা—অল এশিয়াটিক--ইণ্টারন্যাশনাল—ভারতের এখন নিজের কথা ভাবতে গেলে চলে?—হতভাগিনী এশিয়ার লীডারশিপ তাহলে নেয় কে?

কে তাহলে পৃথিবীকে আধ্যাত্মিকতার বাণী শোনাবে?…বুদ্ধ-অশোকের দেশ নয়?…মিথিলা আবার আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ছিল না?—এটুকু সবুর নেই?—ছিঃ!

গাড়িটা ছেড়ে দিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল যেন। কার অপরাধের কে প্রায়শ্চিত্ত করছিল।

এই ভাবটা বেড়েই চলেছে ঘোঘোড্ডিহা পর্যন্ত। জল হয়ে উঠেছে আরও গৈরিক; বাঁদিকে, অর্থাৎ রেলবাঁধের উত্তরে ছাপাছাপি জল। সেটা তো স্বাভাবিকই, কিন্তু দক্ষিণে এত জল এল কোথা থেকে সেই নিয়ে গবেষণা, কেননা এর মধ্যে তেমন কোন পুলও তো পাওয়া গেল না যাতে বাঁয়ের জল ডাইনে এসে পড়তে পারে।

রবিবাবুর এ-অঞ্চল দেখা ভালো করে, বছর দুই দ্বারভাঙ্গাতেও কুশী-রিলিফ অফিসার হয়েছিলেন যে, বলছেন—কুশী তার রণনীতি বদলেছে—ঘোঘোড্ডিহা থেকে খানিক আগে পযন্ত উঁচু জমি, বেগতিক দেখে কুশী ওটা ঘুরে এড়িয়ে চলে এসেছে, রণনীতিতে যাকে আজকাল বলা হচ্ছে বাই-পাস (bye-pass) করে আসা। দাঁড়ালও তাই। তামোরিয়া থেকে নিয়ে ঘোঘোড্ডিহা পর্যন্ত জল পড়েছে ছড়িয়ে—ঘোঘোড্ডিহা গ্রামটা একেবারে জলমগ্ন, কিন্তু স্টেশন থেকে আর একটু এগিয়েই আর কোথাও কিছু নেই, কোথায় যেন জহ্নু মুনি ছিলেন বসে, তপঃবিঘ্ন হতে কুশীকেও গণ্ডুষে নিঃশেষ করে নিয়েছেন।…আবার সেই নিশ্চিন্ত গ্রাম, সবুজ ক্ষেত, খামার, পুকুর, বাগান। জলের চিন্তা নেই; শুকনো ডাঙার জানোয়ারদের তাড়াবার জন্যে বাঁশের ফ্যাটায় ছেঁড়া কুর্তা আর কেলে হাঁড়ি টাঙিয়ে রেখেছে গেরস্ত; চিরকালের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন মানুষের।

মাইল কতক পরে আবার রূপান্তর, সবুজের সীমানাটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ এলোমেলো রেখার পেছনে পড়ে গেল, আমরা খাস কুশীর এলাকায় এসে পড়েছি।

কুশীর জলময় রূপ দেখলাম। হ্যাঁ, এই নদীই সেই মরুভূমি সৃষ্টি করবার

ক্ষমতা রাখতে পারে, গণপৎগঞ্জে যেতে যা দেখলাম সেদিন। সেইরকমই একটা মরু,*শুধু বালির জায়গায় জল—অনন্ত জল, ডাইনে বাঁয়ে, সামনে—তেমনি দিকরেখায় বহু দূরে দূরে চার পাঁচটি কালো বিন্দু—তালগাছের মাথা, কাছে এখানে-ওখানে গোটাকতক দ্বীপ, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে নির্মাল্লীর সামনে, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে; এছাড়া কোথাও দু পাঁচখানা চালাঘরের মাথা, কোথাও কাশবনের সবুজ তালি, কোথাও এক সঙ্গে গোটাকতক গাছ, কোথাও কাঁচা কোথাও আবার শুকনো—কুশী যে কয়েক বছর থেকেই এখানে এসে আড্ডা গেড়েছে।

এছাড়া সবই জল। অনন্ত প্রসারে সাগরের ধর্ম পেয়েছে জল,—খুব বেশি হাওয়া নেই—তবু কোথা থেকে বড় বড় ঢেউ উঠছে লাফিয়ে, রেল-বাঁধের যে সরু ফালিটা মাঝখান দিয়ে গেছে এগিয়ে, দুধার থেকে তার ওপর এসে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, সমুদ্রের ফেনা গাঁজিয়ে উঠে পাশে পাশে দুটো শাদা রেখা গেছে জমে।···নাঃ, কুশী আর যা-ই হোক না হোক আর্টিস্ট বই কি—সেন্স অব এফেক্ট টনটনে একেবারে, ঠিক ক্লাইম্যাক্সের মুখে ঘোঘোড্ডিহার ও-কয়েকটি মাইল সবুজ ছেড়ে দিয়ে এমন হুড়মুড়িয়ে এসে দাঁড়াল নিজের পূর্ণরূপে···যে-সে আর্টিস্ট নয়, স্টার আর্টিস্ট একেবারে।

মনে মনে প্রণাম করে বললাম—আমি তোমায় দেখতে এলাম সুন্দরী। এন্‌কোয়ারি, রিলিফ—এসব ওদের ধৃষ্টতা, একটু অপাঙ্গে হেসে নিয়ে মার্জনা কোর। আমি এসেছি দেখতেই, এসেছি ভৈরবের তীর্থযাত্রায়; দেখবার মতন বৈকি, সে-যাত্রা আমার সার্থক হয়ে আসছে।

সমের মাথায় কিন্তু তাল কেটে গেল। বেশ আসছিল গাড়িটা একটানা, আমাদের (অন্তত আমার) উদ্বেগ-আগ্রহকে চরমের দিকে ঠেলতে ঠেলতে, হঠাৎ হুইসিল দিতে দিতে আঘাটায় গেল থেমে। গলা বাড়িয়ে দেখি, পাখা পড়েনি।

বি এন ডব্লিউ'র লীলাক্ষেত্রে মানুষ হয়েছি, ওটা অভ্যাস আছে। পাখা এখানে পড়েই না বেশির ভাগ, অর্থাৎ যখন তার পরবার কথা, এবং তাই দিয়ে মনের অবস্থা যা দাঁড় করায়, রাগে নিরাশায়, তা' পারে মাত্র এক

পোষা কাকাতুয়া…গাড়ি আসবে, মাথাটি হেঁট করে দাঁড়াবে পাখা, নীরব স্নিগ্ধ অভ্যর্থনায়—এই জানি, এই আশা, এই নিয়ম ; কিন্তু প্রতিবারেই এর ব্যতিক্রম।…তুমি কাকাতুয়া পুষেছ 'রাধাকৃষ্ণ' শোনাবে বলে, কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ঝুঁটি খাড়া করে গলা ফুলিয়ে বললে…থাক্, সবাইকে তো শুনতেই হয়েছে কখন না কখন, কি বলে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মিলছে চৌধুরীদের বাড়িরটার সঙ্গে, সে বলত—ভাগাড়ে যাও ; একটা বুড়ি ঝির কাছে শিখেছিল।

সেই ভাগাড়ে ঝাড়া পনের মিনিট পড়ে থাকার পর, মনে হোল পরিস্থিতিটা কি একবার দেখা উচিত।

তিনজনেই শরীর এলিয়ে পড়েছিলাম, ও অবস্থায় পড়লে তুমিও তাই করতে, গলা বাড়িয়ে দেখি ব্যাপার যেন একটু বেশিরকম ঘোরালো। পাখা আছে দাঁড়িয়েই, নূতনত্বের মধ্যে প্রায় শ'চারেক গজ দূরে একটি বেশ বড় জটলা, গাড়ির লোকই নেমে গেছে ওখানে, অনেকে যাচ্ছেও, কিছু ফিরেও আসছে, মন্তব্যগুলো বেশ বোঝা যাচ্ছে না।

বেশি মাথা ঘামাবার আগেই দেখা গেল, লছমী আসছে হনহনিয়ে এগিয়ে, মুখটা গম্ভীর, থমথমে ; ওকে চিনি বলে খানিকটা বাদসাদ দিলেও বোঝা যায়, অবস্থা সত্যিই একটু গুরুতর। এসে উপস্থিত হোল।

"কি ব্যাপার ওখানে ?"

"ফিরে যেতে হবে হুজুর, পুলের চৌকিদার গাড়ি যেতে দেবে না। বললাম হাকিম রয়েছেন, বললে—লাট্‌সাহেব এলেও দেবে না পেরুতে—হাকিম তো কোন্ ছার।"

মণি ধমকে দিলে—"তুই হাকিমী ফলাতে গিয়েছিলি কেন ওখানে ? পুলের নীচে জল কি রকম ?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রবিবাবুকে বললে—"চলুন, দেখেই আসি, ও তো জটলা পাকাবারই চেষ্টা করবে, এমন স্থবিধে একটা।"

আমায় বললে থেকেই যেতে ; গাড়ি যায় ভালোই, নয় তো লছমীকে দিয়ে খবর পাঠাবে।

দরকার কি তার? আমিও সঙ্গ নিলাম। লছমী মনমরা হয়ে পেছনে আসছে, অত বাড়িয়ে চড়িয়েও মনিবকে থামাতে পারলে না, তার ওপর আবার সে নিজেই চলেছে; চৌকিদার কিছু লাটসাহেবের কথা মুখে এনেছে স্বীকার করবে না, বেচারাও একটু সময় পেলে না যে, দুটো সাক্ষী-টাক্ষী খাড়া করে।

হে কুশী মাঈ, আমি শুধু তোমার সুরে একটু সুর মেলাতে গিয়েছিলাম—একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট ঢুকব তোমার আঙিনায়, তাই; ত' একেবারে উল্টো বুঝলে?

ইঞ্জিনের ড্রাইভার ফিরছিল, মণি জিগ্যেস করলে—"কি রকম অবস্থা নদীর?"

উত্তর হোল—"পেরুনো যায় হুজুর, তবে গাড়ি ফিরতে পারবে না, জল বাড়তির দিকেই।"

"তাহলে আর কাজ নেই নিয়ে গিয়ে কি বল?"

"আমরাও তাই ভালো মনে করি, আমি আর পুলের চৌকিদার, আপনার আরদালি কিন্তু বলছিল····· "

"বলুক।"

লছমী টিলা দিয়ে পেছিয়েই পড়েছিল, লোক জোগাড় করে মালপত্রগুলো নিয়ে আসতে ব'লে দিল তাকে।

ছোট্ট নদী, কিন্তু একেবারে ক্ষ্যাপা নাম পেয়েছে ভূত্‌হা অর্থাৎ ভুতুড়ে বালান। এখন তো বর্ষা, ওর মেজাজ বোঝা দায়ই, অন্য সময়ও কখন কি মেজাজে থাকবে কেউ জানে না। বেশ শান্ত-শিষ্ট নদী, তরতর করে জল বয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোমর ডোবে, কোথাও বা আবার হাঁটুও নয়, গরু-বাছুর জল খাচ্ছে, মোষ গা ডুবিয়ে আছে পড়ে, ছেলেমেয়ের পাল ঝাঁপাই ঝুরছে, হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল—সামাল্, সামাল্, বালানে জল নেমেছে। তীর লক্ষ্য করে ছুটল সব—ছেলে মেয়ে, গোরু-বাছুর, মোষ, ছাগল, ওদিকে গ্রামের পরে গ্রাম ঘণ্টা চলেছে এগিয়ে, যে শুনলে, বুঝলে, পারলে উঠতে, বাঁচল; যে পারলে না, গেল একেবারে সাত-আট-দশ ফুট জলের মুখে ভেসে।···আবার বালান

শান্ত-শিষ্ট, স্নিগ্ধ···তোমার মোষ গেছে ভেসে? তোমার গোরু? তোমার ছাগলটা? একটা ছেলে?···কৈ, আমি তো কিছুই জানি না—এই তো জল আমার, তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, খুঁজে দেখো বরং।

মনে করছ ভাঁওতা দিচ্ছে বালান?—মোটেই না, বালানের ভূত ছেড়ে গেছে, কখন ঘাড়ে চেপে কি ঘটিয়ে গেছে, কি. করে জানবে বেচারি?

আমরা যখন পৌছুলাম, তখন নাকি ওরই মধ্যে জল আরো বেড়েছে, তবে পুল তখনও ডোবে নি; স্লিপারগুলো থেকে প্রায় আধ হাত নিচেই জল। সমস্ত নদীটুকু এ-তীর থেকে ও-তীর পর্যন্ত বোধ হয় বিশ গজও নয়, কিন্তু কী তোড়! মনে হচ্ছে যেন যে কোন মুহূর্তেই পুলটাকে দেবে উল্টে। হেঁটেই পেরিয়ে গেলাম, কিন্তু ঐটুকু যেতেই যেন ভির্মি লেগে যায়।

রবিবাবু কুশী ঘেঁটে পাকা হয়ে উঠেছেন, বলছেন—"এইরকম অবস্থায় মনে করতে হয় কিছুই নেই পায়ের নিচে, নার্ভটা তাহলে ঠিক থাকে।"

বললাম—"এর পর বলবেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলে মনে করতে হয় সব ঠিকই আছে।"

দুজনেই পড়েছেন থেমে, হাসিটা সেরে আবার এগুলেন। পুল পেরিয়ে আবার বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম আমরা। এখন পুলের ওপর জল নেই, কিন্তু উঠেছিল, বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তই কাদা প্যাচ প্যাচ করছে, মাঝে মাঝে জলও আছে আটকে। কখনও পাশ দিয়ে, কখনও কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে চলেছি আমরা, দুদিক থেকে মাঝে মাঝে কাশবন চেপে আসছে, বেশিদূর বিস্তৃত নয়, তবে সবুজ বলতে যা কিছু তা ঐ; ওর পরেই দুদিকে জল, একেবারে শেষে আকাশ এসে জলেরই ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মাথার ওপর দুপুরের রোদটা কড়া হয়ে উঠেছে। তা হোক, ভালো হোল এটুকু হাঁটতে পেয়ে, গাড়িতে আসতেও দেখছিলাম, কিন্তু মাথার ওপর ঐ আচ্ছাদনটা থেকে বিরাটকে খণ্ডিত করে দিচ্ছিল, সে যে সমগ্রতায় কতই বিরাট, কৈ আর পাই জানতে আমরা এমন করে? অন্তত সারাজীবনে কবারই বা?···ওরা দুজনে গেছে খানিকটা এগিয়ে—আমিই গতি ঢিমে করে দিয়ে একটু পেছিয়ে পড়লাম, ইচ্ছা করেই; নিঃসঙ্গ হলে

বিরাটকে যেন আরও ভালো করে যায় পাওয়া; ছাতাটাও নিলাম মুড়ে; ছোট হোক, কিন্তু অনেকখানি আকাশকেই তো রাখে আড়াল করে। একটা নতুন অনুভূতি, এটা আর কখনও হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না; মনে হচ্ছে এখনও যেন সেই বিরাটের সঙ্গে থেকে গেছে একটা ব্যবধান, নিজের এই দেহখানা নিয়ে। একেবারে তলিয়ে না গেলে এ অনন্তকে মেপে ওটবার যেন উপায়নেই।

ছাতাটাকে পাকিয়ে ছড়ি ক'রে নিয়েছি, বাঁধের ধারে এমনকি ব্যালাষ্ট্ ফুঁড়েও নানারকম ছোটছোট লতাগুল্ম, কোনটায় রংবেরঙের ফল, কোনোটায় বা নেই; একটির ওপর ছাতার বাঁটটা ঠেকে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ডাঁটা সুদ্ধ সমস্ত পাতাগুলি পড়ল নুয়ে। লজ্জাবতী লতা যে! লক্ষ্য করে দেখি চারিদিকেই ছোটবড় নানারকম ঝাড়ে রয়েছে লতিয়ে।

আশ্চর্যের মোটেই নয়, বনেরই জিনিস তো, তবুও বড় আশ্চর্য লাগছে। একটা বড় ঝাড়ের কাছে গিয়ে আলগা হাতটা বুলিয়ে দিতেই ঝুপ ঝুপ করে সবগুলি গেল নেতিয়ে।...একটা কেমন ছেলেমানুষী এসে গেছে, খুঁজে খুঁজে হাত বুলিয়ে চলেছি, লজ্জাবতীর ঝাড়ে গুটিয়ে পড়ার সাড়া পড়ে গেছে।... ওরা ঘুরে দেখে একটু ব্যস্ত হয়েই এগিয়ে আসছে—"কি হোল, হোঁচট লাগল নাকি?" চারিদিকে জল, সরীসৃপের দলও হন্যে হয়ে উঠেছে, হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে ওরা দুজনে; লজ্জা দিতে গিয়ে নিজেই লজ্জায় পড়ে গেছি, সহজ ভাবের চেয়েও বেশি করে সহজভাবে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম—"না, কিছু নয়, লজ্জাবতী লতা...হঠাৎ...এত!...তাই দেখছিলাম"।

—বেশ আশ্চর্য হয়ে গেছে দুজনে; লজ্জাবতী দেখে নয়, আমায় দেখে; তবে বলবে আর কি? নিশ্চয় ভাবলে বাক্যের অতীত; শুধু আশঙ্কাটুকু প্রকাশ করতে তার অতিরিক্ত যেটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ল—"জলে ডুবে গিয়ে চারিদিকেই সাপ, বিছে, গোসাপ, ওগুলোতে হাত দিও না ওরকম ক'রে।"

—একটা শিশুকে যেমন ভাবে বলতে হয়।

ছোট ভায়ের অভিভাবকত্বে মাথাটা হেঁট করে পেছনে পেছনে চলেছি, এমন লজ্জায়ও পড়তে হয়!—হাত বুলিয়ে বুলিয়ে লতাগুলোর অভিশাপ কুড়িয়ে এসেছি নাকি?—সত্ত সত্তই গেল ফলে?

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে আমরা স্টেশনে এসে উঠলাম, পাশেই নির্মাল্লী—আদ্রিয়াতিক সুন্দরী ভেনিস জলে ভাসছে।

অনেক নৌকো, দূরের পাল্লা দিতে নৌকো তো অপরিহার্যই ; সামনের ঐ বাড়িগুলোতে যেতেও, এমন কি যদি পাশের ঐ হালুয়াইয়ের দোকানটাতেও যেতে হয়, নৌকো চাই। আমাদের উঠতে হবে গিয়ে বাঁদিকে ঐ ধর্মশালাটায়, শ'খানেক গজ দূরে। আমাদের সামনের দিকে মাটি গেছে ফুরিয়ে, স্টেশনের ইয়ার্ডটুকু ও তার পরেই জল। একদিন এর পরেও বোধ হয় খান পাঁচেক স্টেশনের ওপর দিয়ে লাইন গিয়েছিল বেরিয়ে—একেবারে সেই সুপৌল পর্যন্ত ; এখন এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল শুধুই জল। ভাপ্‌টিয়াহি সহরটা নির্মাল্লীতে পালিয়ে এসে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছে ; 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নয়, প্রায় সবই ছেড়ে কোন রকমে প্রাণটুকু নিয়ে।

নৌকোয় গিয়ে উঠলাম আমরা ; লম্বা সালতি, মাথায় চাঁদোয়া খাটানো, যতটা সম্ভব ভদ্র ক'রে রাখিয়েছেন কুজ্‌রু সাহেব ; তিনিই স্পেশ্যাল অফিসার হয়ে আগে-ভাগে এসেছেন বন্যা তদারকে। মিনিট পাচেক দাঁড় ঠেলতেই আমরা গিয়ে ধর্মশালার উঠানে দাখিল হলাম।

চমৎকার বাড়িটি, দোতলা, বড় বড় ঘর, বড় বড় দোর-জানলা, টানা ছাত। মাড়োয়ারীদের বুকের জোর আছে, মাঠে জঙ্গলেও কলকাতা রচনার স্বপ্ন নিয়ে ফেরেন ; এ বাড়িটা ঠিক বড় বাজারের মাঝখানে না হোক, কাছাকাছি কোন রাস্তাতেই বেমানান হোত না। তোয়ের করেছেন শেঠ রংলাল বাজাজ।

বাড়িটা একটু দেখে শুনে নিয়ে নেমে গেলাম আবার, নৌকো করে একটু ঘুরে আসা যাক কাছে-পিঠে থেকে, রবিবাবুকে সাথী করে নেওয়া গেল। অত্যাচার সহ্য করেন শুধু নত মস্তকেই নয়, প্রসন্ন মুখেও ; এমন সব লোককে ছেড়ে আসতে কেমন যেন মন খুঁত খুঁত করে। জানই তো, বর্বরতার একদিকে থাকে দুর্বলতা, অর্থাৎ দুর্বলই বর্বরকে করে সৃষ্টি।

অবশ্য বেশি ঘোরা নয় এখন। আঁচ পাওয়া যাচ্ছে—রান্নাঘরে বেশ একটা চঞ্চলতা পড়ে গেছে। এটাও তো জান যে উদরই হচ্ছেন বর্বর-বর অর্থাৎ

সবচেয়ে বড় বর্বর। ক্ষুধার নামে তাঁর অত্যাচারের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। নৈলে এমন একটা জায়গাতেও তাঁর পরিচর্যার এত বাহুল্য !

নিঝুম পুরী। আমাদের ধর্মশালাটা বড় রাস্তারই ওপর, নৌকো চলাচল হচ্ছে, ঠোকাঠুকিও হচ্ছে, কিন্তু দোকানপাটে বিশেষ লোক নেই। একটা নির্জীব নিঝুম ভাব। নিচু বাড়িগুলোর ভেতর পর্যন্ত জল ঢুকে গেছে, লোক নেই; উঁচুগুলোতে যা দু-একজন আছে হাত পা মুড়ে আছে বসে; ক্বচিৎ একটু কেনা-বেচা। স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে আমরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ডাইনে ঘুরলাম, তারপর আবার উজান ঠেলে বড় রাস্তাটার পেছন দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। আরও কম বাড়ি, নিচু বলে আরও বেশি করে বন্যার কবলে, প্রায় সবই খালি; একটির বারান্দায় চৌকির ওপর একটি ছোট মেয়েকে কোলে করে একজন প্রৌঢ় চুপ করে আছে বসে, হয়তো সব সরিয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে, মুখে একটা ক্লান্ত, নির্লিপ্ত ভাব; ত্রস্ত নয়, সে ভাবটা কেটে গেছে। চিত্রশিল্পী হলে 'শেষ-খেয়া' নাম দিয়ে চমৎকার একটি ছবি আঁকা চলত ! খানিকটা এগিয়ে একটা বাড়িতে তখনও চলছে মালপত্র সরানোর কাজ, একটা নৌকো প্রায় বোঝাই হয়ে এসেছে, বাড়ি খালাস করছে দুটো ছেলেয়, একটা যেন স্ফূর্তি ব'লে ধরে নিয়েছে। বাঁচা গেল, চারদিকের গুমোটখানা যেন হাসিঠাট্টা বকাবকির দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। যৌবন-জয়তু; চিরায়ু হোক্ যৌবন।

রাস্তাটা ঘুরে আবার এসে পড়েছে বড় রাস্তায়। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়লাম আমরা, সেখান থেকে বাকি নির্মাল্লীর সমস্তটুকু এক নজরেই নেওয়া গেল সাপটে—ওখানে একটা কোঠা বাড়ি, হোথায় গোটাকতক চালা, আরও দূরে একটা মন্দির,. সব জলে ভাসছে, এক কোমর, এক বুক—উত্তরে এইতেই নির্মাল্লী গেল শেষ হয়ে। বড় রাস্তার যে দিকটা ধর্মশালা ( আমরা এসেছি উল্ট দিক দিয়ে ) সে দিকটায় বাড়ি কিছু বেশি, আঁকাবাঁকা গলিঘুচির ভেতর দিয়ে নৌকো নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দ্রষ্টব্যও তো সেই একই, আমরা আবার বড়

রাস্তার নালায় ঢুকে পড়লাম, কড়া স্রোত, বার কয়েক দাঁড় নামিয়ে দিতেই ধর্মশালার উঠোনে পৌঁছে গেল নৌকো।

বিকেলে আর সকালে ওদের অফিসিয়াল ট্যুরের ব্যবস্থা। ছই-দেওয়া একখানা বেশ বড় গভর্ণমেণ্টের খাস নৌকোয় আমরা চারজনে বেরিয়ে পড়লাম, দাঁড়ি মাঝি নিয়ে আরও পাঁচ জন। কুশীর জন্যে গভর্ণমেণ্টকে সারা বছর একখানি ছোটখাট নৌবাহিনী পুষতে হয়।

আমরা চলেছি উত্তরে, ঝিট্‌কা রোডের পাশ দিয়ে। জলে ডোবা রাস্তা, মাঝে মাত্র একটা জায়গায় একটু আছে জেগে, একটা লোহার পুল, একটা বাবলা গাছ, খানিকটা সবুজ ঘাস। নির্মাল্লী থেকে অনেক দূরে এসে গেছি তখন আমরা। দূরে শহরের বাড়িগুলো পড়ন্ত রোদে চিক চিক করছে, মাঝ সমুদ্রে চারিদিকেই জল তখন আমাদের, ঐটুকুই জমির ফালিতে—ঐ এক খামচা ঘাস আর একটি গাছেই এত পরমাত্মীয় বলে মনে হোল যে না নেমে পারলাম না। শুধু তাই নয়, নৌকো চলল পাশে পাশে, নেমে গিয়ে সমস্ত পথটুকু নিঃশেষ করে আবার গিয়ে নৌকোয় উঠলাম। আমাদের সামনে জিরৌল গ্রাম—অবশ্য অনেক দূরে এখনও—সেইটে লক্ষ্য করেই চলেছি আমরা। কুশী পরিক্রমার গল্প হচ্ছে—আরও যে সব ট্যুর করতে হয়েছে মণিদের, সেই সবের অভিজ্ঞতা। ওদের প্রেস্‌ট্যুর হোল সেবার, অর্থাৎ খবরের কাগজের একদল রিপোর্টারদের নিয়ে, গভর্ণমেণ্টেরই খাস ব্যবস্থায় ট্যুর। এই রকম খান চার নৌকোয় একটানা চারদিনের অভিযান; এই যে সেলাইয়ের ফোঁরের মতন ঝিট্‌কা রোড বেরিয়ে গেছে—বানের জলে ডুব গালতে গালতে—এটাকেই পাশে রেখে উত্তরে মহাদেব ঘাট পর্যন্ত, ভারতের সীমানা। তারপর আবার অন্য পথে নেমে বেরোল, একেবারে প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে দুটো জেলা নিয়ে, দ্বারভাঙ্গা আর সাহারসা……

প্রশ্ন করি—"দিনরাত নাকি।"

রবিবাবু অপাঙ্গে চাইলেন, কুজ্‌রুসাহেবও—এটুকু বাংলা বোঝা কিছু শক্ত নয়। অর্থটা বুঝি, যারা ভুগছে তারা ভুগছে, আমার যেন আর

আশা মেটে না ; রাতদিন নিচে জল আর মাথায় রোদ বৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় মানুষকে তা'হলে কাব্যটা জমে ভালো।...কথাগুলো কেমন যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল,—একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—"বলছিলাম দিনরাত যদি এইভাবে ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলেই তো চিত্তির!"

এলোমেলো গল্পের এই ক'রে মোড় ফিরে যাচ্ছে ; নব নবরূপে কুশী উঠেছে ফুটে।

না, কুশীপ্রাঙ্গণে ঘুরতে হলে সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবেই। রাত্রের কুশী আরও ভয়ঙ্কর। ওপরে জলের পলস্তরা, ভেতরে কি লুকিয়ে রেখেছে কুশী কে জানে? শুধু কি বাড়ি-মাঠ-খামারই ডুবিয়েছে?—কত নদীকেও যে করেছে উদরস্থ—ঐ ভূতে পাওয়া বালানের মতন নদীও ওর পেটে মরছে চক্কর খেয়ে—দাঁড় নামছে, তারপরেই অথৈ জলের হ'য়ে নৌকো বুঝি হয় বানচাল। আরও সব আছে স্থির প্রবঞ্চনার নিচে—ভূতের দলই—মরা গাছের গুঁড়ি—ফলন্ত গাছ হাহাকার করতে করতে বিদায় নিয়েছে মুক্ত আকাশের নিচে থেকে, হাহাকার সৃষ্টি করবার জন্যে আছে ওৎ পেতে—অন্ধকারের একটু অসতর্কতায় জলের কবর থেকে অট্টহাস উঠবে আকাশ মথিত করে—মরা গাছের কঙ্কাল নৌকোর তলা দিয়েছে ফাঁসিয়ে।

না, সন্ধ্যার আগে আশ্রয় একটা নিতেই হবে খুঁজে। কুশী তো নদী নয়, কুশী হচ্ছে বন্যা।

যখন নয় বন্যা তখনও ও ভয়ঙ্করীই। সহস্র ধারায় ওর সহস্র বৈচিত্র্য, ওকে চিনেছি বলে দম্ভ করতে যেও না, যেখানে ওর ধার ক্ষীণ সেইখানেই হয়তো ওর অস্ত্র বেশি শাণিত। সেবারে মনোহরপুরে তো তাই হোল (মণি গল্প করছে)—আর হোলও যেন অস্ত্রে-অস্ত্রেই সংঘর্ষ।...আট-দশ জন সশস্ত্র পুলিস—কাঁধে বন্দুক, পিঠে হ্যাপস্যাক; ছোট্ট স্রোতটা, মাল্লার বারণ ওরা শুনবে না, যাবেই...

"এ আবার একটা নদী—ছোঃ! লাফ দিলেই তো ওপার..."

মাঝখানে পৌঁছুবার আগেই নৌকো একেবারে উলটে পালটে দিলে তলিয়ে—তিনজনের আর খোঁজই পাওয়া গেল না।

সারণপট্টিতে—যেখানে তরাইয়ের ঢালু বেয়ে কুশী এসে নামল ভারত সীমানায় তিনটি ছোট ধারা এক হয়ে, মাল্লারা আগে 'মাঈ'র পায়ে ফুল-দূর্বা আলোচাল ভাসিয়ে তারপর নৌকোর কাছি খোলে। অথচ কতটুকুই বা? শ'দুয়েক গজ; এপার-ওপার আলাপ চলছে, মাঝখানে মৃত্যু।

অথচ এই মানুষই আবার জয়ীও—তার মায়া নিয়ে, তার মর্যাদা নিয়ে, তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে এই মানুষই চরম বিজয়ী; He laughs last.

কুশী জয়ী হয়ে গিয়েও, নিজের অন্ধ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেও শেষ পর্যন্ত সত্যিই হয়ে থাকে যেন তপস্বীর করতলে একগণ্ডুষ জল মাত্র—

—গ্রামের — ঝার কথা বলছিল মণি। গ্রাম নাম দুটোই কেন গুপ্ত রাখলাম সমস্তটুকু পড়লেই টের পাওয়া যাবে।—

এখান থেকে আরও উত্তরে অর্থাৎ কুশীর দাপট সেখানে আরও বেশি। বন্যারও তখন তেজ বেশি, মাত্র বছর তিন চার এদিকে এসেছে কুশী। পরিদর্শনে গিয়ে একটা বাড়ির দিকে নজর পড়ল বেশি করে। গ্রামের আর সব বাড়ি থেকে একটু আলাদা, শুকোর সময় হয়তো অতটা আলাদা মনে হতো না, বন্যায় মাঝখান দিয়ে একটা খরধার স্রোত বইয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অতি সামান্য গৃহস্থ বলে মনে হোল; খান তিনেক ঘর, সবগুলোই মেটে, সামনেরটা ঠিক ঘর নয়, এখানে ওসারা বলে, তিন দিকে দেয়াল, সামনেটা খোলা; বারান্দাই বলা চলে, তবে বারান্দার চেয়ে একটু গভীর বেশি।

একটি প্রৌঢ় একখানা চৌকির ওপর বসেছিলেন, পাশে একটা উলঙ্গ শিশু, কোমরে একটা ঘুনসি, গলায় নকল প্রবালের মালা; একটা ঢিল লুফে লুফে খেলা করছে।

মণিরা এসেছিল গ্রামে রিলিফ দিতে, কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছে—চাল, ডাল, টাকা, জ্বালানি, ঔষধপত্র বিলি করে ওরা বেরিয়ে আসছিল গ্রামান্তরে যাবার জন্যে, বারান্দায় লোকটির ওপর নজর

পড়ল। মণি তদারক করছিল, সুতরাং যারা এসেছিল রিলিফ নিতে তাদের সবাইকেই দেখেছে, কিন্তু মনে হোল এ লোকটি কৈ ছিল না তো। ভিড়ে ভুল হবার নয় বলে হোল এইরকম মনে। শীর্ণ, কিন্তু প্রখর গৌরকান্তি, তা ভিন্ন মুখে চাপদাড়ি, যা এদিকে বিরল, যারা একটু বেশি রকম দেবী-আরাধক তারাই রাখে ক্বচিৎ, অর্থাৎ ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতন চেহারা নয়।

বাড়িটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি করে। মাঝখান দিয়ে যে স্রোতটা যাচ্ছে সেটা বেশি এদিক-ঘেঁষেই। বাড়িটার উঠোনে জল বেশ উঁচু হয়েই ঢুকছে; ঘরগুলোর মেঝে কত উঁচু এদিক থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে ভেতরের প্রকৃত অবস্থা কি বোঝা যায় না বটে, তবে বাইরে থেকে যেমন ভাবে দেয়াল চেপে চলেছে স্রোত, অবস্থা যে ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে এটা বেশ বোঝা যায়। অথচ লোকটা যে নিতে চায় নি রিলিফ এটা ঠিকই; সহকারীদের জিগ্যেস করতে তারাও ঐ কথাই বললে। নৌকোটা ওসারায় ভিড়োতে বললে মণি।

লোকটি নির্বিকার কৌতূহলে এতক্ষণ চেয়ে ছিলেন নৌকোর দিকে, এগুচ্ছে দেখে চৌকি থেকে নেমে দাঁড়ালেন, জল ওসারা থেকে আধহাতও আর নেই নিচে, বাড়ছেও হু হু করে।

নৌকো থেকেই কথাবার্তা আরম্ভ হোল—

"আমরা আপনাদের গ্রামে এসেছিলাম…"

"গ্রামের সৌভাগ্য, কিন্তু অবস্থা যা…আমিও যে সাহস ক'রে ডেকে বসাব…আপনাদের মতন বিশিষ্ট অভ্যাগত…"

"খারাপ অবস্থা ব'লেই তো আমরা এসেছি—রিলিফের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু কৈ আপনাকে তো দেখলাম না ওখানে—অথচ…"

"আজ্ঞে, আপনারা আসবেন শুনেছিলাম—গ্রামে এসেছেন জেলার হাকিম—উচিত ছিল গিয়ে সেলাম দেওয়া—কিন্তু…দেখতেই তো পাচ্ছেন…"

—খুব লজ্জিত, অনুতপ্ত; কিন্তু তার চেয়েও যা বড় কথা—যে নিতান্ত সহজ প্রশ্নটা উঠবে, সেটা যেন প্রাণপণে আটকে রাখবার চেষ্টা করছেন, অবান্তর কথা এনে ফেলে।

রিলিফ নেবার হুড়োহুড়ির মধ্যে সত্য আছে যথেষ্টই, কিন্তু মিথ্যা যা তাও একটা বন্যার মতনই বিপুল, এর মধ্যে লোকটির ভাবভঙ্গী বড় অভিনব বলে বোধ হোল। অথচ লোকটা অজ্ঞ নয়; একেবারে দূর পল্লীতে হাকিম-হুকুম সম্বন্ধে অনেকের একটা ভয়ও থাকে, তাও নেই; লছমী সম্ভ্রম আদায় করবার জন্যে পরিচয় দিলেও বিশিষ্ট অভ্যাগতের প্রতি ভদ্রতায় হাতদুটি যে যুক্ত করা ছিল, তার মধ্যেই সম্ভ্রমকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন, তুলে কপালে একবার ঠেকালেন না।

মণি নৌকো থেকে নেমে ওসারায় উঠল; আর গৌরচন্দ্রিকা না করে চৌকিটাতে বসে পড়ে বললে—"কিন্তু আমি বলছিলাম অন্য কথা পণ্ডিতজী, যেমন দেখছি, আপনি বেশ বিপন্ন, একটু আলাদা পড়ে গিয়ে আরও বেশি বিপন্ন, অথচ রিলিফ নিতে তো যান নি···"

শুধু একটা অপ্রতিভ ভাব, তারই মধ্যে একবার নৌকোটার দিকে চাইলে; কিন্তু কিছু জবাব পাওয়া গেল না।

"বাড়িতে কে কে আছেন? ঘরগুলোর অবস্থা কি?"

"আছে আমার স্ত্রী, দুটি কন্যা···এর বোন। একটা ঘরে এখনও জল ঢোকেনি, তাইতেই চালাচ্ছি কোনরকমে।"

"এই ওসারাটার মতন?"

"এ তো ডুবল বলে।"

আসল কথাটা যখন এসে পড়ে, একটু শুধু অপ্রতিভভাবে হাসেন। এবারেও সেই সঙ্গে নৌকোটার দিকে একটু চাইলেন।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ঝাঁকড়া আম গাছ, মণি মাঝিকে বললে নৌকোটা নিয়ে গিয়ে তার ছায়ায় অপেক্ষা করতে। গাছটা একটু পেছনের দিকে, নৌকোটা ওসারার একটা দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেল।

আর তো উত্তর দেওয়ার বাধা নেই; লোকটি এবার যেন একটু বিব্রত হয়েই হাসলেন, বললেন—"হুজুর, ভিটে ছেড়ে কোথায় যাই?—সেই কথাই বলছিলাম।"

"এ কথাটা তো আপনার মানাচ্ছে না, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে আপনাকে।"

"পাণ্ডিত্যে কোন দাবী নেই; তবে এ কথাটা নিশ্চয় স্বীকার করতে হয় যে অবস্থা আরও জড়বুদ্ধি করে তুলেছে; সাত পুরুষের ভিটে—বোধহয় আরও বেশি, হিসেব আছে কি?…"

মণি একটু হতবাক হয়ে গেছে দেখে আবার হেসেই বললে—"আপনার বলবার উদ্দেশ্যটাও মেনে নিচ্ছি হুজুর, শুধু মেনে নেওয়া নয়, সেইটেই যে বড় কথা তাও স্বীকার করতে হয় বৈকি,—মাটির মায়াই বড় হবে আর পরিবারস্থ এতগুলির প্রাণ কিছু নয়?—কিন্তু উপায় কি বলুন? গ্রামের অবস্থা তো আপনি দেখে এলেন।"

"তবু এখানের চেয়ে কিছু ভালো।…কেউ আসে নি ডাকতে আপনাদের?"

"এসেছিল। তার মধ্যে যাঁদের ওখানে যাওয়া চলে তাঁদের একেবারে জায়গা নেই—মনে জায়গা থাকলেই তো হবে না হুজুর,—আর যাঁদের হয়তো জায়গা আছে—অবস্থা ভালো—উঁচু ভিৎ—তাঁদের ওখানে…"

সেই রকম অপ্রতিভ হাসি নিয়ে আবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবেই কেটে গেল, তারপর মণি প্রশ্ন করলে—"তাঁদের ওখানে কি?…ডাকেন নি তাঁরা?…কিন্তু আপনি চলুন, আমি তাঁদের জায়গা দিতে বাধ্য করতে পারি, আমার অবর্তমানে যাতে কোন রকম অন্যায় না হয় তার জন্যে আমি লোকও রেখে যেতে পারি…আপনার কোনও ভয়…।"

লোকটি সামনে বসেছিলেন, মণির হঠাৎ ভাবান্তর দেখে শশব্যস্ত হয়ে করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"না হুজুর, সে কি কথা! পাঠকজী আর মিশিরজী দুজনেই অতি ভদ্র—এসেছিলেন, যেতে বলেছেন, লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছেন—আপনি তাঁদের সম্বন্ধে ও ধারণা মোটেই স্থান দেবেন না মনে। আমি যেতে পারছি না—মানে: যাবার উপায় নেই—মানে—কথাটা হচ্ছে…"

"কি বলুন।"

"হুজুর আমায় লজ্জায় ফেলছেন।···কথাটা হচ্ছে ওঁদের সঙ্গে আমার অবস্থার এতই প্রভেদ যে, এ সময় পরিবার নিয়ে ওঁদের ওখানে গিয়ে ওঠা···"

"তাতে হয়েছে কি ?"

"আমি এখন নিতান্তই দুঃস্থ হুজুর।···আপনি জেলার মালিক, সবার অভিভাবক—মনের অবস্থা বুঝে, যাতে সবার সামনে লজ্জায় না পড়তে হয় সেই জন্যে যেভাবে নৌকোটা সরিয়ে দিলেন তাই থেকেই বোঝা যায় আপনি গরীবের দরদ বুঝেন—আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই—রান্নার পাট উঠে গেছে বাড়িতে—শুধু এক মুঠো করে চিঁড়ে ভিজিয়ে···তাও কুশীর যদি সেইরকমই মনে থাকে···"

ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

ছেলেটি বলে উঠল—"বাবুজী, অংনা।"

—ওইতেই সামলে গেল। ছেলেটিব পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—"হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি আংনায়। বুচ্চি, হাকিম এসেছেন আমাদেব বাড়িতে, নমস্কার করো। আব, শ্লোক শোনাবে না? দেবী স্তোত্র—যা দেবী সর্বভূতেষু···"

"যা দেবী দৃব্ববুতেষু লজ্জালুপেন ছংস্তিতা···

নমছ্ তচ্ছে নমছ্ তচ্ছে নমছ্ তচ্ছে নমো নমঃ।"

সামলাতে গিয়েও তাল কেটে গেল। মণি গালে টোকা মেরে বললে—'বাঃ চমৎকার! শুনতে হবে।···বসুন পণ্ডিতজী, আপনি নিচে বসে আমায় অত্যন্ত লজ্জা দিচ্ছেন—আপনার ছেলের মুখে ঐ কথাটাই ফুটে বেরুল। না, চৌকিতেই বসতে হবে আপনাকে—নয়তো আমার মনে হবে অভ্যর্থনারই অভাব হচ্ছে ; বসুন আপনি।"

একটু তফাতে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসলেন ভদ্রলোক, শিশুকে উপলক্ষ্য করায় আতিথ্যের ত্রুটিটুকু যেন কেটে গেল। মণি বললে—"বুঝেছি আপনার কুণ্ঠার হেতুটা পণ্ডিতজী, কিন্তু এক্ষেত্রে তো সেটা আসতে পারছে না। আপনার অন্যান্য যা দরকার—চাল, ডাল, আলু, কিছু তেল, ঘি, মসলা, গেরস্তর যা দরকার—সবতো আমরাই দিচ্ছি—সাত দিনের

ব্যবস্থা করে। শুধু একটা জিনিস যা আমাদের দেবার কোন উপায় নেই, অর্থাৎ একটু জায়গা…"

"থাক, হুজুর—আপনার বিশেষ দয়া…জল নেমে যেতেও পারে—যেন মনে হচ্ছে আঙুল দুয়েক নেমেছে, গত বছর এর আগেই সরে গিয়েছিল জল।"

"বেশ তাহলে রিলিফটাই নিয়ে নিন আপনার। শুধু কথা দিন যে জল ওসারায় আর ঘরে ঢুকলে আর অপেক্ষা করবেন না কোন মতেই। আমি এখানকার কেন্দ্রকর্তাকে ডেকে বলে যাচ্ছি খোঁজ নিতে থাকবে—গ্রামে তিনটে নৌকো দেওয়া হয়েছে—দরকার হলে সরিয়ে ফেলবে আপনাদের। আমি ডাকি নৌকো…"

একটু দেয়ালের পাশ দিয়ে ডাকতে হবে, মণি উঠে দাঁড়াতেই লোকটি নেমে সামনে এসে দাঁড়ালেন, লজ্জায় ভয়ে মুখটা কিরকম হয়ে গেছে। এখুনি যেন বন্যার চেয়ে শতগুণে ভীষণ একটা অভিশাপ মাথায় এসে নামবে, শুধু মণি ডাক দেবার অপেক্ষা।

"কি পণ্ডিতজী?"

"হুজুব, মান বাঁচান, বংশের মর্যাদা—এ-বংশে কেউ কখনও প্রতিগ্রহ নেয় নি…"

"কিন্তু পণ্ডিতজী, আপনি তো অন্য কারুর দান নিচ্ছেন না—একে তো দান বলাও যায় না পণ্ডিতজী—এতো আপনার অধিকার—নিজের দেশ—নিজের সরকার…কেন, রাজার দান তো…"

আর পারলেন না, একেবারেই ভেঙে পড়লেন—"নোব হুজুর, আমিও নোব…রাজহস্তের দক্ষিণাও কেউ কখনও নেয় নি এ বংশে—কিন্তু জানি আমায় হবে নিতে, মা ভগবতীর মনে তাই আছে… অথচ পুরুষানুক্রমে তাঁর চরণ আরাধনা ক'রে আসছে এ বংশ—তিনি গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হুজুর—কী অপরাধ হয়ে গেল আমার দ্বারা তাঁর চরণে?—কোথাও কি তমো এসে গেছে?—দম্ভ?—কিন্তু সে তো তাঁকে নিয়েই—তাঁকে ছাপিয়ে জয়ী হলো কুশী?—তাঁর ক'ড়ে আঙুল ধোওয়ারও স্পর্ধা নেই যার…"

কুশী অঞ্চলের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অঞ্জলিতে মুখটা চেপেও কান্না যেন থামাতে পারে না, আর মণি বসে তার মধ্যে, এইটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা যেন উজ্জ্বল দাগ কেটে বসে আছে।

ছেলেটিও হতভম্ব হয়ে ফোঁপাতে আরম্ভ করেছে, পণ্ডিতজীকে ধরে নিয়ে এসে তার পাশে বসিয়ে দিলে মণি। বললে—"চুপ করুন পণ্ডিতজী, আপনার যা যা মনঃপূত নয় এমন কিছুই করতে বলব না আমি। আপনি বিচক্ষণ, অবস্থা বুঝে যেমন ব্যবস্থা করা দরকার মনে করেন আপনি, করবেন—আপৎ-ধর্ম ব'লে শাস্ত্রই তো আবার বিধান দিয়েছেন—আত্মহত্যায় মানুষের অধিকার নেই—ভগবান না করুন, ঠিক সেই অবস্থায় এলে সম্মানের পথেই মনস্থির ক'রে ফেলবেন—এই আমার অনুরোধ—আমার লোকজনকে বলা থাকবে···আরও একটা কথা বলি পণ্ডিতজী···"

অঞ্জলিতে মুখ ঢেকেই শুনছিলাম, কান্নাটা থামছে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"বলুন।···ওঃ, কী লজ্জায় যে ফেললেন ভগবতী!···"

"কথাটা অন্তত তেমন অবস্থা পড়লে নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখবেন পণ্ডিতজী—এ যা সাহায্য দিয়ে ফিরছি আমরা, এ কোন রাজারও দান নয়। পদ্ধতি গেছে বদলে—এখন দেশেই দেশের রাজা, দেশই দেশের প্রজা—কেউ কাউকে আর দেবার স্পর্ধা রাখে না, কারুরই নেই নেবার অপমান—প্রয়োজন মতো এক হাতে দেওয়া এক হাতে নেওয়ার পালা চলে···ভেবে দেখবেন কথাটা···"

একটু ক্ষীণ হাসি ফুটল ঠোঁটে, কোথায় যেন একটা ভুল রয়েছে, কী যেন একটা অবিশ্বাস।

"আর একটা কথা, সেটা কিন্তু আপনার সঙ্গে নয়, আপনার ছেলের সঙ্গে।"

হেসে বললেন—"বলুন, আপনার আজ্ঞাবহ, সামনেই রয়েছে।"

মণি পকেট থেকে নোটে টাকায় বেশ বড় এক মুঠো বের করে ছেলেটির হাতে ভরে দিলে। ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে বাপের মুখের দিকে চেয়ে

রইল; পণ্ডিতজীর মুখটা একটু বিকৃত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেষ্টা ক'রে হাসিতেই পরিবর্তিত করে নিলেন।

মণি বললে—"এই বিপদে কিছু অন্তত হাতে থাকা দরকার, তাই গচ্ছিত রাখলাম আপনার ছেলের কাছে, সোজা ওর মায়ের হাতেই দিয়ে দেবে। যদি আমার কথাগুলো বিবেচনা ক'রে কাজে লাগানো দরকার মনে করেন—তেমনই অসময়ে..."

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"তাহলে লাগাবে কাজে আমার ছেলে হুজুর, কথা দিচ্ছি; কিন্তু যদি সেরকম দরকার মনে না হয়?—সে-স্বাধীনতাটুকুও যান দিয়ে...বংশের মর্যাদা ভাঙবে ছেলে—শৈশবেই?"

কথা ঐ পর্যন্তই হয়েছিল। বরাবরই খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল মণি পণ্ডিতজীর। ভেতরের ঘর দুটো পড়ে যায়। ওসারায় এসে পরিবারটি দুদিন কাটায়—স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, এক কোণে কুলদেবী দুর্গার একটি ছোট শিলামূর্তি।...চিঁড়েও ছিল শেষ পর্যন্ত। তারপর জল নেমে যায়।

মণি বললে—"এসব খবর পেয়েছিলাম, শুধু টাকাটা শেষ পর্যন্ত কুশীর গর্ভেই গেল কিনা জানতে পারিনি; এসে হিসেব করলাম টাকায় নোটে পঁচাত্তর টাকা ছিল।"

বললাম—"কুশীরই পাওনা ছিল—ওর তো কোন সঙ্কোচ নেই, সুতরাং ওর কাছে কিছু বেমানানও হয় না।"

মণি হেসে বললে—"তা যদি বললে—আমি লিখেও রেখেছিলাম কো'নও এক 'কুশেলী ওঝাইনে'র নামে। ঠিক করলাম পণ্ডিতজীর নামটা লিখব না, কি নাম দিই—কি নাম দিই—শেষে ঐ নামটাই গেল মনে পড়ে।"

আমরা জিরৌলের কাছে এসে পড়েছি। বেশ বড় গ্রাম, আর জায়গাটা বেশ উঁচু, মাঝামাঝি খানিকটা একটু নামাল্ দেখে কুশী বেরিয়ে এসেছে, এখন গ্রামটা দু'টুকরো। তা হোক, তবু সহজ জীবনের খানিকটা চঞ্চলতা দেখে প্রাণটা যেন জুড়ল। সবুজ ঢালু মাঠে গোরু মহিষ চরছে, রাখাল ছেলে চরন্ত মহিষের পিঠে গা এলিয়ে রয়েছে পড়ে, মায়ে-ঝিয়ে ঘুঁটে পাড়ছে, পড়ন্ত

রোদে কাঁসার মোটা মোটা গয়না—পায়ে কাড়া, হাতে চুড়ির গোছা চিকমিক ক'রে উঠছে···পাঠশালার ছেলেরা ঘুরে ঘুরে দেখছে আমাদের নৌকো, গুরুজীও বেরিয়ে আসছিল, আরদালি—অফিসার দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে টেবিলে বেত আছড়ে তম্বি লাগালে। দূর থেকেই যতটুকু চোখে পড়ছে, অসীম আগ্রহে কুড়ুতে কুড়ুতে চলেছি। জীবন যেখানে দুর্লভ সেখানেই তো তার প্রকৃত মূল্য যায় বোঝা। বেশি কিছুর দরকার হয় না তো—রাজার শোভাযাত্রাও নয়, বণিকের সপ্তডিঙাও নয়,—শুধু একটি শিশু মায়ের কোলে যেতে যেতে মুখটা তুলে চাইলে, একটি বধূ জল নিতে এসে দুহাতে কলসী ঝুলিয়ে সামনে রইল চেয়ে এইটুকুই যথেষ্ট, এইটুকুতেই জীবন রইল শাশ্বত হয়ে তোমার মনে।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—ঝার নৌকো, এর নামটাও আর করলাম না। লোকটা নৌকো ক'রে নির্মাল্লীর দিকে যাচ্ছিল। এখানকার সর্দার গোছের, খুব প্রভাবশালী, রিলিফের কাজও ওর হাত দিয়েই হচ্ছে, দুখানা নৌকোও ওর জেম্মায়, হাকিম এসেছে শুনে সেলাম বাজাতে যাচ্ছিল, পথেই দেখা।···আনন্দে যে চাটুবাক্য প্রয়োগ করছে তার বাক্যগুলো নিশ্চয় কৃত্রিম—মণি দেবতাও নয়, দেবদূতও নয়,—কিন্তু তার আনন্দের অংশটুকু যে অকৃত্রিম তা ওর কণ্ঠস্বরে বেশ বুঝতে পারছি। ওর যে "যাত্রা বন্ গিয়া," ক্লেশ ক'রে যাকে দেখতে যাচ্ছে সে নিজে থেকেই ঘরে এসে হাজির।···আমার চোখ আছে দুধারে গাঁয়ের দিকে, কান আছে ওর কথাগুলোর দিকে। খোসামোদ হচ্ছে একটা আর্ট—তোমার জন্যে রচিত হলেই তা মিষ্টি হবে, নচেৎ নয়, এমনকি কথা আছে? Art is universal, সে সবার জন্যে, সর্ব কালের জন্যে। বলছে মণিকে, কিন্তু রচনা-লালিত্যে আমি অভিভূত হয়ে পড়ছি।

আগে একজায়গায় বলেছি না, কুশী সর্বনাশী, কিন্তু সবারই পক্ষে নয়। এই একটা লোক বছরে বছরে জোড়া পাঁঠা মানৎ করছে, এই কুশীকেই; দুটো নৌকো করায়ত্ত, অর্থাৎ দুহাতে লুটছে, আবার একটা আদায় করতে চায়। মণি কিন্তু দেখলাম সত্যিই দেবতাও নয়, দেবদূতও নয়,

নিতান্তই একটা শীলাখণ্ড, নৈলে কুশীর মতনই এতবড় একটা স্রোত্র-বন্যায় এতটুকু গলল না! আমার তো মনে হচ্ছিল যদি এই নৌকোটাই ওকে ছেড়ে দিয়ে সবাই জলে নেমে পড়ি তো এমন বেশি কিছু করা হবে না।

আমরা মাঝখানের ঐ স্রোতটা দিয়ে গ্রামের উত্তর দিকে গিয়ে পড়লাম। এরপরে সব নিশ্চিহ্ন, যতদূর দৃষ্টি যায়, আর তদারক করবার কিছু নেই। রবিবাবু বললেন বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে এই জলের ওপরই দুটো জেলার সীমানা একজায়গায় মিলেছে—দ্বারভাঙ্গা আর সাহাবসা। আমরা ডান দিকের অংশটা ঘুরে আবার দক্ষিণমুখো হলাম। এতক্ষণ একটা জিনিস নৌকোর ছইটা ছিলো আড়াল করেঃ পশ্চিম কোণে সামান্য একটু যে মেঘ দেখে বেরিয়েছিলাম সেটা আকাশের অনেকখানিই ফেলেছে ছেয়ে। নির্মাল্লী এখান থেকে দু'মাইল যদি নাও হয় তো প্রায় কাছাকাছি। মেঘের গোড়ার দিকটা জলমগ্ন, তবে ওপরের দিকটা যেমন এবড়োখেবড়ো হ'য়ে গেছে তাতে মনে হয় হাওয়া আছে সঙ্গে, বোধ হয় ঝড়ই।

এই মাঝসমুদ্রে ঝড়ের আভাস!—

রবিবাবু বেশ একটু চটে উঠলেন, মাল্লারা তো টের পেয়েছিল, তারা বলেনি কেন? জিরৌলের আগে থেকেই ফিরে যাওয়া যেত।

কেন যে বলে নি বোঝা শক্ত, হয়তো একটু বিপদ দেখিয়ে নিরাপদে এনে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে যে কেরামতি আছে, সেটার লোভ সামলাতে পারে নি, কিম্বা হয়তো ওদের আন্দাজমতো বিপদটা সত্যিই তত কিছু নয়—যতটা আমরা ভাবছি! মাঝি অবশ্য এই কথাটাই বললে।

রবিবাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না, মণিকে প্রশ্ন করলেন—"লাল-মুনিয়ায়ই না হয় নামিয়ে দিতে বলি নৌকোটা?"

কথাটা না বুঝতে পারায় প্রশ্ন ক'রে জানা গেল—আমরা এ যা চলেছি এটা হচ্ছে Spill water অর্থাৎ মাঠের ওপর উপছে-পড়া ছড়ানো জল, লাল-মুনিয়া হচ্ছে এখানকার কুশীর ডাক নাম, আর হাত পঞ্চাশেক পরেই হয়েছে আরম্ভ, প্রবল স্রোত, নৌকো ছেড়ে দিলে, অর্ধেকেরও কম সময়ে তুলে দেবে নির্মাল্লীতে, ওখানেও প্রায় এই রকম ব্যবধান রেখে ব'য়ে গেছে দক্ষিণে।

ভয় পাইনি এই রকম ভাবটা বজায় রেখে প্রশ্ন করলাম—"তাতে আপত্তি কি ওদের ?"

পেটের ভেতরে রইল—রাত্রি, মেঘ, ঝড় তিনটেই তো বেশ একজোটে এগিয়ে আসছে।

আপত্তি আছে, মাঝি সেটা গুঁইগাঁই ক'রে বললে।—

ডোবা নদীর, অর্থাৎ যার তীর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তার ধার দিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। যেতে হলে একেবারে মাঝদরিয়ায় গিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা তাতেও তো বিপদ আছে, চওড়া নদী লালমুনিয়া, এ বন্যায় আবার হয়তো আরও চওড়া হয়ে গেছে, এ অবস্থায় মাঝামাঝি গিয়ে যদি ঝড় ওঠে—আর ঝড়ও পশ্চিম থেকেই—তাহলে এই মেটো জলে আবার ফিরে আসা দুষ্কর হয়ে উঠবে না ?

রবিবাবু মণির দিকে চাইলেন—তার কি মত ?

আমি ভয় না পাবার ভাবটা আরও চেষ্টা করে বজায় রেখে বললাম—"আমার মনে হচ্ছে যখন টাইমফ্যাক্টারটাই সবচেয়ে বড় কথা, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছাতে পারা যায়।·· কতটা সময় নেবে আমাদের গিয়ে পড়তে ?"

রবিবাবু প্রশ্নটা মাঝির দিকে এগিয়ে দিলেন।

মাঝি একবার দূরত্বটুকু নজর দিয়ে মেপে নিয়ে বললে—"ঘণ্টাখানেক··· একটু বাড়িয়েই বলছি হুজুর।"

"আর নদী হয়ে গেলে ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"ঠিক আধঘণ্টায় হবে না, তবে মিনিট কুড়ি আগে পৌছে যাবই।"

আমি নিরুত্তর থেকে রবিবাবুর দিকে চাইলাম, লজ্জাটা আর নিজের ওপর তুলে নিই কেন !

উনি আকাশটা একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বললেন—"আমি যতটা বুঝছি, ঘণ্টাখানেকের আগে ও মেঘ এসে পৌছুবে না, অন্তত তিন কোয়ার্টার লাগবেই···আপনার কি মনে হয় ?"

বললাম—"তাহলে নদীতে নেমে পড়াই ঠিক নয় কি? ঝড় এসে গেলে সেও তো ঠেলে শেষ পর্যন্ত নদীতেই ফেলতে পারে নৌকোটা—মাল্লারা সামলাতে পারবে কি?"

তাই ঠিক হোল। মাঝি গোটা দুই ঝিঁকা মেরে নৌকোর মুখ একটু পূবের দিকে ঘুরিয়ে দিলে, তারপর কয়েক লগি যাবার পরই দাঁড়ে আর মাটি পাওয়া গেল না, নদীতে ঢুকে পড়েছি আমরা; চারটা মাল্লা লম্বা টানে শুধু হাল টেনে চলল। মাঝদরিয়ার খর স্রোতে এসে মাঝি আবার দুটো ঝিঁকা দিয়ে মুখটা দক্ষিণে করে দিতে সনসনিয়ে এগিয়ে চলল নৌকো।

বাতাসটা হঠাৎ পড়ে গেল, দিগন্তবিস্তৃত জলের ওপর চারিদিকে একটা স্তব্ধতা। ঝড়টা ওড়বার আগে পাখা দুটো যেন ভালো ক'রে গুটিয়ে নিলে একবার, মেঘের এখানে ওখানে বিদ্যুৎ চমকে উঠতে লাগল। সবাই বুঝছি একটা খারাপ রকম রিস্ক্ নেওয়া হয়েছে। মণি একবার মুখটা ঘুরিয়ে বললে—"জিরৌলে থেকে গেলেই বোধ হয় ভালো হোত।" সবাই একবার মুখটা ঘুরিয়ে দেখলাম—না, আর ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। রবিবাবু মাল্লাদের বললেন—"টেনে বেরিয়ে যা···যাব পৌছে···ঠিক।"

মাল্লাদের বুকের পেশী, হাতের পেশী, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

পূবে দক্ষিণে এখনও বেশ আলো, পশ্চিমে আকাশের প্রায় আধাআধি এসে গেছে মেঘটা, উত্তর হয়ে একটু ঘুরে আসছে। আলো-আঁধারিতে যেন হর-গৌরীর বিবাহ আসর; কজ্জলিতা গৌরী—এইবার বসবেন এসে সভায়—তারপরেই তাণ্ডব—'জটার বাঁধন পড়ল খসে···হে নটরাজ!···'

—আজ দেখতে হবে। জল হচ্ছে শান্তি, তার ওপর মৃত্যুর এত সামনাসামনি হয়ে বসা হয়নি কখনও; কিন্তু মৃত্যুর এ-রূপ দেখতে হ'লে তো গৃহকোণে বসে থাকলেও চলত না, এমনকি দ্বীপায়িত ঐ জিরৌলের কোন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও না।···নিজের জন্যে আর ভয় হচ্ছে না, শুধু ওরা সব যদি না থাকত···ওরা সব থেকে কেমন যেন একটা বাধা সৃষ্টি করেছে—মণি, রবিবাবু, বেচারি কুঞ্জ, ঐ মাল্লাটা, কোন কারণে ওর

মুখটা বড় শুকনো—এরা সব না থাকলে, আর নিজের আয়ু থাকলে আজকের সন্ধ্যাটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকত স্মৃতিপথে।

অর্ধেক এসে গেছি। দক্ষিণ-পশ্চিমে নির্মালীর বাড়িঘর স্পষ্ট হয়ে উঠছে—চালের কল, শেঠেদের কোঠাবাড়ি, নির্মলবাবার জোড়া মন্দির—এঁরই নামে গঞ্জের নাম···আমাদের আশ্রয়ও, স্টেশনের বাড়িগুলোও··· লাইনের ওপর লোকেরা এসে ঘর বেঁধেছে···বিপদের মধ্যেও কত নিরাপদ! ···"কষকে ভাইয়া···অব তো বাজি লে লিয়া বাহাদুর!···" ঘামে মাল্লাদের পাকানো পেশী চকচক করে উঠছে। হবে কি বাজি জেতা?···ওদিকেও যে আয়োজন পূর্ণ। জলের গাছগুলো সব দোল খেতে আরম্ভ করেছে, উত্তর থেকে ঝড়ের কাঁধে মেঘ আসছে ছুটে, বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত, শিকার বুঝি গেল হাতছাড়া হয়ে—শাঁ শাঁ একটানা নিশ্বাস, মাঝে মাঝে গর্জনে পড়ছে ফেটে···

জলের নাচনও উঠল জেগে।

বৃষ্টি নামল। নির্মালীও কিন্তু এসে গেছে, এইবার নদী থেকে শুধু তুলে ফেলা নৌকাটাকে, মাঝি প্রাণপণে ঝিঁকা মেরে মুখটা পশ্চিমে ঘোরাবার চেষ্টা করছে, ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে মুখটা; নামাব চেয়ে ওঠা নিশ্চয় শক্ত। কি, লালমুনিয়াই ছাড়তে চাইছে না ওদের শিকার?

আশ্চর্য! পরদিন সকালে কিন্তু কোন নিশানাই নেই এই খণ্ডপ্রলয়ের। এমন কি, অত বৃষ্টি, কিন্তু শুনছি জল বরং একটু নেমেই গেছে নির্মালীর। সবাই বলছে অনেক সময় এই রকমই হয়,···নিচের বৃষ্টি, এই বিশ-ত্রিশ মাইল নিয়ে যে লোক্যাল রেন, এতে কুশীর ইতর-বিশেষ হয় না, এসব কুশী-সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য মাত্র, ওর যা জল তা একেবারে পাহাড়ের, তার আভিজাত্য আলাদা।

এও এক নূতন শিক্ষা হোল।

সকালে 'ছোট হাজরির' পর আমরা আবার বেড়িয়ে পড়লাম। এবার দক্ষিণে, ঐ লালমুনিয়া হ'য়েই। আজ ফিরতে হবে, গাড়ি আমাদের একটায়, এর মধ্যে যতটা পারা যায় ঘুরে আসা।

এবার পরিবেশ একটু অন্যরকম। আমাদের বাঁয়ে একটা বিস্তীর্ণ কাশবন। অবশ্য সমস্ত বনটাই জলমগ্ন, শুধু কাশের মাথাগুলো আছে জেগে, তবুও পাশে পাশে এই সবুজের চিহ্নটুকু থাকায় কেমন যেন একটা ভরসা রয়েছে মনে, কাল উত্তর দিকে যেতে শুধুই জলের সেই যে মাটি ছাড়া আতঙ্কের ভাব সেটা নেই। বনটা একটানা নয়, মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা জলের ফালি, তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে লালমুনিয়ার সঙ্গে গেছে মিলে। এগুলো ছোটখাট সুঁতি সব, বনের ওদিককার যে জল—কতদূরে তা নৌকো থেকে বলবার উপায় নেই—তার সঙ্গে লালমুনিয়ার যোগাযোগ রেখে চলেছে। মাঝে মাঝে জমিটা উঁচু হয়ে তীরও বেরিয়ে পড়েছে। মাল্লারা বলছে, কাল এটুকুও ছিল না, তার মানে লালমুনিয়ার জল সত্যিই খানিকটা নেমে গেছে।

আমরা মাঝখান দিয়ে চলেছি।

আমাদের ডাইনেও কাশবন, তবে বাঁয়ের মতন অমন নয়। আরও বেশি ছাড়া ছাড়া, কয়েকটি দ্বীপ, আর বাঁয়েরটা যেমন ফিকে হতে হতে সেই দক্ষিণ দিগন্ত পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে, এ সেরকম নয়; খানিকটা গিয়েই বন গেছে শেষ হয়ে, তারপরেই জল, নিরাভরণ জল শুধু, আর কিছু নেই। রবিবাবু বললেন, এই জলেরই একটা ধারা ঘুরে সেই ঘোঘডিহা পর্যন্ত চলে গেছে, মাঝখানের উঁচু জমিটুকু বইপাশ (Byepass) করে; আগে লিখি নি। উপাখ্যানের দিক থেকে বলা যায় ঐটেই হচ্ছে কুশীর অগ্রদূতী, কমলার কাছে জানিয়ে দিতে গেছে—বোন এসে পড়ল বলে; এবছর যদি নাই হয় তো আসছে বছর, আর একটা বছর। সবুর ধরে থাকুক।

বাঁয়ে কাশবনের মধ্যে একটা বাড়ি জেগে উঠেছে। আগেও নজরে পড়েছিল, সবুজের ওপর একটা সাদা প্যাচ্, যতই এগুচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে একটা টানা কোঠাবাড়ি, বোধ হয় দোতালা। শহর থেকে এত দূরে একেবারে বিচ্ছিন্ন ঐরকম একটা বাড়ি—কৌতূহল জাগায় বৈকি। এখান থেকেও এখনও অনেকখানি দূর—অথচ আর যাই হোক, বাড়িখানা অন্তত অক্ষত বলেই মনে হয়—কেউ থাকে নাকি এখনও?…এসব জায়গাগুলো কেমন যেন স্বপ্নময় বলে মনে হয়—জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আধা-বাস্তব

আধা-অবাস্তব। এইটেই যদি সকাল না হয়ে সন্ধ্যা হোত—ভাবতে ভালো লাগত—অশরীরীদের আবাস এটা—জীবন থেকে দূরে, সম্পূর্ণ মৃত্যুর পরিবেশের মধ্যে, পরিত্যক্ত জীবনের পুনরভিনয় হ'য়ে যাচ্ছে, রাত্রির পর রাত্রি ; মাটির মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছে না ওরা সব।

কেউ ঠিক বলতে পারলে না। নাকি সখুয়ার নীলকুঠি ছিল ; তখন নির্মাল্লীকে কে জানে ? নির্মাল্লী তো কুশীর হাতে গড়া, ভাপ্‌টিআহিকে নামিয়ে নির্মাল্লীকে গদিতে বসিয়েছে কুশী। তখন সবাই এদিকে জানত সখুয়ার নীলকুঠি,—কী প্রতাপ! হাঁকডাক! ঐ বাড়িটা কেন্দ্র করে একটা ছোটখাট নগরীই ছিল সখুয়া, লোকে নির্মাল্লী স্টেশনে নামতো সখুয়ার জন্যে।

কুশী হচ্ছে কিং-মেকার ( king-maker )। ইতিহাসের বড় বড় কিং-মেকারদের মতন ওর ঐ খেলা—? ঠেলে তুলছে আবার টেনে নামাচ্ছে।··· কুঠিয়ালের উত্তরাধিকারী নাকি হয়েছিল জমিদার। এখন দুটো মুকুটই অতলে।

শুধু তাই নয়, আরও একটা নতুন আবিষ্কার হোল। উত্তরে যে গিয়েছিলাম কাল, শুধুই জলের মধ্যে কুশীর প্রলয়ঙ্করী রূপটা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; এখন কিন্তু দেখছি আসল ধ্বংসের কাজ ওর হয়েছে এই দক্ষিণেই। রাক্ষসী মায়া জানে—এই যে দুধারে সবুজের মায়া বুলিয়ে রেখেছে কাশবনে, এর নীচে লুপ্ত রয়েছে একটার পর একটা গ্রাম—লালমুনিয়া (হ্যাঁ, কুশী ধ্বংস ক'রে তারই নামটা আত্মসাৎ করেছে) তারপর সখুয়া—মুংরাহা—ধারঘাট—কাটাইয়া—সোহনপুর—লালপুর।···এর মধ্যে চিহ্ন রয়েছে সখুয়ার ঐটুকু।···যেখানটায় নাকি কাটাইয়ার থাকবার কথা সেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটাতিন শুকন গাছ, বোধ হয় আম গাছ, ঝড়ে জলে ওপরকার ছাল পর্যন্ত প'চে গ'লে পড়েছে, বাকি আছে শুধু কঙ্কালখানা, মসৃণ, শ্বেতাভ, সকালের রোদে চিকচিক্ করছে···কী ধ্বংস!···কী প্রবঞ্চনার কুটিল হাসি! ঐ কাশবনই চোখে একটা স্নিগ্ধতা এনেছিল—এখন এসে পড়েছে একটা অবিশ্বাস।···ঐ তিনটে গাছ মুক্ত আম্‌দরবারে দাঁড়িয়ে

শীর্ণ আঙুল ক'টা তুলে অভিযোগ করছে, সতর্ক করে দিচ্ছে—বিশ্বাস কোর না ঐ হরিৎ-বসনা কুহকিনীকে, ও সব পারে···

না, সখুয়া থেকে আরম্ভ ক'রে যে পূর্ব জীবনের মাত্র এই ছুটি চিহ্নই রয়েছে অবশিষ্ট, এমন নয়, আমরা আর একটু এগুতে চক্রবাললগ্ন বর্তুল জলরাশির ওপর একটি কালো রেখা উঠল জেগে।

জিগ্যেস করলাম—"ওটা কি?"

মাঝি বললে—"ওটা হচ্ছে সোহনপুর।"

রবিবাবু বললেন—"আমরা ওদিকেই যাচ্ছি, সুবিধে হলে একটা সেণ্টার খুলে দোব।"

"জিরৌলের মতন?"

"গ্রামটা বড়ই, কিন্তু এখন কিরকম দাঁড়িয়েছে জানি না, কুশী জিরৌলের পাশ কাটিয়ে এসেছে, কিন্তু এদিকটা শুনছি একেবারে মাঝখানে পড়ে গেছে।"

এগিয়ে চললাম আমরা। গতি দ্রুত নয়। আসবার সময় সমস্ত পথটা উজান বেয়ে আসতে হবে, মাল্লারা শক্তি ক্ষয় না ক'রে চুপ ক'রেই ব'সে আছে, স্রোতে যেটুকু টেনে নিয়ে যায়; মাঝিও মাঝে মাঝে হালে এক-আধটা মোচড দিয়ে শুধু নৌকোর মুখটা ঠিক রেখে চলেছে।

জলের ওপর সেই কালো দাগটা আরও অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে একটা লম্বা চালা, এদিক ওদিক ছড়ানো গোটাকতক গাছ। আরও খানিকটা এগুতে মনে হোল চালাটা শুধু গোটাকতক খুঁটির ওপর যেন আছে দাঁড়িয়ে, দেয়াল বলে কিছু নেই। তারসঙ্গে ঘরটার ওদিকে আরও গোটাকতক গাছের মাথা জেগে উঠল। ভাবছি একটা গোটা গ্রামই যখন আরও গোটাকতক বাড়ি দেখা যাবে, কি, ছুটো পোয়াল গাদা, কি, ছুটো ধানের মড়াই; কিন্তু কৈ?—কিছু না আর। শুধু দেখা গেল একটা নৌকো যেন ছাড়ল ঐ চালাটার গোড়া থেকে। এইদিকে এগিয়ে আসছে।

নৌকোটির যখন কাছাকাছি আমরা, তখন জায়গাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লোকজন দেখা যায় না, তবে চালাটা থেকে জলের ধার পর্যন্ত

সমস্ত জায়গাটুকু নজরে পড়ে। আগে যে মনে হচ্ছিল চালাটা জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নয়। বেশ অনেকখানি জায়গা, এসে চালাটা থেকে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে এসেছে, ধারে ধারে কাশ, খুব ঘন নয়, মাঝখানে ঘাসজমি, প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা গোরু মহিষ চড়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য বিশেষ যে কিছু পাচ্ছে এমন মনে হয় না; চারিদিকেই কাশ, বেশ বোঝা যায় জলটা আরও অনেক ওপর পর্যন্ত ছিল, সম্প্রতি নেমে গেছে।

নৌকোটায় দুজন মাঝবয়সী লোক আর একটা ছোট ছেলে বারো তের বছরের। তার হাতে একটা কেঁড়ে, সেটাকে তবলা ক'রে মাথা নেড়ে নেড়ে তারস্বরে গান করছে, পায়ের গোছ পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে। মণির কথায় আরদালী ডাক দিতে ওরা এগিয়ে এল।

"এটা সোহনপুর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।"

একবার করুণ নয়নে ফিরে দেখে বললে—"সোহনপুর ছিল বলাই ঠিক।"

ছেলেটা একটু যেন পাগলাটে, গানটা থামিয়েছে, কিন্তু মাথা নেড়ে পা দুলিয়ে তবলা বাজিয়েই যাচ্ছে, বললে—"এখন সোহন হালুয়া······"

লছমী ধমক দিলে—"তুই থাম···দেখছিস হাকিম !"

মণি লছমীকে ধমকে উঠল—"আচ্ছা, তুই থাম আগে।" আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললে—"পরিচয় দিতে দিতে ও গলদঘর্ম হোল···মুখিয়ে থাকে।"

ছেলেটা তবলা পর্যন্ত থামিয়ে একটু মাথাটা ঝুঁকিয়ে ছইয়ের মধ্যে আমাদের দেখছিল, প্রশ্ন করলে—"আমি তাহলে বাজিয়ে যাই হাকিমজী ?"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। লছমী মুখটা আরও রাঙা করে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নিলে। লোকদুটো আবার দাবড়ে দিলে, একজন আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"ওর কথায় কোন কান দেবেন না হুজুর, একে একটু ছিট আছে, তার ওপর···"

আমি বললাম—"সে ভাবনা নেই তোর; তবলাও এমন নয় যে কান দিতে হবে।"

আবার একটু হাসি উঠল। প্রশ্ন করলাম—"ক' ঘর লোক ছিল গ্রামে? এযে দেখছি একেবারে মুছে দিয়েছে গ্রামটা।"

"ঘর বেশি ছিল না হুজুর এদিকে। আগে ছিল প্রায় চারশ' ঘরের বড় বসতি—সব জাত—সোহনপুরের লোককে কিছুর জন্যে বাইরে যেতে হোত না। পাঁচ বছর হোল কুশী ঢুকে পড়ে সব তছনছ করে দিয়েছে। লোক প্রায় ছিল না, যে যেখানে পেরেছিল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল; গতবার আবার কুশী এদিকটায় না আসায়, কেউ কেউ সাহস করে তুলেছিল চালা, তা হঠাৎ এমন জোর করলে কুশী—এক রাত্তিরেই…"

ছেলেটা আবার মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁত বের করে হাসলে, বললে—"আমাদের গাছে বসিয়ে রেখেছিল হাকিমজী। চালার ওপর উঠতে যাচ্ছিলাম সবাই, মা বাবাকে বললে—দুৎ, মিনষে কি রকম বোকা, দোবারা মেহনৎ! দেখছিস কুশী মাঈর কীরূপা হয়েছে; গাছে ওঠ একবারে।"

ছেলেটা কোথা থেকে জুটে শ্মশানেও এক ধরণের হাসি তুলেছে। কে জানে, ঐটুকুই বোধহয় গ্রামের মস্ত বড় সম্বল, একটানা অভাব, দুঃখ, ত্রাসের মধ্যে মানুষ কি করে পাববে টেঁকে থাকতে?…হয়তো এইজন্যেই এরা দুজনেও ওকে সঙ্গী করেছে, আমাদেব সামনে ও বরং প্রশ্রয়ই পাচ্ছে একটু; প্রশ্ন করলাম—"কজন ছিলি তোরা?"

"চারজন—আমি, মা, বাবু আর বুঢ়িয়া—আমার দাদী। মা বললে—এবারও কুশীমাঈ নিলেন না বুঢ়িয়াকে।"

"চারজনই গাছে?"

"জী হাকিমজী; বাবা আগে বুঢ়িয়াকে তুলে রেখে এল, তারপর আমায়, তারপর নিজে।"

"আর তোর মা?…চারজন বললি না?"

"মা নিজেই চড়তে জানে—বাবার চেয়েও ভালো।"

আবার সবাইকে হেসে উঠতে হোল। লছমীও বাদ গেল না।

প্রশ্ন করলাম—"তোর মা যে বড় ঠেলে দিলে না তোর দাদীকে গাছ থেকে, একটা সুবিধে তো?"

"দাদী আলাদা ডালে ছিল, বেঁধে রেখেছিলো বাবা।"

আবার এক ঝলক হাসি।

প্রশ্ন করলাম—"তোর মার ভয়ে?"

"জী হাকিমজী, ওপরে মা নিচে কুশী মাঈ।"

একধরণের একটা হুল্লোড়ে পড়েই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, চালাটার দিকে হঠাৎ আবার নজর পড়ে যেতে হাসিটা যে কত বড় বেখাপ্পা হয়ে যাচ্ছে হুঁস হোল। আর কথা না বাড়িয়ে লোকটাকে প্রশ্ন করলাম—"এখন তাহলে ঐ একটি চালা দাঁড়িয়ে?"

"জী হুজুর। ওটা বাড়ি নয় কারুর, শুকদেব ঝার গোয়ালঘর ছিল, এখন ওতে পাঁচটা পরিবার এসে উঠেছে ভিন্‌গাঁ থেকে—এবারে কুশী পূব-দিকে হঠাৎ ধাওয়া করে ওদিকেও অনেক গ্রাম ডুবিয়ে দিয়েছে কিনা।"

মণি প্রশ্ন করলে—"ওদের অন্য সব ব্যবস্থা?—রিলিফ পাচ্ছে ঠিক মতন?"—

"তা পাচ্ছে হুজুর, রিলিফ আনতেই যাচ্ছি আমরা নির্মাল্লীতে, এই নৌকোটাও সরকারী। তবে রিলিফ যদি একটু বাড়িয়ে দিতে হুকুম হয়..."

"কেন, কম হচ্ছে?" একান্তে রবিবাবুকে গ্রামের নামটা নোট করে নিতে বললে।

ছেলেটা বললে—"খিদে একটু বেশি পায় হাকিমজী। আর তো অন্য কাজ নেই। মোষ চড়াতেও হয় না, ঘাস কাটতেও হয় না।"

"তাই তোর এত ফূর্তি, না?—কাজ নেই ব'লে..."

"জী, হাকিমজী; গুরুজীও গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে..."

এমন নিশ্চিন্তভাবে বললে যে আবার সবাইকে হেসে উঠতে হোল।

মণি বললে—"তা হ'লে সত্যিই কুশীমাঈর কৃপা বল?"

"জী হাকিমজী, পাঠশালার ঘরটাও নেই আর, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।"

আমরা খানিকটা এগিয়ে গেলাম। মাঝখানের ঐ ডাঙাটুকু ছেড়ে লালমুনিয়ার ধারা দুদিক দিয়ে গেছে বেরিয়ে। এর পর ডান দিকের কাশবনটা ঘুরে আরও পূর্ব দিকে চলে গেছে, ডানদিকের ছোট ছোট বনগুলো

গেছে শেষ হয়ে। সোহনপুরের ঐ নিদর্শনটুকু ছেড়ে দিলে, সামনে শুধুই জল আর জল। জলের এরকম বিরাট বিস্তার, সীমাহীন, অভঙ্গ—এর পূর্বে আর কোথাও দেখিনি আমি, অবশ্য সমুদ্রকে বাদ দিতে হয়। কুশীর এই রূপের সঙ্গে কুশীরই আর এক রূপের তুলনা চলে শুধু—গণপৎগঞ্জ যেতে সেই দিগন্তলীন মরুভূমি। সমুদ্রের কথা বলছি, কিন্তু সমুদ্রও ঠিক এ ধরণের একটা অস্বস্তি জাগায় না মনে, কেন না সমুদ্র হচ্ছে সহজ, স্বাভাবিক; ওই ওর রূপ, ওই রূপেই তার সৃষ্টি, এমনকি ওই রূপে সে রত্নাকরও।...সামনের এই যে জল, এটা হচ্ছে স্বভাবের একটা বিকৃতি, একটা আতিশয্য, এটা একটা নদীর প্রকৃত রূপ নয়, দুটি কূলের সংযমের মধ্যে থেকে সে কল্যাণ বিতরণ করবে, এই ছিল তার বরাভয়; সেই বিশ্বাসেই কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল মানুষ, ঘর বেঁধেছিল, ফসল ফলিয়েছিল। এখন এই ভেবে অস্বস্তি লাগে যে, তার সবকিছু এখন ওরই গর্ভে। শুধু তো এইটুকুই নয়, তাহলে না হয় বলা যেত, এ একটু ব্যতিক্রম, এরকম হয়ই। হিমালয়ের তরাই ধুইয়ে এই রকম বিরাট জলরাশি ছুটো জেলার দুটো বিপুল অংশ গ্রাস করে চলেছে, এই রকম কত মুংরাহা-ধারঘাট-কাটাইয়া-সোহনপুর যে লুপ্ত ওর জঠরে, কে তার হিসেব রাখবে?

একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে আমরা ফিরলাম। রোদ টনটনিয়ে উঠছে; কিন্তু এই কুশীই আবার আমাদের ইস্পাত করে দিয়েছে। সে আবার ছিল বৈশাখের রোদ, তার ওপর বালিয়াড়ি, তারও ওপর জীপ। এ বরঞ্চ ভালোই লাগছে, জলের ওপর দোদুল মসৃণ গতি, ছইয়ের ছায়ার মধ্যে ঝিরঝিরে হাওয়া; ভালোই লাগছে, শুধু একটু ভুলে থাকতে পারলেই হোল যে, কী সর্বনাশের ওপর দিয়েই না আমরা দোল খেয়ে চলেছি। সেইখানে মাঝে মাঝে ব্যাঘাত হচ্ছে, ছইয়ের মধ্যে ভিজে হাওয়ার সনসনানি যখন ভিজে কান্নার মতনই হঠাৎ কানে উঠছে বেজে।

এবার আর স্রোতের মুখে গা ভাসানো নয়, উলট স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে চলেছি আমরা। সম্মুখ রণ, অর্থাৎ একেবারে মাঝ দরিয়া। সুবিধে এই যে, দিনের বেলা তীর ঘেঁষে যেতে ভয় নেই, আর

তীরের রেখাটাও কাশবন এক রকম দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছে। আমরা বাঁ দিকে গিয়ে পড়েছিলাম বলে বাঁ তীর ঘেঁষেই চলেছি, দাঁড় ফেলে ফেলে। কোন এক জায়গায় আমাদের লালমুনিয়া পার হতে হবে। অবশ্য বাঁ দিক যা বলেছি, তা ভূগোলের ভাষায়। উজান বেয়ে আসতে, যেটা ছিল বাঁ তীর, সেটা আমাদের ডাইনে এখন। এই আন্দাজটাই মনে রেখে যেও এবার থেকে।

তীর ছুঁয়ে চলেছি আমরা। একেবারে যদি বন ঘেঁষে চলি তো স্থবিধে অনেক ; দাঁড়ে জল কম পাওয়া যায়, নৌকো হুনহুনিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে ; কিন্তু বিপদও আছে, আর তাইতেই পাল্লা একেবারে পড়ে ঝুঁকে।

রবিবাবু বলছেন সে কাহিনী—

এত যে কুশীর জঙ্গলের কথা শুনি তা আর কিছু নয়, ঐ কাশবন, কোথাও বেঁটে ঝাউ আর কোথাও গোলপাতা। এ ছাড়া আর হেন গাছ নেই যা কুশীর জল বরদাস্ত করতে পারে। এগুলো দেখতে নিরীহ, না বেশি উঁচু, না বেশি ঘন, কিন্তু একটা কথা সততই মনে রাখতে হবে যে, কুশীর যা কিছু জীবজন্তু সে সবই এই হালকা বনের মধ্যে—তার মধ্যে যেমন নিরীহ খরগোস আছে, হরিণ আছে, নীলগাই আছে, তেমনি আবার বুনোশুওরের ভিড়ও কম নয়, তারপর বন যেখানে প্রশস্ত, যেমন এইটে, সেখানে বুনো মহিষ থাকাও বিচিত্র নয়, চিতে দু'দশটা খুঁজে পেতে দেখলে তো পাওয়া যাবেই, বড়কর্তাও যদি হঠাৎ তোমার সামনাসামনি হয়ে পড়ে বলেন—"আস্থন, আস্তাজ্ঞে হোক।"—তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আরও আছে —সাপ ; গোসাপ তো অজস্র, হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, পাহাড় থেকে ময়ালও ভেসে আসে মাঝে মাঝে, আর সব চেয়ে যা সাংঘাতিক গোখরা, কেউটে, করৈৎ—ভিটের, মাঠের—এদেরও অকুলান নেই।...বাইরে থেকে বেশ দেখতে, সরু সরু পাতাগুলি জলের ওপর বাতাসে খাচ্ছে দোল—কোথাও একটু বেশি জেগে, কোথাও আকণ্ঠ জলেরই মধ্যে ; কিন্তু বেশি মিতালি না করে পরিহার ক'রে যাওয়াই ভালো, অন্তত শহর থেকে এত দূরে। বন্যায় আবার সব হন্যে হয়ে রয়েছে।

কে যে গল্পটা বললে—রবিবাবুই, না, অন্য কার মুখে শুনলাম? এইরকম কাশের বন ঘেঁষে নৌকো চলেছে, এই রকম উজান দাঁড় ফেলে। হঠাৎ একটা গর্জন শুনে বনের দিকে ঘুরে চাইতেই সবার চক্ষুস্থির। একটা নতুন ধরণের সাপ, বোধ হয় পাহাড়ী, তর্জন আর চেহারা দেখে মনে হয় খুবই মারাত্মক—একটা কাশের ঝাড়কে পাকিয়ে ধরে প্রায় হাত দেড়েক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, জল থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে সবাই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। নৌকো থেকে হাত চারেক'ও তফাৎ নয় উজান ঠেলে আসছে বলে, এমন একটা অবস্থা যে দাঁড়ের ঠেলা দিয়ে যে টপ করে স্রোতের সঙ্গে বেড়িয়ে যাবে তারও উপায় নেই; সব চেয়ে মুশকিল আর যেন ভাববারও সময় নেই। সাপটাকে দেখলে মনে হয় ঠিক করে নিয়েছে দেবে একটা লাফ, যে উদ্দেশ্যেই হোক; এদিকে হাল দুটো বাঁধা; আর দাঁড়—সে তো আর লাঠি নয়।

দাঁড়ীই কিন্তু বাঁচালে, দাঁড়টাকে টেনে নিয়ে যতটা সম্ভব বাগিয়ে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলে ঘুড়িয়ে, কাশের ঝাড়ই ছিল লক্ষ্য, কিন্তু সাপটাও ঠিক সেই সময় পাক খুলে দিয়েছে লাফ, নিতান্তই একটা চান্স, দাঁড়ের গোড়াটা সাপটার ঠিক মাঝায় গিয়ে লাগল, সঙ্গে সঙ্গেই জলে পড়ে সাপটা গেল তলিয়ে।

কুশীর জঙ্গলের এ-সব ছোটখাট কাহিনী, তবে সবই এই রকম—অর্থাৎ জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে যে জায়গাটুকু সেখানে একটা চুল চিরে রাখতে গেলেও বোধ হয় আঁটে না। সবটুকু চান্স্। সেই সব গল্প করতে করতে চলেছি আমরা। এপার থেকে নদীর ওপার যাওয়াও একটা সমস্যা। নদী যেখানে বেশি চওড়া সেখানে যেমন পেরুবার চেষ্টা করলে না, যেখানে যেখানে সরু সে সব জায়গাও ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অবশ্য এটা বোঝা যায়, স্রোত প্রখর, একবার একটু মুখ ঘোরালে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার ঠিক আছে? তেমনি গভীরও তো এখানে। দু'একটা জায়গায় জলের ঘূর্ণিও প্রবল; একে কুশী, তাতে আবার বেরুবার পথ পাচ্ছে না, অনুমান ক'রে নিতে পার তার আক্রোশটা।

শেষে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম—ওরা যা খুঁজছিল সেটা পাওয়া যেতে। …কিছু নয়, অত খাটবেই বা কেন মানুষ? অমন রিস্কই বা নিতে যাবে কেন? এই কুশীই করে দেবে তার কাজ। …কাশবনের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ছোট বড় সুঁতি এসেছে বেরিয়ে, আগে লিখেছি। তার মধ্যে একটা বেশ চওড়া আর বেশ সোজা এসে লালমুনিয়ায় পড়েছে। মাল্লারা এরই অপেক্ষায় ছিল, সুঁতির মাঝখানে ফেলে দিতে তারই স্রোত বেশ খানিকটা ভেতর পর্যন্ত নিয়ে গেল নৌকোটাকে, লালমুনিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। অবশ্য হাল চালাতে হোল; তবে বেশ অনায়াসেই কাজ হলো। বাকিটুকু হালের একটু জোর দিতে আমরাও ওদিককার কিনারায় গিয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটুকু সামান্য, কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করবার অবসর ছিল বলে বড় কৌতুকপ্রদ বোধ হচ্ছিল। সামান্য কিন্তু ঐটুকুতেই মানুষ যেন সৃষ্টির অধীশ্বর হয়ে উঠল। যে অন্ধ প্রকৃতি তার এত বৈরিতা করছে, তার ঝুঁটি ধরে কাজ আদায় করে নিলে। শত্রু মাথা হেঁট করে নেমে এল দাসত্বে। …সাহসে, আত্মবিশ্বাসে, আশায় মনটা হয়ে উঠছে পূর্ণ। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বিবর্তনের এই ধারা; এটুকু চৈতন্য, এটুকু পারিপার্শ্বিককে বুঝে নেবার ক্ষমতা নিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে বিশিষ্ট হয়ে উঠল, জড় থেকে তো বিশিষ্টই, চৈতন্যের মধ্যেও তার আসন হয়ে রইল পৃথক।…এই কুশী, দেখে তো এলাম কী প্রলয়ঙ্করী, ঋতুতে ঋতুতে ওর ধ্বংসের চক্র আবর্তিত হয়ে কি সর্বনাশ করে চলেছে; কিন্তু একদিন আসবেই যখন মানুষের কাছে এই কুশীকে মাথা নোয়াতে হবে—এই একেই পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে অন্ন, আলো, আনন্দ। শৃঙ্খলিতা রাক্ষসী, একদিন যেখানে নরক সৃষ্টি করেছে, মানুষের দাসীবৃত্তি করে সেখানে স্বর্গ রচনা করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বলবে একটু বেশি sentimental হয়ে গেল, কতকটা যেন ভাবের আদিখ্যেতা। বোধ হয় গেল হয়ে। আসল কথাটা কি জান? এত বড় একটা সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এসে আমার মনটা যেন আশ্রয় খুঁজছিল; তাই এইটুকু সামান্য উপলক্ষ্যের মধ্যে একটা যেন ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি। বলবে—কেন, মানুষের জয়যাত্রার তো কত বিরাট নিদর্শন

রয়েছে ছড়ানো। রয়েছে বৈ কি, কিন্তু কি হয় জান? অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এত আবৃত হয়ে পড়ে যে, বড়গুলো যেন চোখে ঠেকে না, তা ভিন্ন ওগুলো কেমন যেন অভ্যাস বা গা সওয়া হয়েও যায়; তখন, কে দুটো খরস্রোতের সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে নৌকো নিলে এগিয়ে এই সামান্যটুকুর মধ্যেই সৃষ্টির বিরাট রহস্যটা হঠাৎ ঝলকে ওঠে।

আমাদের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল। শহরের কাছাকাছি এসে গেছি। নদী দিয়েছি একেবারে ছেড়ে, এখন আমাদের পথ জলে-ডোবা মাঠের ওপর দিয়ে। স্টেশন-ইয়ার্ডের আড়ালে পড়ে স্রোত একেবারে নেই বললেই হয়, ছাড়া ছাড়া কাশের ঝোপের পাশ দিয়ে—যেখানে ঝোপ হালকা সেখানে ওপর দিয়েই আমাদের নৌকো এগিয়ে চলেছে।

বেশ লাগছিল শেষের দিকটায়। বেলা বেড়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে কখন্ একটা খুব পাতলা মেঘের আস্তরণে আকাশের সেই প্রখর দীপ্তিটাকে নরম করে এনেছে; হাওয়াটা লাগছে আরও মিষ্ট, নৌকোর দোলায় একটা ঘুমপাড়ানি ভাব জেগে উঠছে। এইবার নেমে ধর্মশালা, আহার, তারপর গাড়ি। কুশী পর্ব শেষ।

ভালো হোত যদি মিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে এই মিষ্টতাটুকু নিয়ে নামতে পারতাম নৌকো থেকে। কিন্তু তা হবার নয়।

তা হতে দেবেই বা কেন কুশী? সে তো কমেডি নয়, সে হচ্ছে একটা নিদারুণ ট্র্যাজেডী, সুতরাং সেইভাবেই নিজেকে পরিসমাপ্ত করলে আমাদের সামনে।

করলেও বেশ শিল্পীসুলভ নিপুণতার সঙ্গে।

সামনেই স্টেশনের শুকনো ইয়ার্ড, মালগুদামের টানা প্ল্যাটফর্মে চলন্ত-জীবনের একটা সুস্থ চাঞ্চল্য—হোক তারা কুশী-পলাতক, তবু পুরুষেরা আনছে, রাখছে, মেয়েরা গোছাচ্ছে, দিচ্ছে; শিশুর দল কাজের মধ্যে অকাজ এনে ঘটাচ্ছে ছন্দপতন,—যত তুচ্ছই হোক, সহজ জীবনের নিত্য-পরিচিত রূপ তো বটে,—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছি, হঠাৎ নৌকোর মুখটা ডাইনে ঘোরাতে আবার সেই কুশী!

শিল্প নিয়েই জীবন কাটছে, সাবাসী দিতে হোল বৈ কি এই সারপ্রাইজ-টুকুর জন্যে। তা দিই, তবুও কিন্তু বলতে হয় কুশী যেন শেষ রক্ষা করতে পারলে না।

একটা কি সিনেমা ছবি দেখবার দুরদৃষ্ট হয়েছিল, নামটা মনে পড়ছে না।...একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের সিনেমা জগতে এক-একটা ঢেউ আসে, তখন তারই হুজুগে মেতে ওঠে ডিরেক্টার-প্রডিউসারের দল। কখনও যেন এসে পড়ে ধর্মের ঢেউ—শুধুই ধর্মচিত্রের পর ধর্মচিত্র, বুঝি ফেললে এনে সত্যযুগ! কখনও আসে কমেডি অর্থাৎ 'মিলনান্তের' ঢেউ, কোনও ডিরেক্টার যদি প্রাণান্ত করেও এ-জীবনে মিলন ঘটাতে পারলে না তো দেখা গেল মৃত্যুর পর নায়ক-নায়িকা ইন্দ্রের সভায় ব'সে 'উর্বশী' নৃত্য দেখছে। কখনও আবার আসে ট্র্যাজেডীর ঢেউ।

সেটা চলেছে এই ট্র্যাজেডীর ঢেউয়ের আমল। শেষে একটা শ্মশান দৃশ্য না দেখাতে পারলে ডিরেক্টার শান্তি পাচ্ছে না, লোকদের ঠাণ্ডা রাখা দায় হয়ে উঠছে।

বক্ষ্যমান সিনেমার ডিরেক্টার মনে করলে এই ভিড়ে একচাল বাজিমাৎ করতে হবে। তুমি বোধ হয় দেখনি সুতরাং বিশ্বাস করা শক্ত হবে, শেষ-বার যখন পটপরিবর্তন হোল, দেখা গেল শ্মশান নয়, মহাশ্মশান একেবারে, আর একটা নয়, পাশাপাশি তিন তিনটে চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।...ফেলো কত চোখের জল ফেলবে!

কুশীও করলে তাই। ভাবলে সবাই এসেছে মেহনৎ করে, পরিচয়টা নিয়ে যাক্ আমার কৃতিত্বের।

পাশাপাশি তিনটি চিতা।

আমি সেই বৈশাখ থেকে নিয়ে কুশীকে নানাভাবে নানাস্থানে আসছি দেখে, কিন্তু বিকট মূর্তিতে কোথাও দেখি নি, এক বোধ হয় বরিয়াহি ছাড়া। কিন্তু সেখানেও আমার মনের ওপর চাপটা এ-ভাবে পড়ে নি, কেন না জীপ তাড়াতাড়ি ধ্বংসের মাঝখান দিয়ে গেল বেরিয়ে, এই রকম নৌকোর দোল খেতে খেতে তো যেতে হয় নি আমাদের, সবটুকু খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে।

আরও একটা কথা অবশ্য আছে। এ-পর্যন্ত যা দেখে এসেছি আমি, তা এক হিসেবে বলতে গেলে ধ্বংস নয়, ধ্বংসের পরিণাম; দিগন্তলীন বালিয়াড়ির মধ্যে অসংখ্য জনপদের সেই পরিণামই দেখেছি। এই যে সোহনপুর দেখে এলাম, এই যে শুনে এলাম মুংরাহা—ধারাঘাট—লালপুরের সলিলসমাধির কথা, সমাধিও এলাম দেখে—এ সবই পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, ধ্বংসের প্রত্যক্ষ রূপ নয়। এই শেষ দৃশ্যপট কিন্তু ব্যাপক না হোক, ধ্বংসের প্রত্যক্ষ মূর্তি, আর সেই জন্যে যেন আরও উৎকট হয়েই স্মৃতিলগ্ন হয়ে রইল।

পাশাপাশি তিনটা চিতা।

একটি ডাকবাংলোর, তার পাশেরটি একটি বিরাট চালকলের, তার পাশেরটি একটি স্কুলঘরের।

নির্মালীর ওদিকটাও ডুবেছে, কিন্তু এ ধরণের কিছুই চোখে পড়ল না। এখানে কি বন্যার সঙ্গে ভূমিকম্পের মিতালি হয়েছিল? আমি যে ভূমিকম্পকেও প্রত্যক্ষ করেছি, তাই এই প্রশ্ন—

তিনটেরই দেয়ালগুলো চির-খাওয়া, জায়গায় জায়গায় গেছে হেলে, কোথাও পড়েও—সবটাই, বা খাবলা-খাবলা ক'রে। তারপর বালির চাপ। জল রয়েছে এখনও, কিন্তু যেমন ভূমিকম্পে দেখেছিলাম—মনে হয় বালি যেন পাতাল ফুঁড়ে ঠেলে উঠেছে। আলগা বনেদের ওপর এই বালির চাপেই অবশ্য দেয়ালগুলো ঐরকম করে তছনছ করে দিয়েছে, তবু সত্যিই যেন মনে হয়, তিনটে বাড়ির ঝুঁটি ধরে কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে গেছে একচোট।

সমস্ত জায়গাটার ওপর আক্রোশ যেন ফুটে উঠেছে কুশীর। তার কারণও একটু হয়েছিল—

রেলের ওপারটায় জমি একটু নিচু, কয়েক বছর ধরেই কুশীর জল ঢুকে পড়ছে, তাই সবার রেলের এই পারটায় নজর এসে পড়েছিল সম্প্রতি। এদিকটা যেমন অপেক্ষাকৃত উঁচু ওদিকের চেয়ে, তেমনি আবার মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে উঁচু স্টেশন-ইয়ার্ডটা, ওটা টপকে আসতে কুশীকে এখনও কিছুদিন ডন-বৈঠক করতে হবে। তার ওপর লালমুনিয়ার ধারাটাও এদিকে খানিকটা তফাতে। লোকে মতলব আঁটতে লাগল, এই দিকে নয়া-নির্মালী বসাবে।

রংলাল বাজাজ, যাঁর ধর্মশালা, আর এক হিসাবে নির্মাল্লী যাঁর প্রাণ, তিনি হলেন অগ্রণী; নির্মাল্লীর সবচেয়ে বড় মিল উঠল—বোধ হয়, জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিলগুলোর অন্যতম। তার সঙ্গে স্কুল, এরকম স্কুলের বাড়িও সচরাচর চোখে পড়ে না। চকমেলানো দোতলা বাড়ি, মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠান।···আরও সব উঠছে—ধীরেধীরে, নয়া-নির্মাল্লীর গোড়াপত্তন হয়ে গেল।

কুশী বললে—"আমিও আছি, এই যে!"

গোড়াতেই কেমন করে যেন আমার দৃষ্টিটা একবার লছমী আরদালির দিকে গিয়ে পড়েছিল, যখন প্রথম নজর পড়ল এগুলোর দিকে; দেখি স্কুল বাড়িটার দিকে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে রয়েছে চেয়ে। অবশ্য তখন বাড়িগুলোর পরিচয় পাইনি আমরা। ব্যাপারটা বুঝলাম—লছমী রোমান্সের গন্ধ পেয়েছে, ওর মাথায় গল্প উঠছে গজিয়ে; একবার আমার সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে গেল।

আর সত্যিও, মিলটা প্রকাণ্ড হলেও স্কুল বাড়িটাই নজরে পড়ে বেশি করে। ওপরে রাণীগঞ্জ টাইলগুলো ঝড়-ঝাপটায় উলট-পালট হয়ে গেছে, জানলা-চৌকাঠ খুলে নেওয়ায় বড় বড় ঘরগুলো হাঁ করে রয়েছে, নিচে ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত জলে ডোবা, কোথাও বালির স্তূপ ঠেলে উঠেছে—লোক নেই, জন নেই, একটা যেন প্রাণহীন কঙ্কাল।

আমি প্রশ্ন করলাম—"ও বিল্ডিংটা কি?"

রবিবাবু বললেন—"স্কুল ওটা।"—ওর কাহিনী, সেই সঙ্গে এদিককার সমস্ত কাহিনী বলে চললেন।

শোনার মধ্যেই একবার নিতান্ত নিরুদ্দিষ্টভাবেই নজরটা লছমীর দিকে গিয়ে পড়ল।

দেখি কখন্ সরে গিয়ে সামনের গলুইয়ের কাছে চুপটি করে বসেছে, মুখে সেই গভীর রহস্যের ভাবটা তো নেই-ই, বরং মনে হয় যেন একটা নৈরাশ্যের ছায়া এসে পড়েছে সেখানে।

লছমীর হঠাৎ এ-ভাবান্তর কেন?—এমন রোমান্সের খোরাকের একেবারে মাঝখানে! অমন ক'রে স্কুলের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ······

মণি ওকে চিনেছে ভালো করে, বললে—"বুঝছ না? ও বাড়িটা দেখেই একটা কিছু দাঁড় করাচ্ছিল—ভূত, পরেৎ, চুড়েল, জিন, দানা—এই সব দিয়ে; যেই শুনলে যে, বাড়িটা ছিল একেবারে জ্যান্ত 'স্কুলিয়া' ভূতেদের আড্ডা—তাদের সামনে এসব ভূতদের কোনটারই রোমান্স জমবে না, বেচারি একেবারে···কিরে লছমী, তোরই তো দিন—আরে, একেবারে ওরকম করে মুষড়ে পড়লি যে!···"

একটা যে হাসির রোল উঠল, তাতে যেন বাঁচা গেল; আর যেন সহ্য হচ্ছিল না এ-দৃশ্য।

তাহলেও লছমীই সবচেয়ে গভীর দাগ কেটে স্থায়ী হ'য়ে রইল আমার কুশীপ্রাঙ্গণের স্মৃতিতে, আর তা ওর ঐ রোমান্স নিয়েই। সেই কথা বলেই শেষ করি এই চিঠি—

আগের দিন যখন আমাদের নৌকো এসে ধর্মশালার দরজায় ভিড়ল, তখন ঝড়ের প্রথম ঝাপটা এসে গেছে, বৃষ্টিও ফোঁটায় ফোঁটায় গেছে নেমে। বোধ হয় সন্ধ্যা ওৎরায়ওনি, কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে; তার ওপর প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের ভয়ে সেই জলে-ভাসা বাজারের সজীব অংশটুকুও দোর-জানলা বন্ধ করে নিজের মধ্যে গুটিয়ে বসায় এই অকাল-সন্ধ্যায় গভীর রাত্রির একটা থমথমে ভাব এসে গেল। নৌকো থেকে নেমে একটু যেতে যেতেই সিক্ত ঝড়ের গোটাকতক থাবা খেয়ে যখন আমরা ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে দরজা বন্ধ করলাম, বেশ বুঝতে পারলাম নিতান্তই রগ ঘেঁষে আজ সবার একটা ফাঁড়া গেল কেটে। ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে আমরা টেবিলটা ঘিরে গুছিয়ে বসলাম চেয়ারে, কিন্তু বেশ খানিকটা পর্যন্ত একটা আচ্ছন্ন অন্যমনস্কভাব রইলই সবার মনে—ধর্মশালার দৃঢ় নিরাপত্তার মধ্যেও কেউই যেন সেই মাঝলালমুনিয়ায় জন দশ আরোহীসুদ্ধ একখানা অসহায় নৌকোর কথা কোনমতেই মন থেকে সরাতে পারছি না।···কতটুকুই বা?—পাঁচ মিনিটের এদিক-ওদিক, হয়তো অতটাও নয়; তাহলেই সলিলসমাধি ছিল অনিবার্য। চা আসতে সবার মনে যেন একটু সাড় হোল। আমারও আজ এক কাপ

দরকার; পুনর্জন্মটাকে যদি একরকম সাত্বিকভাবে 'সেলিব্রেট' না করি তো জীবনের প্রতি অবিচার করা হয়।

আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে, রাত্রের খানার ব্যবস্থায় বাহুল্য আছে; সুতরাং বিলম্ব হবে, চায়ের পর আমাদের গল্প জমে উঠল।...এখান থেকে নিয়ে দিল্লী পর্যন্ত সবার তন্দ্রা যায় ছুটে, কত প্ল্যান, কত কমিশন, কত মন্ত্রিসমাগম—কুশী কিন্তু নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেই চলেছে।...গল্পের আর শেষ নেই, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা; মানুষের সঙ্গে একটা অবুঝ অন্ধ শক্তির চলেছে বোঝাপড়া, একদিকে জীবনের আকুলি-বিকুলি, সৃষ্টির বেদনা, আর একদিকে ধ্বংস, ধ্বংস, কেবলই ধ্বংস।

বড় হলঘরটায় নতুন-কেনা হ্যারিকেন লনটনের স্বচ্ছ আলো, টেবিল ঘিরে বেশ গুছিয়ে সুছিয়ে বসে আছি আমরা; খানার দেরি, সুতরাং আর এক প্রস্থ চা এল। গল্প চলছে।

বাইরে দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। যেমন ঝড় তেমনি ধারা-বৃষ্টি, বন্ধ জানলা-দোরগুলো এক একবার ঝনঝনিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমের দোর খোলবার উপায় নেই, একবার উঠে গিয়ে পূবের একটা দোর একটু ফাঁক করে দেখলাম বাইরেটা। হুঙ্কারটা যেন এক মুহূর্তে শতগুণ উঠল বেড়ে। আর, বিদ্যুচ্চমক! —এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ আমি কম দেখেছি জীবনে; অন্ধকার যেন নেই-ই, শুধু একটা আকাশজোড়া আলো থরথরিয়ে কাঁপছে—সব মিলিয়ে যে কী একটা প্রলয়দৃশ্য, যেন সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকতে হয়।

ওদের কথায় দোর বন্ধ করে এসে আবার বসলাম।

কিন্তু বেশ বুঝছি সম্মোহিতই করে আনছে আমায়; যতই রাত এগুতে লাগল, দুর্যোগ বাড়তে লাগল, আমায় কিসে যেন আচ্ছন্ন করে আনতে লাগল। কুশীর মায়া ব'লে একটা কথা মাঝে মাঝে শুনতাম—বুঝতাম সেটা আর কিছু নয়, একটা বিরাট ধ্বংসের মোহিনী আকর্ষণ, দুর্বল মনের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া, যার জন্যে খুব উঁচুতে উঠলে নিজের ওপর বিশ্বাস হারায় অনেকে, মনে করে লাফিয়ে পড়ি, দেখি কি হয়। বুঝছি এও তাই, তবু শক্তি হারাচ্ছি। মনে হচ্ছে কিন্তু যেন শক্তির জোয়ারই আসছে কোথা

থেকে, ইচ্ছে হচ্ছে দেখি—একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। আমায় টানছে কুশী, আর একটা স্তম্ভিত উল্লাস যেন আমায় সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে।

খুব দেরী হোল না, সাড়ে নটার সময় আমাদের আহার শেষ হয়ে গেল। বেশ ঠাণ্ডা, যে যা পেলাম টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ এক সময়ে উঠলাম জেগে। কত রাত্রি বোঝা যাচ্ছে না, তবে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি এইরকম একটা অনুভূতি রয়েছে দেহে-মনে। সন্ধ্যা থেকে একটানা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কাটানর জন্যে সেই যে আচ্ছন্ন ভাব, সেটা যেন কেটে গিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসতে লাগল। দুর্যোগ তখনও সেইভাবেই চলেছে, তবে হয়তো আমাদের ঘরটাও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যেই মনে হচ্ছে যেন সুর আরও চড়া, লয় আরও দ্রুত।…ঘুম আসছে না।

দুর্যোগের কিন্তু সেই ছিল শেষ। আর একটু বোধ হয় বাড়ল, তারপর একেবারে চরমে উঠে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।

বোধ হয় স্নায়ুর ওপর অসহ্য চাপটা কমে যাওয়ার জন্যে আমি খানিকক্ষণ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে ছিলাম, হঠাৎ যেন কার ঘন তাগিদে তন্দ্রাটা গেল ছুটে, ধড়মড়িয়ে প্রায় আধ-শোওয়া হয়ে উঠেই বসলাম আমি; শুধু একটা দমকা হাওয়ায় দোর-জানলায় একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়ে গেছে।

কিন্তু মনটা আমার হঠাৎ অকারণেই যেন বড্ড ব্যথিত হয়ে উঠল।

দুর্যোগটা আর নেই, স্তিমিত হতে হতে কখন একেবারেই শান্ত হয়ে গেছে, শুধু হাওয়াটা কার যেন শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাসের মতন এক-একবার ফুলে ফুলে উঠছে। এইরকম একটা প্রবল বিক্ষোভের পর এটাকে কান্নার এত কাছাকাছি বলে মনে হোল যে, আমার মনটা সত্যিই হঠাৎ বেদনায় যেন টনটনিয়ে উঠল। হয়তো ঐ অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠেছি বলে ঐটেই রইল মনে লেগে,—আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে, নিরন্তরই যাচ্ছে কেঁদে—ধ্বংসের অনুতাপে,

অদৃষ্টের অনিবার্যতায়···এই যে আমার নিয়তি—এই যে আমার অভিশাপ—বলো, বলো আমি কি করি ?

ডাকছে, যেন নিশির ডাক, বাইরেই যেন দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলতে চায়, একজনকে সাক্ষী চায় কুশী তার এই কঠোর নিয়তির। দোরটা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। শেকলটা দিলাম লাগিয়ে।

অন্ধকারটা যেন নিরেট একটা কিছু ; নিজের হাতটা বাড়িয়ে ধরলে দেখা যায় না।···সেটা অবশ্য কতকটা ধাঁধা লেগে যাবার জন্যেই ; কড়া আলোর মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছি তো। তারপর চোখটা একটু সয়ে এসেছে, হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়ে সমস্ত শরীরটা অসাড় হয়ে গেল। বারান্দার একেবারে ও-প্রান্তে সিঁড়িটা ; মনে হলো অন্ধকারেরই একটা জায়গা একটু তরল হয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে।

সত্যিই কেউ আসছে নাকি ?···সত্যিই বলবে কিছু ? এমনি অসাড় হয়ে গেছে শরীরটা যে ঘুরে শেকলটা খুলে তাড়াতাড়ি ভেতরে চ'লে যাবার শক্তি হারিয়েছি। তারপর, ঐ অসাড়তার মধ্যেই এক ধরণের শক্তি এসে পড়ল ; হয়ত নিরুপায়ের শক্তিই। যেই আসুক, দেখতে হবে।

আরও এগিয়ে আসতে টের পেলাম, লছমী। বেশ ঠাণ্ডা, ওর পাগড়ির চাদরটা জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে।

দু'জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম—"লছমী !···হুজুর নাকি !"

বললাম—"হ্যাঁ, ঘুম হচ্ছে না, ভেতরটা যেন গুমোটও, তাই···"

"তা নয় হুজুর, আজ ঘুম তো হবে না···"

"আজ হবে না ? কেন ?—সবাই তো ঘুমুচ্ছে···"

"ঘুম নয় ওটা হুজুর, কুশীর এলাকার মধ্যে কোথাও কারুরই ঘুম নেই আজ।"

"তবে ?"

"ঘুম নয়, আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে সবাইকে ; যাদু একটা। আজ হুজুর কুশী-ডাইনার রাত।"

"সেটা আবার কি ?···কথাটা শুনিনি তো আগে।"

আশ্চর্য লাগছে, যেন বিশ্বাসও হচ্ছে কথাটা, এই অন্ধকারে এই আমাদের দু'জনের দাঁড়িয়ে থাকার মতো অর্ধ-সত্য একটা।…"কুশী ডাইনীর রাত!"

অর্ধবিশ্বাসের অস্ফুটতায় কথাটা আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল নিঃসাড়ে।

"কুশী ডাইনীর রাত হুজুর।…আপনাদের তো জানবার কথা নয়, তবে জানে, যারা খোঁজ রাখে—লক্ষণটা চেনে। আজকের সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্তিরটা এক রকম গেল দেখলেন তো? আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যেয় হুজুর; প্রথম চোট্‌টা ছিল আমাদের নৌকার ওপর। সে তো নিজেদেরই ভোগা।"

বিশ্বাস হচ্ছে।…এই সময়ে হঠাৎ হাওয়াটা উঠল জেগে; দূরের—কাছের বন্ধ দোর-জানলাগুলোর খঠখটানি।…কাদের ওপর চোট ছিল, পায় নি, খুঁজে বেড়াচ্ছে কে যেন।

প্রশ্ন করলাম—"তা হলে—এরকম রাতে…?"

"পাহাড় থেকে প্রলয় নেমে আসছে হুজুর।—কুশী প্রলয় হয়ে নেমে আসে। যাদু ক'রে এই যে ঘুম-পাড়ানো, এর ওপর দিয়ে বয়ে যাবে কুশী। অবশ্য যাবার চেষ্টা তাঁর, তবে পুরোপুরি পারে না, মানে আজ পর্যন্ত পারে নি।"

"কারণ?"

"একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?…ডুম্-ডুম্-ডুম্-ডুম্…একটু কান পেতে শুনুন।"

আছে একটা শব্দ; খুব বেশি কান পাততে হয় না। নিরেট নিঃশব্দ রাতের গহ্বরে ঐ একটিমাত্র শব্দ, যেন চারিদিকেই, তবে দূরে দূরে।

মুখ কেউ কারুর ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না, তবে বুঝছি লছমী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে আছে চেয়ে। দেখতে না পেলেও কেমন যেন অস্বস্তিকর দৃষ্টি, রাত্রির সঙ্গে এ দৃষ্টিটাও যেন অভিভূত করে ফেলেছে আমায়। বুঝছি, কিন্তু তবু কি ক'রে যেন নিরোধ করবার শক্তি হারাচ্ছি ক্রমে ক্রমে।

লছমী বললে—"পারে নি যে, সে রকম কিছু করতে—আজ পর্যন্ত—তার কারণ এই মিথিলা দেশটা তন্ত্রমন্ত্র-ওঝার দেশ হুজুর। এই যে শব্দ শুনছেন—ডুম্-ডুম্-ডুম্…"

ঠিক এই সময় একটা তীব্র বিদ্যুৎ-ঝলকে চারদিক উঠল ঝলকে : লছমীর মুখটা রেখায় রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। যদি শিউরেই উঠে থাকি তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; ওরকম বিহ্বল, অভিভূত ভাব লছমীর মুখেও কখনও দেখি নি। লছমীরও মেহের আলির অবস্থা হোল নাকি?

আমার সম্বিতটা ফিরে এল ; এইতেই। ভেতরে ডেকে নিয়ে এলাম আলোতে। আলোটা বাড়িয়েও দিলাম। নিশ্চয় শেষ রাত্রি, আর লছমীও সমস্ত রাত ঘুমোয় নি, একটা কোণ দেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসল। ওর মনটা ঘোরাবার জন্যই এদিক-ওদিক দু'একটা গল্প আরম্ভ করলাম।···ও ক্ষুধিত অন্ধকারেই জীর্ণ হচ্ছিল, আলোতে এমনি একটা সহজ ভাব ফিরে আসছিল, তার মধ্যেই এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার চোখে আব কিন্তু ঘুম নেই। শুধু অবসাদের জন্যেই মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রা। লছমীর ব্যাপারটা আরও আমার মনটাকে নাড়া দিয়েছে। তবে অন্যভাবে ; ওর রূঢ়, নিষ্করুণ মন্তব্যগুলো বেদনা হয়ে ফিরে ফিরে আসছে আমার মনে—ঋষির দু'টি কন্যা, পুজোর জন্যে পুষ্প আহরণে গিয়েছিল—কৌশিকী আর কমলা—কৈশোরের চাপল্যের জন্যে পেলে অভিশাপ··· বাইরে বায়ুর ক্লান্ত সঞ্চরণ—কুশীরই কান্না—নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ঝুরে ঝুরে কান্না—তার কি অপরাধ—ওগো কী অপরাধ আমার?···দেখো না ভালো ক'রে—কোনও মিল কি খুঁজে পাও সেই দীপশিখার মতন স্নিগ্ধ ঋষি-কন্যার সঙ্গে আজকেব রাত্রের নিয়তি-জর্জরিত এই কৌশকী-রাক্ষসীর?

চাপা কান্না, ক্লান্তিতে নিঝুম হয়ে আসছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন আঙুল কার যেন পেলব অঙ্গে বুলিয়ে বুলিয়ে বলছি, বুঝি, কন্যা, সব বুঝি, শান্ত হও···

কিন্তু কাকে বলা? কেই বা হবে শান্ত?